ভারতাত্মা শ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীপ্রণব রঞ্জন ঘোষ

মণ্ডল বুক হাউস
৭৮/১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ ১লা আশ্বিন ১৩৫২ সাল

প্রকাশক

শ্রীসুনীল মণ্ডল।

৭৮/১ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদশিল্পী

শ্রীপ্রণব শূর।

ব্লক নির্মাতা

ব্লকম্যান। ৭৭/১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদমুদ্রক

ইম্প্রেসন্ হাউস। ৬৪, সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯

গ্রন্থক

তৈফুর আলী মিঞা এণ্ড ব্রাদার্স।

মুদ্রক

শ্রীযুগল কিশোর রায়

শ্রীসত্যনারায়ণ প্রেস।

৫২এ, কৈলাস বসু ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

দাম পাঁচ টাকা

উৎসর্গ

স্মরণ

শ্রীরামকৃষ্ণ-সাধনার অন্যতম শ্রেষ্ঠ উত্তরসাধক
মহাপুরুষ স্বামী শিবানন্দজীর উদ্দেশে

মনন

যাঁদের স্নেহময় সান্নিধ্যে মহাপুরুষ মহারাজের
পুণ্যদর্শনলাভ এ জীবনে সম্ভব হয়েছে,
শ্রীরামকৃষ্ণময়জীবন আমার সেই
বাবা ও মাকে

লেখকের অন্য বই

বিবেকানন্দ ও বাংলা সাহিত্য

প্রাক্‌কথন

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সমসাময়িক কালেই তাঁর জীবনীরচনা ও বাণীসংগ্রহপ্রচেষ্টার শুভসূচনা। আচার্য কেশবচন্দ্র প্রমুখ ব্রাহ্মসমাজের গুণগ্রাহী নেতৃবৃন্দ, শ্রীসুরেশচন্দ্র দত্ত, শ্রীরামচন্দ্র দত্ত প্রমুখ শ্রীরামকৃষ্ণভক্তমণ্ডলী থেকে আরম্ভ করে বিদেশী মনীষীদের মধ্যে নবযুগের "আচার্য সায়ন" মনীষী ম্যাক্সমূলর, মানবপ্রেমিক রম্যাঁ রলাঁ ও সাম্প্রতিক ইংরেজীসাহিত্যের অন্যতম বিশিষ্ট লেখক খ্রীষ্টোফার ঈশারুড অবধি পৃথিবীর নানাভাষায় শ্রীরামকৃষ্ণসাহিত্য রচিত হয়ে ভারতাত্মার বাণী দেশে দেশে প্রসারিত হয়ে চলেছে। পৃথিবীর ইতিহাসে তিনি এক 'নূতন মানুষ'—এ কথা সবাই স্বীকার করবেন। আবার এই নূতন মানুষটিই ভারতের চিরন্তন অধ্যাত্ম আদর্শের পূর্ণ প্রতীক।

চৈতন্যযুগের কবি বলেছিলেন, 'প্রণমহোঁ কলিযুগ সবযুগসার।' কারণ, এই কলিযুগেই ভগবৎপ্রেমের ভাবঘনবিগ্রহ মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের আবির্ভাব। রামকৃষ্ণযুগে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, তাঁর (শ্রীরামকৃষ্ণের) আবির্ভাবকাল থেকেই সত্যযুগের সূচনা।* শ্রীরামকৃষ্ণ সত্যের ভগবানকে চেয়েছিলেন। সেই সত্যের সন্ধানে তাঁর পরমসার্থকতা আমাদের অন্তরেও প্রেরণার অগ্নি সঞ্চারিত করুক—আজকের দিনে এই আমাদের সবচেয়ে বড়ো প্রার্থনা।

'চাঁদমামা সকলেরই মামা'—শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভগবৎপ্রেমের এই প্রতীকী উদাহরণটি মনে রেখে তাঁর জীবন ও বাণীর অনুধ্যানে আমরা সকলেই অগ্রসর হ'তে পারি। কারণ, তাঁর মতো মহামানবকে উপলব্ধি করার অর্থ আমাদেরই আত্মোপলব্ধির পথে অগ্রসর হওয়া।

নানামুনির নানা মত। তবু মত আছে বলেই তাঁরা মুনি। ওই মননশীলতাই জীবনের লক্ষণ। যত শ্রদ্ধেয়ই হোক, জীবনে উপলব্ধি না করে কোন মতের অনুসরণই কাম্য নয়। কিন্তু সব মতামতের সঙ্গে পরিচয় থাকা দরকার। শ্রীরামকৃষ্ণজীবনের অনুধ্যানে নানা মতের চিন্তাধারার পর্যালোচনা এ গ্রন্থের উদ্দেশ্য। সেদিক থেকে এ গ্রন্থ জীবনী নয়, বলা যেতে পারে জীবনভাষ্য। একটু দুঃসাহসের মতো শোনালেও, ওই জীবনভাষ্যরচনার উদ্দেশ্য আত্মজিজ্ঞাসা। সে আত্মজিজ্ঞাসায় স্বদেশবাসীর সহযোগিতা প্রার্থনাই এ গ্রন্থপ্রকাশের কারণ।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য আমাদের সত্যিই গর্ব করার মতো জিনিষ। এ গর্ব আমার আরো বেড়ে ওঠে, যখন ভাবি মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরামকৃষ্ণ-পরমহংসের মতো এ জগতের দুটি শ্রেষ্ঠ অধ্যাত্মবক্তিত্ব বাংলাভাষায় তঁদের উপলব্ধির কথা প্রকাশ করে গেছেন। মহাপ্রভুর মুখের ভাষা সঠিক আকারে লিপিবদ্ধ না থাকলেও "শ্রীশ্রীচৈতন্যভগবত" ও "শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত" গ্রন্থ থেকে অনুমান করা অসম্ভব নয়। কিন্তু "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতের" প্রসাদে আধুনিক বাংলাভাষা শ্রীরামকৃষ্ণ-কথিত বাণীমাধুর্যে ধন্য।

শ্রীরামকৃষ্ণজীবন ও বাণীর অনুধ্যানের প্রেরণা যাঁদের কাছে পেয়েছি, তাঁদের মধ্যে সর্বাগ্রে পিতৃদেব ৺যোগেশচন্দ্র ঘোষ স্মরণীয়। আমার বাল্যস্মৃতির উজ্জ্বলতম সম্পদের একটি—ভোর তিনটে সাড়ে তিনটের সময় উঠে হাতমুখ ধুয়ে ঠাকুরবেদীর সামনে বাবার ধ্যান করতে বসা। নিত্যপাঠের জন্য 'কথামৃত', 'গীতা', 'চণ্ডী' থাকতো ঠাকুবসিংহাসনের পাশে। শৈশবের কৌতূহলে কথামৃতের পাতা উল্টে যেতাম। কত রকমের গল্প পাতায় পাতায় ছড়ানো !

আর একটু বড়ো হয়ে রেঙ্গুনে রামকৃষ্ণমিশন-পরিচালিত গ্রন্থাগারের সভ্য হয়েছি। তখনকার গ্রন্থগারিক স্বামী শান্তস্বরূপানন্দজীর মধুময় কণ্ঠ আর সৌম্য প্রশান্তি আজো মনে পড়ে। প্রথম বই পড়েছিলুম 'রামকৃষ্ণের কথা ও গল্প'—স্বামী প্রেমঘনানন্দজীর অমর সাহিত্যসৃষ্টি।

রেঙ্গুন রামকৃষ্ণমিশন সেবাশ্রম (সম্প্রতি যেটির দায়িত্ব ব্রহ্মসরকার গ্রহণ করেছেন) ব্রহ্মদেশবাসী ও ব্রহ্মপ্রবাসী সর্বজনের শ্রদ্ধা ও প্রীতি আকর্ষণ কবেছিল। এই হাসপাতালের তদানীন্তন সম্পাদক স্বামী পুণ্যানন্দজী (পরবর্তী-কালে রহড়া রামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা) শ্রীবামকৃষ্ণ ও তাঁর সন্তানদের জন্মতিথি-পালন-উপলক্ষ্যে যে সব উৎসবের আয়োজন করতেন সে সব উৎসবে প্রসাদের আয়োজন লোভনীয় ছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু স্বামী পুণ্যানন্দজীর সরল ভাবতন্ময় জীবনী-আলোচনা এবং অপূর্ব সংগীত-পরিবেশন শুনবার সৌভাগ্য যাঁদের হয়েছে, তাঁরাই শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনসাধনার আদর্শপ্রচারে তাঁর নিজস্ব কৃতিত্ব অন্তরের সঙ্গে স্বীকার করবেন। প্রথম শৈশবে যাঁদের কাছে শ্রীরামকৃষ্ণসংস্কৃতির উত্তরাধিকার পেয়েছিলাম, তাঁদের সকলের উদ্দেশে আমার প্রণাম।

তখন আমার বয়স চার কি পাঁচ। সুদূর রেঙ্গুন থেকে ব্যাকুল আগ্রহ নিয়ে বাবা ও মা বেলুড়মঠে এলেন শ্রীরামকৃষ্ণসন্তান, মঠ ও মিশনের দ্বিতীয় অধ্যক্ষ মহাপুরুষ শিবানন্দজীর কাছে দীক্ষা নিতে। শৈশবের সব কথা আমাদের মনে থাকে না, অথচ আশ্চর্য, কোন কোন স্মৃতি আপনিই মনে চিরদিনের মতো দাগ কাটে। মহাপুরুষ স্বামী শিবানন্দজীর স্মৃতিচিত্রটি আমার মন থেকে আজও মুছে যায় নি; সমকালের আর কোন ঘটনাই মনে এত স্পষ্ট, এত উজ্জ্বল নয়।

সিঁড়ি দিয়ে অগণিত ভক্তেরা উঠছেন একে একে। কোন গুজরাটি ভক্তদম্পতির হাতে একটি পুষ্পস্তবক। মহাপুরুষ-মহারাজ তাঁর জীর্ণ হাঁপানিক্লান্ত দেহ নিয়ে বসে আছেন খাটের উপব। বিরাট হাত পাখা হাতে বাতাস করছেন কোন ব্রহ্মচারী।

আব কিছু নয়, আর কোন কথাই মনে নেই। তারপর নানাভাবে মহাপুরুষ মহারাজের ত্যাগবৈরাগ্যময় অনুভূতিদীপ্ত জীবনের কথা শুনেছি, পড়েছি। আর ধীরে ধীরে অনুভব কবেছি কেন যীশু বলেছিলেন, যারা আমাকে দেখেছ, তারা আমাব স্বর্গরাজ্যের পিতা ভগবানকেও দেখেছ।

ছাত্রজীবনে শ্রীরামকৃষ্ণপ্রেরণা যাঁদের জীবনে, আচরণে, আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়ে মননভূমি গড়ে তুলেছে, তাঁদের মধ্যে স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দ, স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, স্বামী নিরাময়ানন্দ, স্বামী মৃত্যুঞ্জয়ানন্দ, স্বামী কৃপানন্দ প্রমুখ রামকৃষ্ণ মিশনের বিশিষ্ট সন্ন্যাসীবৃন্দের সান্নিধ্যসৌভাগ্যলাভ এ জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলীর অন্যতম।

নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম (পূর্ব পরিচয়ে পাথুরিয়াঘাটা রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম) এবং আশ্রমের বর্তমান সম্পাদক স্বামী লোকেশ্বরানন্দজী— যাঁর স্নেহচ্ছায়ায় শ্রীরামকৃষ্ণ-অনুধ্যানেব সবরকম সুযোগ ও সহায়তা পেয়েছি, তাঁর কথা আজ সমগ্র দেশবাসীই জানেন। দেবঋণ, পিতৃঋণের মতো ঋষিঋণও আছে। কিন্তু সত্যি সত্যি এ তিন ঋণের কোনটি শোধ করা যায়?

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রজীবনে পাঠ নেবার সময় শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীজনার্দন চক্রবর্তী মহাশয় একদিন আলোচনাপ্রসঙ্গে বলেছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ কামকাঞ্চন ত্যাগ করেছিলেন। কারণ, এ যুগে ওই দুটি ত্যাগেরই সবচেয়ে প্রয়োজন ছিল। কামের শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা ফ্রয়েড এবং কাঞ্চনের শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা

মার্কস্। তাঁদের বক্তব্যের জবাব দেবার জন্য একজনের প্রয়োজন ছিল—তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ।

শ্রদ্ধেয় অধ্যাপকের কথাগুলি ঠিক তাঁর মতো করে লেখা হ'ল না। তবু, যতদূর মনে পড়ছে এই তাঁর মূল বক্তব্য ছিল। আমার শ্রীরামকৃষ্ণচিন্তায় ওই কথাগুলি অনেক পরিমাণে পথনির্দেশ করেছে, এ কথা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি।

জাতীয় অধ্যাপক ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং বর্তমান বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রবীন্দ্র-অধ্যাপক শ্রীপ্রমথনাথ বিশীর রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের প্রতি শ্রদ্ধা ও অনুরাগ আমাকে প্রেরণার পাথেয় দিয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়োত্তরজীবনে উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী মনীষা সম্বন্ধে চিন্তা করতে গিয়ে প্রথম অনুভব করলাম শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাবধারা সম্বন্ধে তথাকথিত শিক্ষিতসমাজ কত স্বল্প পরিচয়ে কত বেশী মতামত প্রকাশ করে থাকেন। রাজা রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ অবধি উনিশ শতকের নানামুখী চিন্তাধারার সঙ্গে যত ঘনিষ্ঠ পরিচয় হ'ল ততই রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের পূর্ণাঙ্গ অধ্যাত্মপ্রচেষ্টার ব্যক্তিগত জাতীয় ও সমগ্র বিশ্বগত সার্থকতার উপলব্ধি অন্তরে দৃঢ়তর হতে লাগল। বিবেকানন্দ-শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে প্রকাশিত 'বিবেকান্দ ও বাংলা সাহিত্য' বইটিতে সেই চিন্তাধারার কিছু প্রকাশ রয়েছে। "ভারতাত্মা শ্রীরামকৃষ্ণ" সেই প্রবহমান চিন্তাধারারই আর একটি প্রকাশ।

প্রকাশকবন্ধু শ্রীসুনীল মণ্ডল যখন শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে একটি আলোচনাগ্রন্থ লিখতে বছর দুই আগে আমায় অনুরোধ করেন, তখন তাঁর এই অর্থ-প্রত্যাশাহীন আগ্রহই আমাকে উৎসাহিত করে। "কল্যাণী" পত্রিকার সম্পাদক শ্রীশঙ্কর সেনগুপ্তের উৎসাহে ও অনুপ্রেরণায় উক্ত পত্রিকায় তখন 'শ্রীবামকৃষ্ণ পরমহংস' নামে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়ে গেছে। বর্তমান গ্রন্থে সে লেখাটির নাম 'শ্রীরামকৃষ্ণ: যুগ জীবন সাহিত্য'। বিবেকানন্দ-শতবার্ষিকী স্মরণে 'রামকৃষ্ণ বিবেকান্দ' লেখাটিও ঐ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তবু, পুস্তক-আকারে প্রকাশ করতে আমি দ্বিধান্বিত ছিলাম।

এমন সময় একদিন আকস্মিক দুর্ঘটনায় জন্ম-মৃত্যুর ব্যবধানের পর্দাটি সরে গিয়েছিল। সেই মুহূর্তের অভিঘাতে জীবনের অন্তরতম সত্যটি নিজের কাছে

ধরা পড়ল। তাই এ গ্রন্থ যতটা পাঠকের উদ্দেশে, তার চেয়ে বেশী নিজের উদ্দেশে লেখা। তবু, সমানধর্মা আরো অসংখ্য মনের যোগসূত্রে এ গ্রন্থের বক্তব্য, শুধু একজনেরই বক্তব্য নয়।

এ গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করতে গিয়ে ছাত্রবন্ধু শ্রীমান সুশীল কুমার চক্রবর্তী হাসিমুখে যে অক্লান্ত পরিশ্রম শক্তি ও সহনশীলতার পরিচয় দিয়েছে তা সাধারণ সাধুবাদের উর্ধ্বে। স্নেহাস্পদ শ্রীগীঠান ভট্টাচার্যের সহযোগিতা সানন্দে স্মরণীয়। সাহিত্যসাধনার ব্রতে মহৎ মননের আদর্শে শৈশব থেকেই যাঁরা প্রেরণা দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে সর্বাগ্রে স্মরণীয় স্বামী নিরাময়ানন্দ (বর্তমানে চেরাপুঞ্জী রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ), স্বামী রঘুবীরানন্দ, স্বামী শুদ্ধসত্ত্বানন্দ (বর্তমানে দেওঘর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের অধ্যক্ষ) শ্রীজিতেন্দ্র চক্রবর্তী (দেওঘর বিদ্যাপীঠের ভূতপূর্ব শিক্ষাব্রতী ও কংগ্রেসের স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম নীরব কর্মী), শ্রীজগদ্বন্ধু শেঠ (বিদ্যাপীঠের প্রাক্তন ছাত্র ও আদর্শ শিক্ষাব্রতী)।

রামকৃষ্ণ মিশনের বাংলা মুখপত্র 'উদ্বোধনে'র সঙ্গে আকৈশোর যোগাযোগ এখন অবধি যাঁদের স্নেহে ও অনুপ্রেরণায় অব্যাহত রয়েছে, সেই স্বামী সুন্দরানন্দ, স্বামী শ্রদ্ধানন্দ, স্বামী নিরাময়ানন্দ ও বর্তমান সম্পাদক স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ প্রমুখ সম্পাদকবৃন্দের কাছে আমার অশেষ ঋণ উল্লেখযোগ্য।

গ্রন্থ প্রকাশের পূর্বমুহূর্তে স্বর্গত আচার্য ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত মহাশয়ের অপরিমেয় স্নেহ ও শুভেচ্ছার কথা মনে পড়ছে। এ বইটি তাঁর হাতে তুলে দেবার সৌভাগ্য হল না। তবু জানি তাঁর সঙ্গে কেবল ইহজন্মের সম্বন্ধ নয়। লোকান্তরের দিব্যধাম থেকে তিনি আমায় আশীর্বাদ করুন—এই প্রার্থনা।

এ গ্রন্থের তথ্যসংগ্রহে প্রধানতঃ নির্ভর করেছি স্বামী সারদানন্দজী লিখিত "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ" এবং শ্রীম-লিখিত "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত"—এ দুটি আকরগ্রন্থের উপর। এ এছাড়া উদ্বোধন-কার্যালয়-প্রকাশিত স্বামী নিরাময়ানন্দ-সম্পাদিত 'স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা' (দশ খণ্ড) এবং পূজনীয় স্বামী গম্ভীরানন্দজী লিখিত 'শ্রীমা সারদাদেবী' ও 'শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা' প্রভৃতি গ্রন্থের সহায়তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বিশ্বসাহিত্যে 'লীলাপ্রসঙ্গ' ও 'কথামৃতে'র সঙ্গে তুলনীয় গ্রন্থ খুব বেশী নেই। বাংলাসাহিত্যে মহাকবি কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত" এবং

য়ুরোপীয় সাহিত্যে "বাইবেল"—এ দুই মহাগ্রন্থের সঙ্গেই এদের তুলনা চলে। এ গ্রন্থে শ্রীরামকৃষ্ণজীবনের সাধনা ও মননের দিকটিই বেশী আলোচিত। ব্যক্তিগত স্মরণ ও জাতিগত মনন—দুইই এ গ্রন্থের উদ্দেশ্য। যাঁদের চিন্তাধারার সংঘাতে ও সম্মেলনে এ গ্রন্থের চিন্তাধারা গড়ে উঠেছে তাঁদের সবাই আমার কৃতজ্ঞতাভাজন। শুধু স্বামীজীর একটি কথা এই প্রসঙ্গে সকলের কাছে নিবেদন করি—'এই অদ্ভুত রামকৃষ্ণচরিত্র তোমার ক্ষুদ্র বিদ্যাবুদ্ধি দিয়ে যতদূর সাধ্য আলোচনা কর, অধ্যয়ন কর—আমি তো তাঁর লক্ষাংশের একাংশও এখনও বুঝতে পারি নি—ও যত বুঝবার চেষ্টা করবে, ততই সুখ পাবে, ততই মজবে।' [স্বামী শুদ্ধানন্দের 'স্বামীজীর অস্ফুট স্মৃতি']

এ গ্রন্থপ্রকাশে শ্রীসুনীল মণ্ডল, যে আন্তরিকতার পরিচয় দিয়েছেন, আজকের দিনে তা একান্ত দুর্লভ। শিল্পী প্রণব শূর ও সহৃদয় সাহিত্যরসিক শ্রীতুলসী দাসের সহযোগিতাও এই সঙ্গে বিশেষভাবে স্মরণীয়।

পিতৃদেবের অকালে আকস্মিক প্রয়াণের পর যে মায়ের স্নেহ বিশ্বজননীর চিরন্তন স্নেহের কথা অনুক্ষণ অন্তরে জাগিয়ে রেখেছে সেই আমার অনন্যা মাকে প্রণাম করে গ্রন্থারম্ভের মঙ্গলাচরণ সমাপ্ত করি।

৯ই ভাদ্র,
কর্মিভবন
নরেন্দ্রপুর
২৪ পরগণা

প্রণব রঞ্জন ঘোষ
অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
ও
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ

এক

উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে সমুদ্র। আমাদের ভারতবর্ষ। ধ্যানমৌন প্রশান্তির চরণ স্পর্শ করে কর্মে প্রেমে উদ্বেলিত জীবনসমুদ্র। সমাধির তন্ময়তা থেকে কীর্তনের বিহ্বল আনন্দ। হৃদয়ের সঙ্গে মস্তিষ্কের একাত্ম যোগ। সমগ্র ভারতবর্ষকে প্রণাম করি, ভারতাত্মা শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রণাম।

উনিশ শতকের সংস্কারবন্যায় আমাদের সমস্ত নিজত্ব যখন ভেসে যাবার মুখে তখন ভারতসংস্কৃতির এই প্রাণময় বিগ্রহ তাঁর অমৃত-হাসির উদ্ভাসনে বাংলাদেশকে তথা ভারতবর্ষকে রক্ষা করেছেন, ধারণ করেছেন। এ যে কত বড় সত্য সেকথা পৃথিবীর আর সব সভ্যতার ইতিহাস অনুধাবন করলেই দেখতে পাই। গ্রীসের সভ্যতা তার পুনরুজ্জীবনে নতুনভাবে রূপান্তরিত হয়ে নবসংস্কৃতির সৃষ্টি করেছে। কিন্তু নিজে সে নিঃশেষে বিলুপ্ত। রোম সাম্রাজ্যের বিস্তৃত ধূলিজালে কোথাও সেই সব অপূর্ব শাসনপ্রতিভার নিদর্শন মেলে না। পৃথিবী পরিবর্তিত। মহেঞ্জোদাড়ো এখনও প্রত্নতাত্ত্বিকের মুখাপেক্ষী; মায়া সভ্যতা বণিকের শাসনদণ্ডে সম্পূর্ণ তিরোহিত। প্রবলতর শক্তি বা শ্রেষ্ঠতর সভ্যতার কাছে পৃথিবীর বেশীর ভাগ দেশ তাদের স্বাতন্ত্র্যকে বিসর্জন দিয়েছে। এই আত্মহত্যার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আজ অবধি যে কটি সভ্যতা মানব-ইতিহাসের সঙ্গী হয়ে আছে, বৈদিকসভ্যতা তাদের অন্যতম। ভারতবর্ষের সব সঙ্কটে এই সভ্যতার

মর্মকোষ থেকে এক একজন অধ্যাত্মসাধকের আবির্ভাব ঘটেছে। সমস্ত পরিবর্তনের মধ্যে দাঁড়িয়ে তাঁরা চিরন্তন সত্যের দীপাধারটি তুলে ধরে প্রার্থনা করেছেন, 'জ্যোতির্গময়'। আমাদের বিচিত্র জীবনধারার অন্তরালে ভাগবত-অনুভবের ঐতিহ্য প্রবাহিত হয়ে এসেছে বলেই এমন আবির্ভাব আমরা সম্ভব করে তুলতে পেরেছি।

কত মানুষের ধারা এই মহামানবের সাগরে এসে মিলেছে। তাই উত্তরে, দক্ষিণে, পূবে, পশ্চিমে, কত জাতি, কত জীবন, কত দৃষ্টিভঙ্গী। শুধু তো উপনিষদ পুরাণের প্রবাহই নয়, জরথুস্ত্রের অনুগামীরা এসেছেন, ইস্‌লামের অনুরাগীরা এসেছেন, এসেছেন যীশুখৃষ্টের শরণাগত ভক্ত। তাঁরা যে শুধু রাজ্যশাসনে, অর্থনৈতিক অধিকারে, সামাজিক সঙ্ঘাতেই এসেছেন—তা নয়। এদেশেব জল হাওয়া মাটির মতোই এঁরা ভাবনা চিন্তায় মিশে গেছেন, মিশে গিয়েও বিশিষ্ট থেকেছেন। তখন এঁদের দৃষ্টিভঙ্গীকে যাচাই করবার প্রশ্ন এসেছে। দলে দলে দেখা দিয়েছে ফকির, বাউল, সহজিয়া—যাঁবা মানুষের সব রকম বাইরের ভেদাভেদ ছেড়ে অন্তবের মিলনের কথা বললেন। বললেন ঃ সবার উপরে মানুষ সত্য। আর মানুষের 'মনের মানুষ'কে সবার উপর ঠাঁই দিলেন।

জীবন-যাপনের মূলে আছে জীবনদর্শন। সেখানে যদি ঐক্য না থাকে বাইরের কোন ঐক্যই মানুষকে বেঁধে রাখতে পারে না। আউল বাউল ফকির-সাধকেরা সেই ঐক্যকে জাত-বিচারের গণ্ডী ছাড়িয়ে অনুভব করেছিলেন। লোকমত আর সম্প্রদায়—এদের চেয়ে বড় বাধা তো সাধকের আর কিছু নেই। তাই তাঁরা গাইলেন—

তোমার পথ ঢাইক্যাছে মন্দিরে মসজেদে।
তোমার ডাক শুনি সাঁই, চল্‌তে না পাই—
রুখে দাঁড়ায় গুরুতে মুর্‌শেদে'

গাইলেন—'আমার মনের মানুষ যে রে, আমি কোথায় পাবো

তারে ?' শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন : "আমি বলি, সকলেই তাঁকে ডাক্‌ছে। দ্বেষাদ্বেষির দরকার নাই। কেউ বল্‌ছে সাকার, কেউ বল্‌ছে নিরাকার। আমি বলি, যার সাকারে বিশ্বাস, সে সাকারই চিন্তা করুক, যার নিরাকারে বিশ্বাস সে নিরাকারই চিন্তা করুক। ....
কবীর বল্‌তো, 'সাকার আমার মা, নিরাকার আমার বাপ।
কাকো নিন্দো, কাকো বন্দো, দোনো পাল্লা ভারী'।"

"হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব, ঋষিদের কালের ব্রহ্মজ্ঞানী তোমরা সকলেই এক বস্তুকে চাইছো। তবে যার পেটে যা সয়, মা সেইরূপ ব্যবস্থা করেছেন। মা যদি বাড়ীতে মাছ আনেন, আর পাঁচটি ছেলে থাকে, সকলকেই পোলাও কালিয়া করে দেন-না। সকলের পেট সমান নয়। কারুর জন্য মাছের ঝোলের ব্যবস্থা করেন। কিন্তু মা সকলকেই সমান ভালবাসেন।"

"আমার ভাব কি জান ? আমি মাছ সবরকম খেতে ভালবাসি।... আমি মাছ ভাজা, হলুদ দিয়ে মাছ, টকের মাছ, বাটিচচ্চড়ি এ সব তাতেই আছি ; আবার মুড়িঘণ্টতেও আছি, কালিয়া পোলাওতেও আছি।" "মত কিছু পথ নয়।"

আবার 'যত মত তত পথ।' চিরকালের মানুষ অসংখ্য পথে সেই ভগবানের কাছে চলেছে। তিনি তো মত দেখেন না, মন দেখেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তার সাক্ষী। তাঁর সাধনায় ভারতবর্ষের সব সাধনা মিলিত।

দুই

মানুষের অন্তরতম প্রশ্নের উত্তর হিসাবে শেষ অবধি এক সত্যের সাগরসঙ্গমে সব ধারা মিলিত হলেও, পন্থা পৃথক থেকে গেছে চিরদিন। একটি মানুষের সঙ্গে ব্যক্তি হিসাবে আর একটি মানুষের যেমন

পার্থক্য, তেমনি পার্থক্য রয়েছে প্রতিটি ব্যক্তির সাধনপন্থায়। অথচ দেখা যায় অনুভবের ক্ষেত্রে সকলের আশ্চর্য সৌসাদৃশ্য। ভারতবর্ষে ঐ অনুভবটি এত স্বতঃসিদ্ধ যে আজ একথা অনাবশ্যক পুনরুক্তি বলে মনে হয়। কিন্তু উক্তি পুরনো হতে হতে তার জীবন-সত্যও পুরানো হয়ে যায়। বোধকরি, সেই কারণেই সত্যকে পেতে হলে কথা নয়, জীবন প্রয়োজন। তাই তো জীবনীচর্চার সার্থকতা।

শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের মধ্য দিয়ে আমরা একবার গোটা ভারতীয় সাধনার ধারাকেই অনুভব করতে পারি। বাঙলাদেশে এই ভারতীয় সাধনা ব্রহ্মণ্যবাদের সঙ্গে বৌদ্ধপ্রভাব, বৌদ্ধ প্রভাবের অবক্ষয়ের সঙ্গে তন্ত্রসাধনা, তন্ত্রের পাশাপাশি বৈষ্ণব ভাবের বন্যাধারা, ইসলামের রক্ষণশীল মনোভাবের সঙ্গে সুফী সাধনার প্রিয়তম মন্ত্র—সব কিছুতে মিলে এক বিচিত্র রহস্যময় রূপ নিয়েছিল। উনিশ শতকে খৃষ্ট-ধর্মের নামে প্রতীচ্য সভ্যতার দুর্নিবার আকর্ষণ এসে একেবারে রূপান্তর ঘটাতে বসেছিল। তখন এই বহুশাখায়িত হিন্দুধর্মের মূল কাণ্ডটি খুঁজে নেওয়ার একটি প্রবল চেষ্টা দেখা দিল ব্রাহ্মধর্মের আন্দোলনে। সে আন্দোলন এই অর্থে বুদ্ধিধর্মী যে, তার প্রবর্তকদের কেউ ঈশ্বরের সাথে আলাপ করেন নি। চাপরাস পান নি। শ্রীরামকৃষ্ণ এই বুদ্ধিগত আন্দোলনকে জীবনসাধনার স্পর্শে পরিপূর্ণ করে তুললেন। অনুভবই সত্যের প্রাণ ও পূর্ণতা। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর সাধনসূত্রে একসঙ্গে তিনধর্মের বহুবিচিত্র ভাবের মণিখণ্ডগুলি গাঁথলেন। আর তাদেরই সঙ্গে বাঁধা পড়লো ইসলামের সাধনা, খৃষ্টধর্মের অনুভব। উপলব্ধির এই বিরাট সমুদ্রতীরে দাঁড়িয়ে বিবেকানন্দ, ব্রহ্মানন্দ কি ভেবেছিলেন, কিছুই কি বলে যেতে পেরেছেন? মনে হয় না। সবই আভাসে, ইঙ্গিতে। তার বেশী নয়।

আমরা যারা সে সমুদ্রের গল্প শুনি তাদের কাছে একথাই বড়—ভগবান আছেন। ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা করলে তাঁকে লাভ করা যায়।

শ্রেষ্ঠ সমাজের কাজ ব্যক্তিত্বের শ্রেষ্ঠ দিকগুলিকে ফুটিয়ে তোলা। ব্যক্তি যদি যথাসম্ভব সর্বাঙ্গীণ সমুন্নতি লাভ করতে পারে, তাহলে সমাজও তার দায়িত্ব পালনের গৌরববোধের অধিকারী। প্রাচীন ভারতবর্ষের ধর্মাশ্রয়ী সমাজ-চেতনার একটি বিশেষ প্রকাশ ঘটেছিল ব্রাহ্মণ্য-সংস্কৃতির মধ্যে। যতদিন এই সংস্কৃতি জন্মের চেয়ে কর্মকে বড় বলে জেনেছিল, ততদিন তার মধ্যে সজীবতা ছিল। পরবর্তীকালে সেই সজীবতা অনেক পরিমাণে নষ্ট হলেও আমাদেব আদর্শের জগতে ব্রাহ্মণোচিত গুণাবলীই আজ অবধি মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠ সম্পদরূপে স্বীকৃত। এই গুণাবলীর প্রধান কয়েকটি সম্পদ হল—নিষ্ঠা, ত্যাগ সাধনা, সারল্য, সত্যোপলব্ধি। মূলতঃ পৃথিবীর সব দেশের মানুষই এইসব গুণাবলীর প্রতি শ্রদ্ধান্বিত অর্থাৎ ব্রাহ্মণের আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত। এযুগে জাতিভেদের সঙ্কীর্ণ সীমা যখন মুছে যেতে চলেছে, তখনই এই আদর্শের কথা বিশেষভাবে স্মরণীয়। কারণ, মনুষ্যত্বের আদর্শ ভুলে গেলে আমাদেরই সবচেয়ে বড় ক্ষতি।

ভারতবর্ষের নিতান্ত পথ-চলতি মানুষ থেকে শুরু করে মহামহিম সম্রাট অবধি সকলেই জানতেন যে এক পবম সত্য জগতের সব ক্ষণসত্যের আড়ালে রয়েছেন। যুগে যুগে মানুষের কল্পনায় তাঁর বিচিত্র রূপান্তর দেখা দিয়েছে মাত্র। এদেশের এই যুগযুগান্ত প্রতিষ্ঠিত স্থির বিশ্বাসের বিরুদ্ধে প্রথম সত্যিকার বিদ্রোহ ঘোষণা করল পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের ইহলোকসর্বস্বতা। এই প্রতিবাদ এখন অবধি ভারতের চিন্তাশীল সমাজকে দ্বিধাগ্রস্ত করে রেখেছে। বোধ করি, সেই কারণেই ভারতবর্ষ ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হতে বাধ্য হয়েছে।

জড়বাদী বিজ্ঞানমূলক এই চিন্তাধারার পটভূমিতে ভারতের ব্রাহ্মণ্য-সংস্কৃতির কী মূল্য রয়েছে, সে কথাটি মনুষ্যত্বের নিকষে যাচাই করে নেবার প্রয়োজন আজও চলে যায় নি। বরং যতদিন যাচ্ছে, যত সভ্যতা ও মানবতায় দুস্তর বাধার সমুদ্র দেখা দিচ্ছে ততই বস্তুর অতীত কোন মহত্তর সত্যকে জানবার ও বুঝবার প্রয়োজন আরো বেশী বলে মনে হচ্ছে। এই উপলব্ধির শুভ সূচনা আমরা শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনে বিশেষভাবে লক্ষ্য করি। তর্ক, পাণ্ডিত্য বা গ্রন্থ রচনার দ্বারা নয়, জীবনের দ্বারা শ্রীরামকৃষ্ণ ভারতীয় সাধনার পরম সার্থকতা প্রতিপন্ন করেছিলেন—এই জন্যই তিনি যুগস্রষ্টা।

সঙ্কল্পকে কর্মে পরিণত করার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে যে অপরিসীম উদ্যম ও নিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায়—সেই দৃষ্টান্তটি আমাদের সর্বদা স্মরণীয়। সাধনার জন্য যখন যেটি করা প্রয়োজন, তিনি সারা মন প্রাণ ঢেলে করতে পারতেন। এর জন্যে বিশেষ একটি প্রণালী বা সংস্কারের মধ্য দিয়ে যাবার প্রয়োজন হয়েছিল। ব্রাহ্মণের বাহ্য আচার বিচারও কঠোরভাবে পালন করতে হয়েছে।

আব এই কঠোর আচার-অনুষ্ঠান পালনের মধ্য দিয়েই ধীরে ধীরে তিনি সকল ধর্মসাধনার অন্তরালে নির্মল মনুষ্যত্বের যোগসূত্রটি আবিষ্কার করে ইসলাম বা খ্রীষ্ট ধর্মের সাধনানুভূতির অধিকারী হতে পেরেছেন। মূলতঃ মাতৃভাবের সাধক হলেও মধুর হ'তে দাস্য—সব ভাবেই অন্তরের পরিপুষ্টি সাধন করেছেন। ভক্ত হয়েও অদ্বৈতের উপলব্ধিতে ব্রহ্মস্বরূপ হতে পেরেছেন।

'এ যুগে তাঁর ত্যাগই হলো বিশেষত্ব'—শ্রীশ্রীমায়ের এই কথাটিব মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ-চরিত্রের স্বধর্মটি ফুটে উঠেছে। সমন্বয়—এক হিসাবে ভারতের চিরন্তন বাণী। ত্যাগ—সেও ভারতবর্ষের চিরন্তন আদর্শ। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগে একটি নূতন বৈশিষ্ট্য রয়েছে। তাঁর ত্যাগই স্বভাব। কাম্-কাঞ্চনের প্রশ্ন তাঁর জীবনেও এসেছে—কিন্তু অন্তরের

স্বধর্ম তাঁকে নিবিড়তর আনন্দের পথে নিয়ে গিয়ে সংসারের সর্বজন-কাম্য বস্তু দুটি থেকে একেবারে বিরত করেছে। অর্থনীতি বা কামসূত্র এই বিশ শতকের মনীষীদের কাছে জীবনরহস্যের একমাত্র চাবিকাঠি বলে মনে হয়েছে। কিন্তু নূতনত্বের এই চমকও কেটে যেতে দেরি নেই। একথা মর্মে মর্মে সব জাতিকেই অনুভব করতে হবে যে ত্যাগেই মনুষ্যত্বের মহিমা।

ইউরোপীয় সাহিত্যের আধুনিক লেখকেরা কেউ কেউ খ্রীষ্টজীবন ও সাধনাকে গল্পে, উপন্যাসে, কাব্যে ও জীবনী সাহিত্যে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করছেন। আধুনিক কালের মনন-সঙ্কট খ্রীষ্টজীবনে সংশয়িত জিজ্ঞাসার সমাধানপ্রার্থী। কিন্তু যতদিন ইউরোপের মনে জড়বাদের সঙ্গে অধ্যাত্মবাদের গোঁজামিলের চেষ্টা চলবে, ততদিন নকল অধ্যাত্মবাদ ইউরোপকে শান্তির পথ দেখাতে পারবে না।

এক একটি মানুষের মধ্য দিয়ে কোন কোন যুগে সমগ্র জাতির ও যুগের সাধনা নিষ্পন্ন হয়। সমগ্র ঊনবিংশ শতাব্দীর অধ্যাত্মচিন্তার পরিমণ্ডলটি শ্রীরামকৃষ্ণ-সাধনার মধ্যে যথার্থ কেন্দ্র খুঁজে পেয়েছিল। সকল ভাবের ভাবুক ও রসিকের প্রাণের তৃষ্ণা তাঁর কাছে এসে তৃপ্ত হত। বুদ্ধিবাদী বঙ্কিম, পরহিতব্রতী বিদ্যাসাগর, ঈশ্বর-অভিলাষী কেশবচন্দ্র—এঁদের সকলের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আলাপের বিবরণ পাঠ করে অধ্যাত্ম উপলব্ধির ক্ষেত্রে তাঁর অনন্যসাধারণ প্রজ্ঞার কথা যেমন মনে হয়, তেমনি মনে হয় সকল স্তরের মানুষকে একটি সূত্রে গেঁথে দেবার ক্ষমতাও তাঁর কী অসাধারণ ছিল! তত্ত্বজ্ঞানী শশধর তর্কচূড়ামণি; জীবনের পঙ্কিলতায় পথভ্রান্ত গিরিশচন্দ্র; যুক্তি, বুদ্ধি ও প্রতিভার জ্বলন্ত বিগ্রহ নরেন্দ্রনাথ; বিশ্বাস ও ভক্তিতে বিগলিত-আত্মা নাগ মহাশয়—সব পথের ও মতের মানুষকে তিনি একটি সত্যের অনুবর্তী করে উনিশ শতকের যুগ-সাধনা সফল করে গিয়েছেন। কিন্তু এ সাধনার আড়ালে রয়েছে তাঁর সুদীর্ঘ অধ্যাত্ম-

সাধনার ইতিহাস। সে ইতিহাসও এমনি সকল মতের সকল পথের পরম মিলনের ইতিকথা।

ব্যক্তি থেকে সমাজ, সমাজ থেকে যুগ, আবার যুগ থেকে ব্যক্তি। ব্যক্তি শ্রীরামকৃষ্ণের ব্যক্তিত্বটি কেমন ছিল? এক কথায় বলতে গেলে, তিনি সরল ছিলেন। তাই আমরণ ওই সরলতার উপদেশ দিয়ে গেছেন, বলেছেন, "সরল না হ'লে তাঁকে পাওয়া যায় না।" কিন্তু এই সরলতার অর্থ কি? মানব মনের বিচিত্র বিকাশের মধ্যে সংসারের লাভ ক্ষতি, দেনা-পাওনা স্বভাবতঃই জটিলতার সৃষ্টি করে। তাই এ সরলতার মূলভাবটি অপার্থিব ভাব—এ সরলতা নির্বাসনা-জনিত পরমা শান্তির মধ্যে থেকে অদ্ভুত। দৈনন্দিন কর্মের খুঁটিনাটি, মানব মনের নানা বৈচিত্র্য, ইহসংসারের সহস্র ভাবপ্রবাহ—সব কিছু সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণ সজাগ ছিলেন; অথচ সংসারসমুদ্রের জল ওই পরমহংসের শুভ্র পক্ষ দুটিকে সিক্ত করতে পারে নি। সব কিছুর মধ্যে থেকেও তিনি সব কিছুর উর্ধ্বে থেকেছেন।

কল্পনায় দক্ষিণেশ্বরের কালীমন্দিরটিতে চলুন। ওই সিঁড়ি বেয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরটির দরজায় এসে দাঁড়ান। ছোট্ট খাটটির উপর বসে ঠাকুর একের পর এক নানা কথা বলে চলেছেন। তাঁর কথায় কখনো একটি গল্প, কখনো মানব চরিত্রের একটি দিক, কখনো পরিহাসরসোজ্জ্বল একটি দৃষ্টান্ত, কখনো নানা জনের সঙ্গে নানা ভাবে—যে যে-ভাবের উপযুক্ত সেই ভাবে আলাপ, কখনো আপনাতে আপনি তন্ময়—বিশ্ব-জননীর সঙ্গে বাক্যালাপে মগ্ন—অথচ সব সময় মধুময় আনন্দে উদ্ভাসিত মুখমণ্ডল—এমনি একটি মানুষ। অলক্ষিতে তাঁর মধ্য দিয়ে জগতের এপারে ওপারে রাখীবন্ধন হয়ে চলেছে। হয়তো বলছেন, "বিশ্বাস করো—নির্ভর করো—তা হ'লে নিজের কিছু করতে হবে না! মা কালী সব করবেন! জ্ঞান সদর মহল পর্যন্ত যেতে পারে। ভক্তি অন্দর মহলে যায়।"

গল্প বলছেন কোন দিন—"দেখ, একটা গল্প শোনো। একজন রাজা ছিল। একটি পণ্ডিতের কাছে রাজা রোজ ভাগবত শুনতো। রোজ ভাগবত পড়ার পর পণ্ডিত রাজাকে বলতো, রাজা বুঝেছ? রাজাও রোজ বলতো, তুমি আগে বোঝ! ভাগবতের পণ্ডিত বাড়ি গিয়ে রোজ ভাবে যে, রাজা রোজ এমন কথা বলে কেন। আমি রোজ এত করে বোঝাই আর রাজা উল্‌টে বলে, তুমি আগে বোঝো! একি হলো! পণ্ডিতটি সাধন ভজনও করতো। কিছুদিন পরে তার হুঁস হলো যে ঈশ্বরই বস্তু, আর সব—গৃহ, পরিবার, ধন, জন সম্ভ্রম সব অবস্তু। সংসারে সব মিথ্যা বোধ হওয়াতে সে সংসার ত্যাগ করলে। যাবার সময় কেবল একজনকে বলে গেল যে, রাজাকে বলো যে এখন আমি বুঝেছি।"

ভগবৎ করুণার কথায়—"হাজার বছরের অন্ধকার ঘরে যদি আলো আসে, সে কি একটু একটু করে আলো হয়? না একেবারে দপ করে আলো হয়?"

হয়তো আত্মপরিচয়—"পরমহংস দুই প্রকার। জ্ঞানী পরমহংস আর প্রেমী পরমহংস। যিনি জ্ঞানী তিনি আপ্তসার—'আমার হলেই হলো।' যিনি প্রেমী যেমন শুকদেবাদি, ঈশ্বরকে লাভ করে আবার লোকশিক্ষা দেন। কেউ আম খেয়ে মুখটি পুঁছে ফেলে, কেউ পাঁচজনকে দেন।"

ভক্ত তাঁকে বাতাস করছেন পাখা দিয়ে। সেই পাখাটি হাতে নিয়ে বলছেন, "এই পাখা যেমন দেখছি—সামনে প্রত্যক্ষ—ঠিক অমনি আমি (ঈশ্বরকে) দেখেছি।"

কামারপুকুর

কামারপুকুর গিয়েছি দু'বার। আশ্চর্য, দু'বারই ছিল পূর্ণিমা। প্রথম-বার দোল, দ্বিতীয়বারে কোজাগরী। পূর্ণের পদপরশ যেখানে পড়েছে, হয়তো পূর্ণিমাই সেখানে যাওয়ার যোগ্য তিথি। অন্ততঃ আমার ভাগ্য এই বাঞ্ছিত যোগাযোগ সাধন করেছে বলে আমি কৃতজ্ঞ।

শ্রীচৈতন্য জন্মেছিলেন দোলপূর্ণিমায়। শ্রীরামকৃষ্ণ দ্বিতীয়ায়। পক্ষ এক, মাসও ফাল্গুন। আর যোগেশ্বরী ব্রাহ্মণীর মতে 'এবার নিত্যানন্দের খোলে গৌরাঙ্গের আবির্ভাব।' অবতারতত্ত্বে উৎসুক না হলেও মানা যায় ভাবভক্তি ও নামপ্রচারের সমাধিতন্ময়তা ও উদ্দাম কীর্তনানন্দের একত্র মিলনে শ্রীরামকৃষ্ণ সত্যই গৌরাঙ্গ নিত্যানন্দের মিলিত ভাবমূর্তি।

শ্রীচৈতন্যের মতোই শ্রীরামকৃষ্ণও বার বার ভক্তির উপর জোর দিয়েছেন, বলেছেন, 'কলিযুগে নারদীয় ভক্তি।' তবু শ্রীরামকৃষ্ণ-দৃষ্টিতে চৈতন্যদেব শুধু ভক্তিবিগ্রহ ন'ন—তাঁর বাইরে ভক্তিতন্ময়তাসত্ত্বেও অন্তরে জ্ঞানীর প্রশান্তদৃষ্টি। হাতীর বাইরের দাঁত আর ভিতরের দাঁতের মতো। বাইরেরটি শোভা, ভেতরেরটি আহার গ্রহণের। এক হিসাবে শ্রীরামকৃষ্ণই সে আদর্শের প্রতীক। তাঁর ভক্তি ও জ্ঞানের মিলিত মহিমা উপলব্ধি করা যাবে গিরিশচন্দ্র ও বিবেকানন্দের আপাত বিপরীত দু'টি ব্যক্তিত্বের উন্মীলনে। তাঁর অনুভবে—'শুদ্ধ জ্ঞান ও শুদ্ধা ভক্তি এক'।

মহাপুরুষেরা একে অন্যকে পরিপূর্ণ করেন। নেতীবাদী সমালোচনা তাঁদের চিন্তার বাইরে। শ্রীরামকৃষ্ণ সে দিক থেকে শ্রীচৈতন্যদেবের সাধনাকে সম্প্রসারিত করে ভারত ও বিশ্বের বিচিত্র সাধনপন্থার সঙ্গে

যুক্ত করেছেন। এও লক্ষণীয়, বিশ্বের অধিকাংশ সাধনপন্থাই ভক্তি-কেন্দ্রিক। প্রধানতঃ ভারতবর্ষই সব নাম, রূপ ও গুণের পারে অদ্বৈত ব্রহ্মের উপাসক। 'বহু সাধকের বহু সাধনার ধারা'—শ্রীরামকৃষ্ণে মিলিত সন্দেহ নেই, কিন্তু সব সাধনার অন্তরতম সত্যে পৌঁছে শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং এক বিশ্বসাধনার প্রতীক—সে কথাই আজকের দিনে বিশেষভাবে স্মরণীয়। কামারপুকুর সেই বিশ্বসাধনার জন্মভূমি।

*

একদা অখ্যাত হ'লেও কামারপুকুর নিতান্ত সাধারণ গ্রাম ছিল না। কামারপুকুরের পথে সত্যিই লক্ষ্মীর পদচারণা ঘটেছিল। ধনধান্যে সচ্ছল এই গ্রামটি সেকালের বর্ধিষ্ণু পল্লীর মধ্যে গণ্য হ'ত। আর যাঁরা পৌরাণিক দেবকল্পনায় নিতান্ত অনিচ্ছুক ন'ন, তাঁদের মনে পড়বে সেই কাহিনী—কোন এক কোজাগরী পূর্ণিমার রাতে শ্রীরামকৃষ্ণ-জননী চন্দ্রামণিদেবী অপেক্ষা করছেন পুত্র রামকুমারের জন্য। ভুরসুবো গাঁয়ে লক্ষ্মীপূজো করতে গেছেন রামকুমার, মাঝরাত হয়ে এলো, তবু ফেরেন নি। উৎকণ্ঠিতা জননী হঠাৎ দেখলেন দূর থেকে মাঠের পথে কে যেন এগিয়ে আসছে। কাছে আসতে দেখতে পেলেন সর্বাঙ্গে স্বর্ণআভরণমণ্ডিতা এক অপূর্ব লাবণ্যময়ী নারী। জিজ্ঞেস করলেন, "মা তুমি কোথা থেকে আসছ?"

মেয়েটি বললে, "ভুরসুবো থেকে।"

"আমার ছেলে রামকুমারের সঙ্গে কি তোমার দেখা হয়েছিল? সে কি করছে?"

"তোমার ছেলে যে বাড়ীতে পূজো করতে গিয়েছে, আমি সেখান থেকেই ফিরছি। ভয় নেই, তোমার ছেলে এখনি ফিরবে।"

মেয়েটির বয়স অল্প, অপরূপ সৌন্দর্য আর আশ্চর্য সব অলঙ্কার দেখে চন্দ্রা-দেবী ভাবলেন হয়তো রাতের অন্ধকারে সে পথ হারিয়েছে। বললেন, "আজ রাতের মতো আমাদের বাড়ীতে থেকে কাল সকালে যাও না?"

মেয়েটি রাজী হল না, বললে, "না মা, আমায় এখনি যেতে হবে। তোমাদের বাড়ী আমি অন্য সময় আসব।" এই বলে পাশের লাহাবাবুদের ধানের মরাইয়ের দিকে চলে গেল।

চন্দ্রাদেবী ভাবলেন, হয়তো পথ ভুল করেছে। কিন্তু মরাইয়ের কাছে গিয়ে আর খুঁজে পেলেন না। হঠাৎ মনে হল, স্বয়ং মা লক্ষ্মীকে দেখলাম না তো? সেদিন অবশ্য স্বামী ক্ষুদিরাম চন্দ্রাদেবীর এই ধারণাই সমর্থন করেছিলেন।

সে ঘটনার কতবছর পরে কোজাগরী পূর্ণিমার জ্যোৎস্নাস্নাত কামারপুকুরে শ্রীরামকৃষ্ণমন্দিরপ্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে মনে হয়েছিল, এতদিনে বুঝি দেবীর আসার সময় হয়েছে। নাটমন্দিরে তখন লক্ষ্মীপূজার আয়োজন চলেছে। চারধারে সমাগত ভক্তবৃন্দের আনন্দ কোলাহল।

এমন অমল চন্দ্রকিরণে যখন আকাশপৃথিবী এক হয়ে গেছে, তখনই সৌন্দর্যের শতদলে শ্রীর আবির্ভাব সম্ভব। আজ তিনি সত্যিই এসেছেন চাটুজ্জেবাড়ীর আঙিনায়। শুধু সে আঙিনা আজ কোন বিশেষ বংশের নয়, সমগ্র মানবজাতির মিলনপ্রাঙ্গণ।

*

প্রথমবার কামারপুকুরে এসেছি প্রায় বছর পনেরো আগে। এখন পথ সহজতর হয়ে আসছে, সেইসঙ্গে শহরও অনেক পরিমাণে উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে পল্লীর পথে ঘাটে। এক এক সময় মনে হয়, সেই শ্যামলিম নির্জনতা বোধ হয় অনেক ভালো ছিল এই তীর্থভূমির পক্ষে। অন্ততঃ শ্রীরামকৃষ্ণের সমসাময়িক পরিবেশটুকু আজকের চেয়ে অনেক বেশি অনুভব করা যেত। দুর্গমতাই তীর্থের সাধনা। যন্ত্র ও শহর তীর্থের পক্ষে কত বড় বোঝা—এখনকার হরিদ্বাব হৃষিকেশ তার প্রমাণ।

কামারপুকুর জয়রামবাটী যে আজ কলকাতা থেকে এবেলা ওবেলায় ঘুরে আসা চলে—তীর্থযাত্রীদের পক্ষে এ সুযোগ সত্যই লোভনীয়। কিন্তু সময় সংক্ষেপ কি অনুভবের ব্যাপ্তি ও গভীরতা—দুয়েরই পক্ষে

ক্ষতিকর নয়? সেকালে নিয়ম ছিল, তীর্থে অন্ততঃ তিনরাত্রি বাস করণীয়। স্মরণ, মনন, নিদিধ্যাসন—মোটরবিহারী দ্রুততায় এর কোনটিই সম্ভব নয় আমাদের পক্ষে।
তাই সহযাত্রীদের ব্যস্ততাসত্ত্বেও তিনদিনের বেশীই থেকে গেলাম প্রথমবারে।

*

জয়রামবাটী থেকে কামারপুকুর—পথটুকু হাঁটতে হাঁটতে কখন আকাশে বাতাসে মহামুক্তির সানন্দ আহ্বান সঞ্চারিত হয়ে গিয়েছিল। সময়ের কথা ভুলে যাবার সময় তো বেশী মেলে না!
আমোদরের শীর্ণ জলরেখা পার হতে হতে সামনে দিয়ে উড়ে গেল শাদা বক! রামকৃষ্ণজীবনের প্রথম ভাবসমাধির কাহিনীটি মনে পড়ে গেল। ছোট্টবেলায় মুড়ি খেতে খেতে মাঠের আলপথ দিয়ে আসছিলেন। এমন সময় শ্যামল মেঘের বুকে একসার শাদা বকের মালা দেখে তাঁর কৃষ্ণরূপ মনে জেগেছিল—ভাবসৌন্দর্যে তন্ময় শিশু জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন।
"ছেলেবেলায় তাঁর আবির্ভাব হয়েছিল। মাঠের উপর কি দেখলুম। সবাই বল্লে, বেহুঁস হয়ে গিছলুম; কোন সাড় ছিল না। সেই দিন থেকে আর একরকম হয়ে গেলুম।" [শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত]
কাহিনীটি মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই একটু সংশয়ও জাগলো মনে। (কী এমন সৌন্দর্য দেখেছিলেন? সত্যিই কি তা অত সুন্দর?)
কামারপুকুর সেদিন বিকেলের আলোয় এ সংশয়ের উত্তর দিয়েছিল—সে কথা আমার চিরদিন মনে থাকবে।
বুধুই মোড়লের শ্মশানে গিয়েছি বন্ধুদের সঙ্গে। শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম সাধনভূমি এই শ্মশানে বেড়াতে বেড়াতে একটি গাছের তলায় যখন থেমেছি, তখন ফাল্গুনের বিকেল শেষ হয়ে এসেছে। বন্ধুর কণ্ঠে অনুরণিত হলো—'মধুর তোমার শেষ যে না পাই।'

জলেস্থলে শেষ প্রহরের আলোয় মগ্ন সেই সংগীতলহরী, আমাদের চার পাশে এক গভীর নিস্তব্ধতা এনে দিল। আর সেই মুহূর্তে উত্তর পশ্চিম কোণ থেকে পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘের গুরু গুরু মৃদঙ্গ বেজে উঠল। ত্রস্ত আমরা বেশ বুঝলাম, পালাবার উপায় নেই, এত বড় মাঠ পেরুনোর বৃথা চেষ্টা না করে এই গাছতলায় থেকে যাওয়াই ভালো। অর্ধেক আকাশ জুড়ে ওই মেঘ ঘনিয়ে আসছে, আর ঘনায়মান অন্ধকারে গানের কলি ভেসে চলেছে—'অঙ্গবিহীন আলিঙ্গনে সকল অঙ্গ ভরে।'—গানে আর গোধূলিতে মিশে এ জন্মের অবিস্মরণীয় সেই চিত্রকল্প।

একদিকে অর্ধেক আকাশ জুড়ে ঘনকৃষ্ণ মেঘ, আর একদিকে গোধূলির সোনাঝরা সন্ধ্যা। এমন অপূর্ব মিলনক্ষণে গোধূলির আকাশ থেকে একসার বলাকা নিকষ কালো মেঘের উপর দিয়ে চললো দিনান্তের আহ্বানে। মুগ্ধ বিস্মিত আমার দুচোখ ভরে দেখা দিল শ্যামলের গলার শুভ্র যূথীমাল্য—বাতাসে উড়ে উড়ে চলেছে দিক থেকে দিগন্তের পারে।

আমার সমস্ত হৃদয় প্রণত হয়ে কামারপুকুরে লুটিয়ে পড়লো। (আছে, আজো সে সৌন্দর্য তেমনই সত্য হয়ে আছে। ঠিক তেমনটিই ঘটেছিল কামারপুকুরে।)

*

দোলপূর্ণিমার জ্যোৎস্নাধৌত মন্দির প্রাঙ্গণে (তখনো নাটমন্দির হয় নি) ভক্তমণ্ডলীর সংকীর্তন চলেছে। চৈতন্যচন্দ্রের আবির্ভাবের পর থেকে বাঙালীমাত্রই এক অর্থে বৈষ্ণব। শ্রীরামকৃষ্ণ বৈষ্ণব সাধনার শ্রেষ্ঠ উত্তরাধিকারী। তাই শুধু গৌরাঙ্গপদাবলী নয়, শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্গীতও চলেছে। 'যুগে যুগে হরি নরদেহ ধরি'—এই বাংলার বুকে, ভারতের বুকে আবির্ভূত হয়েছেন—সেকথা এই মন্দির প্রদক্ষিণ করতে করতেই আরো বেশী করে মনে পড়ছে।

"তিনিই সব হয়েছেন, তবে মানুষে তাঁর বিশেষ প্রকাশ"—আর মানুষই সেই অনন্তের ধারণা করতে পারে। এক একটি অলোক-ব্যক্তিত্বের বাতায়নপথে আমরা সেই অনন্তের আহ্বান প্রত্যক্ষ করি, তাঁকেই বলি অবতার।

আমাদের অন্তরে অনন্তের মহাশক্তিকে বিশ্বজননীরূপে উদ্বোধিত করেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। তাঁর আবির্ভাবের পর থেকে আমরা শুধু বৈষ্ণব নই, শাক্তও বটে। আবার বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব, রামায়েত, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান, মুসলমান—সব সাধনার আমরা অংশীদার। কারো ভাব নষ্ট না করেই আমরা সকল ভাবে শ্রদ্ধাবান হতে শিখেছি। চিন্তার জগতে এ যে কত বড় বিপ্লব, তা কি এখনো আমরা উপলব্ধি করতে পেরেছি?

না, কোন বিপ্লবই তু'এক শতাব্দীতে বোধগম্য হয় না। 'এখনো আমরা খুব কাছে; শ্রীরামকৃষ্ণ এই সেদিন দেহত্যাগ করেছেন, এমন কি তাঁর মহাপ্রয়াণের শতবর্ষ এখনো পূর্ণ হয় নি। 'বড় ফুল ফুটতে দেরী লাগে'—শ্রীরামকৃষ্ণের এ বাণী তাঁর জীবন ও সাধনা সম্পর্কেও প্রযোজ্য। ওই জীবনসাধনা এখনো বিশ্বমানসের অন্তরালে নিঃশব্দে উন্মীলিত হয়ে চলেছে, যুগ থেকে যুগান্তরে তার এক একটি দল বিকশিত হয়ে এই মর্ত্যজীবনের অমর্ত্য মহিমা ঘোষণা করবে—এ আবির্ভাবের পূর্ণ তাৎপর্য এখনো প্রকাশের অপেক্ষায়।

*

সেই প্রথমবার কামারপুকুরে রাত্রিবাসের কথা মনে পড়ে। অতিথিশালায় স্থানাভাবের ফলে খড়ের ছাউনিদেওয়া শ্রীরমেকৃষ্ণদেবের আপন ঘরটিতেই আমাদের তিন বন্ধুর শোবার আয়োজন হল।

ঘুম আসছে না অনেক রাত অবধি। এই ঘরে তিনি বাস করে গেছেন, ঘরে-বাইরে তাঁর স্পর্শ এখনো সঞ্চারিত। একটু দূরেই তাঁর নিজের হাতে পোঁতা কাঁচা-মিঠে আম গাছটি। মধ্য রাত্রির জনহীন

নিস্তব্ধ চন্দ্রালোকে শ্রীরামকৃষ্ণের ব্যাকুল আহ্বান দেশদেশান্তরের তীর্থমধুপদের উদ্দেশ্যে ভেসে চলেছে—'ওরে তোরা কে কোথায় আছিস্ আয়'—

জন্মজন্মান্তের পদযাত্রাশেষে চির আশ্রয়ের উদ্দেশে তারা কামার-পুকুরে আসছে, যুগ যুগ ধরে আসবে।

জয়রামবাটী থেকে কামারপুকুর—দশ বছর আগে হেঁটে পার হয়েছি ছোট্ট নদী আমোদর। এবার সারাটা পথ বাসে। বাঁকুড়া থেকে হুগলী—এক জেলা থেকে আর এক জেলার পার্থক্য অন্ততঃ এখানে এলে বোঝার উপায় নেই। তবু জানি হুগলীর সমৃদ্ধি অনেক বেশী। সে তুলনায় রোগে ও দারিদ্র্যে বাঁকুড়ার বেদনা অনেক বড়ো। কাছাকাছি এই দুই জেলার সামান্য দূরত্বের ব্যবধানে দুটি তীর্থ রচিত হল উনিশ শতকে। শ্রীমা সারদাদেবী ও শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পুণ্যজন্মভূমিকে কেন্দ্র করে তীর্থযাত্রীদের যাতায়াত চলছে বহুকাল থেকেই। তবে সাম্প্রতিক কালে সরকারী সচেতনতায় যাত্রাপথের নানা সুযোগ সুবিধা বেড়েছে, পল্লীর সঙ্গে নগরের সম্পর্ক এখন ঘনিষ্ঠতর। তার অবশ্যম্ভাবী ফল তীর্থযাত্রীদের ভিড় আর সেই সঙ্গে কিছু কৌতূহলী দৃষ্টির বিচরণ।

আমার কিন্তু দশ বছর আগের সেই সম্পূর্ণ নাগরিকতামুক্ত পরিবেশটির কথাই মনে পড়ছিল বার বার। যে পল্লীপ্রকৃতি ও সনাতন জীবন যাত্রার পরিবেশে রামকৃষ্ণ-সারদার প্রথম জীবন গড়ে উঠেছিল, তার সরল তন্ময়তা যেন সে পরিবেশে তখনো অনেক পরিমাণেই সঞ্চারিত ছিল। পরিচিত জনতার কোলাহল থেকে দূরে আসার আনন্দই শুধু নয়, বাংলাদেশের নিজস্ব পল্লী সংস্কৃতির বিশিষ্ট ছন্দটুকু তখনো এই তীর্থপথের ধারে ধারে বিছানো ছিল।

বাস এসে কামারপুকুরে থামলো। সেবারের মত আমার বিমুগ্ধ চোখের সামনে দিয়ে পল্লীতরুর মাথা ছুঁয়ে একসার বক উড়ে গেল না, তার বদলে প্রথমেই চোখে পড়লো সিনেমার বিজ্ঞাপন। হ্যাঁ—

সিনেমা মানেই জনতা। কামারপুকুর শহর হবার পথে অগ্রসর হয়েছে বৈ কি!

তারপর সারি সারি দোকান। কে না জানে তীর্থের সঙ্গে ব্যবসার সম্পর্ক আছেই। কিন্তু ব্যবসার সঙ্গে ধর্মের সম্পর্ক কত ঘনিষ্ঠ? এসব প্রশ্ন আপাততঃ তোলা রইল। শ্রীরামকৃষ্ণমন্দিরের উন্মুক্ত দরজার সামনে মাথা নামিয়ে আবার সেই প্রথম-দেখা কামারপুকুরের আনন্দ ফিরে পেলাম। এই আশ্রমের প্রশান্ত পরিবেশে নীল আকাশের চাঁদোয়ার তলে মন্দিরের মাথায় শিবলিঙ্গের চূড়াটির রঙ বড়ো স্নিগ্ধ। মন্দিরের শ্রীরামকৃষ্ণমূর্তি এ যুগের ভাস্কর্য প্রতিভার সানন্দ সাক্ষ্য। মন্দির প্রাঙ্গণে বসে যখন আত্মস্থ হয়েছি, হঠাৎ মনে পড়লো আজ কোজাগরী পূর্ণিমা।

নিঃশব্দে সারা আশ্রম জুড়ে পূজার আয়োজন চলেছে। কাছের ও দূরের অনেক ভক্ত সমবেত হবেন এই পূজা উপলক্ষ্যে। যদিচ, শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মভূমিতে নিত্য-উৎসব, তবু আজকের মতো দিনে আয়োজনের স্বাতন্ত্র্য আছে বৈ কি! বেলা যত বাড়তে লাগল, ততই তীর্থ পথিকের সংখ্যাও বেড়ে চলল। দুপুরবেলা তো আশ্রম জুড়ে ভিড়ের গুঞ্জরণ।

আমি আবার অতীতে ফিরে গেলুম। জনতা ছাড়া তীর্থ হয় না, কিন্তু দেবতাকে পেতে হবে একান্তে। অনেক লোক একসঙ্গে দেখলে শ্রীরামকৃষ্ণের মনে ঈশ্বরের উদ্দীপন হতো, কিন্তু দক্ষিণেশ্বরে তাঁর সাধনার স্থানটি ছিল সাধারণের চোখের আড়ালে পঞ্চবটীর নির্জনতায়। যা কিছু মহৎ সৃষ্টি, তার জন্য তো ধ্যান চাই। নিজেকে উপলব্ধির প্রয়োজনেই নিজেকে সরিয়ে আনা প্রয়োজন।

জানালার উপর শরতের রৌদ্র-ছায়ার ঝিলিমিলি দেখতে দেখতে আমার একটি পথের কথা মনে পড়লো। দশ বছর আগে বন্ধুদের সঙ্গে সেই পথ দিয়ে হেঁটে গেছি। এবারে দল নেই, একলা যেতে

হবে। তবু যাবো—যদি আমার স্তব্ধতাকে ফিরে পাই, তবে আমার আনন্দকেও পাবো। স্পষ্ট মনে নেই, কেবল.একটি পথের তুধারে অনেক ছায়া আর সেই পথের শেষে দেবী বিশালাক্ষীর নিভৃত পূজাপ্রাঙ্গণ। প্রাঙ্গণে, পূজার জায়গায়, দূরে কাছে—ছোট ছোট ছেলেমেয়ের খেলায় আর পূজায় মিলে এক অপরূপ শিশুতীর্থ। দেবীস্থানের কোন সসম্ভ্রম দূরত্ব তাদের মনে নেই। আমরা যখন পূজা নিবেদনে ব্যস্ত—তখন একটু দূরে বছর দশেকের একটি কালো মেয়ে তার ছোট্ট ভাইয়ের হাতটি ধরে দাঁড়িয়েছিল। তার সীমন্তের রক্তিম সিঁদূরের সঙ্গে নিকষ কালো মুখমণ্ডলে মিলে এমন এক দেবশ্রী ফুটে উঠেছিল—যে কথা আমি আজও স্পষ্ট মনে করতে পারি।

আর সবাই যখন তুপুরের বিশ্রামে মগ্ন, আমি সেই পথের উদ্দেশ্যে পা বাড়ালাম। পথের মোড়ে পরিচিত এক তীর্থযাত্রী দেখিয়ে দিলেন—এই দিক দিয়ে আনুড়।

কামারপুকুর থেকে মাইলখানেক আর জয়রামবাটী থেকে মাইল তিনেক—মাঝামাঝি জায়গায় আনুড়—সুপ্রাচীন বর্ধিষ্ণু গ্রাম! পশ্চিম-বঙ্গের প্রাচীন গ্রামের শোভা সমৃদ্ধির স্নিগ্ধ শ্যামল নিদর্শন। এ গাঁয়ে এখনো শহরের ছোঁয়া তেমন লাগেনি। আমার দশ বছর আগের দেখা জগৎ যেন অবিকল তেমনি দাঁড়িয়ে আছে। তরুলতা সমাচ্ছন্ন পথের তুই পাশে পুরানো ছাঁদের বাড়ীঘর পার হয়ে যেতে যেতে মনে হলো যেন প্রকৃতির এই শ্যামল যবনিকার ভিতর থেকে যে কোন মুহূর্তে এক অপার বিস্ময়ের জগৎ দেখা দিতে পারে। অথবা এই যে শ্যামল থেকে শ্যামলতায় ডুবে যাওয়া—এই তো বিস্ময়! এই তো বাংলা দেশ! মনে পড়ে, সেই প্রথমবার বন্ধুদের সঙ্গে এই পথ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে কত গানই না গেয়েছিলুম। আর আশ্চর্য অনুভব করেছিলুম, রেডিও গ্রামোফোন, রঙ্গমঞ্চের রবীন্দ্রসঙ্গীতের তুলনায় এই পল্লীপ্রকৃতির মাঝখানে গাওয়া রবীন্দ্রসঙ্গীত কতো বেশি সত্য হয়ে ওঠে।

আজি বাংলা দেশের হৃদয় হতে কখন আপনি,
তুমি এই অপরূপ রূপে বাহির হলে জননী !

সে গানের অর্থ সেই দিনই আমার মনে পুরোপুরি ধরা দিয়েছিল। কামারপুকুর জয়রামবাটিকে ঘিরে বাংলা দেশের এই পৌরাণিক জগৎ এই বিংশ শতাব্দীর বুকেও আপন অতীত স্বপ্নলোকটি অক্ষয় রেখেছে ; তারই একটি অংশ আনুড় গাঁয়ের বিশালাক্ষী। অনেককাল থেকেই বিশালাক্ষী দেবীর জাগ্রত মহিমা লোকপ্রসিদ্ধ। শৈশবে শ্রীরামকৃষ্ণ (গদাই) একদা পল্লীরমণীদের সঙ্গে এই বিশালাক্ষী দর্শনের উদ্দেশ্যে আসতে আসতে পথের মধ্যেই দেবীভাবে তন্ময় হয়ে পড়েছিলেন। বোধ করি, সেই তাঁর জীবনের দ্বিতীয় ভাবাবেগ। মাতৃভাবের সাধক শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে এই প্রথম মাতৃভাবের সূচনা।*

শ্রীরামকৃষ্ণের তখন আট বছর বয়স। গাঁয়ের মেয়েরা মা বিশালাক্ষীর কাছে মানতপূজা দিতে চলেছেন। কিশোর গদাইও তাদের সঙ্গে গল্পে গানে আনন্দের তরঙ্গ তুলে চলেছেন। মাতৃভাবের গান গাইতে গাইতে বিভোর গদাই হঠাৎ ভাবস্থ হয়ে থেমে গেলেন। অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আড়ষ্ট, নিশ্চল অবস্থা দেখে সঙ্গিনীরা প্রথমে মনে করেছিলেন সর্দিগর্মি বা ঐরকম কিছু ! কিন্তু অনেকক্ষণ ঐ অবস্থা থাকায় সঙ্গিনীদের একজন (লাহাবাবুদের মেয়ে প্রসন্ন) বুঝলেন, এ সাধারণ কোন ব্যাধি নয়। দেবীভাবে তন্ময়তা থেকেই কিশোর গদাইয়ের এ অবস্থা। তাঁরই পরামর্শে সকলে মিলে গদাইয়ের দেহে আবির্ভূতা জননী বিশালাক্ষীর বন্দনা করতে লাগলেন। সত্যি সত্যি, কিছুক্ষণের মধ্যেই গদাইয়ের আনন্দিত মুখমণ্ডলে জ্ঞান সঞ্চারের লক্ষণ দেখা গেল।

---

* শ্রীরামকৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গ [সাধক ভাব—দ্বিতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য]

দেবীর কাছে মানতপূজা পৌঁছুবার আগেই ভাবের পূজা তিনি কিশোর গদাইয়ের মাধ্যমে গ্রহণ করেছিলেন। জননী চন্দ্রামণি কিন্তু এ কাহিনী শুনে বিশালাক্ষীর উদ্দেশ্যে গদাইয়ের কল্যাণ কামনায় আবার মানত করলেন। তাঁর সশঙ্ক দৃষ্টিতে পুত্রের অমঙ্গল সম্ভাবনাই বড় হয়ে ওঠা স্বাভাবিক ছিল, সন্দেহ নেই।

দেবতার মানবরূপ আমাদের কাছে কিছুই অসম্ভব নয়, তবু তখন মানুষ বলেই তিনি আমাদের স্নেহ ও শঙ্কায় কম্পমান হৃদয়ের ধন। ঐশ্বর্যে নয়, মাধুর্যেই তাঁর পরিচয়।

*

বাংলা দেশের নিভৃত পল্লীপথে হাঁটতে হাঁটতে একবার সমস্ত অতীত ভারতবর্ষকে মনে পড়লো। তেত্রিশ কোটি দেবতার দেশ ভারতবর্ষ—এতদিনে নিশ্চয় সংখ্যা আরো বেড়েছে। বিজ্ঞান, যন্ত্রযুগ, যুক্তিবাদী চিন্তাধারা এ সব কিছুতে মিলেও দেবতাদের নির্বাসিত করা গেল না, মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির ঊর্দ্ধে দৈবশক্তির মহিমা সম্বন্ধে এখনো মানুষের বিশ্বাস লুপ্ত হয় নি—দেশব্যাপী জাগ্রত দেবতা ও পীঠস্থানের মাহাত্ম্য কাহিনী শুনতে শুনতে আমার তো মনে হয়েছে এ জাতীয় দেবতাবিশ্বাস মানুষের কোনদিনই ঘুচবে না। যে যুক্তির উপর নির্ভর করে আমরা আধুনিক হতে চাই, সেই যুক্তি জীবনের কোন গভীর উপলব্ধির তল পেয়েছে! আসলে যুক্তি বলে আমরা যাকে অবলম্বন করি, সেও আর এক ধরণের বিশ্বাস। দেবতার সংস্কার এখন বিজ্ঞানের নামে চলে।

কোন সন্দেহ নেই, বৈজ্ঞানিক শিক্ষা আজ জাতির পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। দেবতাও মানবের প্রয়োজনে রূপান্তরিত হবেন। কিন্তু মানুষের আদিম শৈশবে প্রকৃতি ও পরমকারণের উদ্দেশ্যে যে অপার বিস্ময়বোধ ছিল, সেই বিস্ময় আমাদের অন্তরের অন্তরালে আজও জেগে আছে। বিশ্বরহস্যের অতি সামান্যই আমাদের চোখের সামনে

খোলা। তাই যেটুকু আমরা দেখেছি, তার চেয়ে অনেক বেশী আহ্বান করে যা আমরা দেখি নি! সেই অদৃশ্যের চিরন্তন আকর্ষণেই দেবতার জন্ম!

এক হিসাবে, মানুষের কল্পনায় দেবতার যত মূর্তি দেখা দিয়েছে, সব রূপেই তাঁরা সত্য। যিনি অরূপ, অচিন্ত্য তিনি মানবমনের আশা আকাঙ্ক্ষা আনন্দ বেদনার আবর্তনে এসে ধরা বলেই না যুগে যুগে মানুষের ধ্যানে তাঁর নব নব জন্ম সত্য হয়ে ওঠে। মানব-অন্তরের নিহিত চৈতন্যই দেবতার নানান রূপে ও লীলায়, গল্পে গানে, জীবনে ও পুরাণে রূপান্তরিত। তেত্রিশকোটি দেবতা সংখ্যায় বিচলিত হওয়ার কোন কারণ নেই—মানুষের কল্পনা তার চেয়ে অনেক বেশী দেবতার সৃষ্টি করেছে।

কিন্তু এই দেবতারা মানুষকে কেবল ভয় দেখিয়েছেন, ভক্তি আদায় করেছেন—একথা সত্য নয়। যে অসীম রহস্য আমাদের এই ছোট্ট মানবজীবনের চারপাশে ঘিরে আছে, এই দেবতারাই সে রহস্যের আলোকরশ্মি। এমনি ছোট বড় তুচ্ছ মহতের সমাবেশে মানুষ পরম সত্যকে নানাভাবে উপলব্ধি করে। তৃণে, লতায়, গুল্মে, প্রস্তরে সর্বত্র সেই অবিনাশী সত্তাকে অনুভব করতে করতেই মানুষ একদিন উপলব্ধি করে যে শ্রেষ্ঠ মন্দির তার আপন হৃদয়—শ্রেষ্ঠ দেবতা সে নিজে, দেবত্ব তার আপন মহিমা।

বলা বাহুল্য, একথা সকলেই বুঝবে, অনুভব করবে—একথা বলা বাতুলতা মাত্র। মানবমনের বিভিন্ন স্তর রয়েছে একথা স্বীকার করতেই হয়। অদ্বৈতবাদ শেষ কথা হলেও মানবজীবন দ্বৈতেরই খেলা, যতক্ষণ দুই আছে, ততক্ষণ দেবতাও আছেন—হয়তো এক, হয়তো অনেক।

সামান্য পথ ফুরিয়ে এলো। একটু দূরে পথের বাঁকে বিরাট তরুছায়ার তলায় মাঝে মাঝে একটি দুটি পাতা ঝরে পড়ছে। দুপুরের

সোনালী রোদ দূরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষারত। সামনে ছায়া-রৌদ্রের আনমনা খেলার একটি পাশে দেবীর পীঠস্থান। বাংলার তন্ত্রসাধনার ঐতিহ্যে কল্পিত যোনিপীঠ। দেবীমূর্তিহীন এই পূজা প্রাঙ্গণের আশেপাশে আজও তেমনি রাখাল শিশুদের মেলা। তারা কখনো দেবীস্থানের উপরে হুমড়ি খেয়ে ভক্তদের দেওয়া পয়সাকড়ি কুড়িয়ে নিচ্ছে, কখনো পূজার প্রসাদের প্রত্যাশায় এককোণে দাঁড়িয়ে জটলা করছে। যাত্রীরা এলেই শিশুরদল তাদের ঘিরে দাঁড়ায়। মায়ের পূজার তারা সমান অংশীদার। তাদের এই স্নেহের উপদ্রব নিঃশব্দে সয়ে মা বিশালাক্ষী যেন তাঁর স্নেহের আঁচলটি বিছিয়ে রেখেছেন। বাংলার আর কোন দেবীস্থানে শিশুদের এমন অবাধ অধিকার আছে বলে আমার জানা নেই। শোনা যায়, মাঝে মাঝে দেবীকে ঘিরে বড় মন্দিরের কল্পনা হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে দেবী স্বপ্নে প্রত্যাদেশ দিয়েছেন, "ওই রাখাল ছেলেমেয়েদের নিয়ে আমি বেশ আছি। আমাকে মন্দির দিয়ে ঘিরতে হবে না।'

মঙ্গলকাব্যের দেশে এমন প্রত্যাদেশ কিছুই অবাক হবার মতো নয়। দেবতা ও মানুষের এই একান্ত ঘনিষ্ঠতায় আমরা অভ্যস্ত। তবু, বিশ্বশক্তির জননীরূপের এমন একটি প্রসন্ন প্রকাশ এই শিশুদের খেলায় ও বিশালাক্ষীর পূজায় আপনি প্রকাশিত, যা মাতৃভাব-সাধনার পরম সহায়ক। এই শিশুদের ব্যবহারে কোথাও বিরাট আধ্যাত্মিকতার পরিচয় মেলে না। কিন্তু এই সহজ অধিকারের আনন্দমহিমা বাৎসল্যরসের যে লীলাভূমি সৃষ্টি করেছে, যত অনায়াসে জগৎকারণের মাতৃভাবকে অভিব্যক্তি দিয়েছে, তা যে কোন তীর্থ-যাত্রীর আরাধনার সামগ্রী।

দেবীপূজার প্রসাদ এই শিশুদের হাতে হাতে বিলিয়ে দিয়ে একটু দূরে এসে বসে রইলুম। নতুন পথিকের বিস্ময় কেটে যেতেই ছেলেমেয়েরা আবার দল বেঁধে ছুটোপুটি করতে লাগলো পূজাবেদীর

প্রাঙ্গণে। শরতের সায়াহ্ন আরো দীর্ঘ ছায়া ফেলে বিশালাক্ষীর স্নেহনিবিড় বিশ্রামস্থলটি মনোরম করে তুললো। হাওয়া দিল, যেন উত্তরের শীতের ছোঁয়া একটু মেশানো—আর সেই হাওয়ায় ঝরাপাতারা এদিকে ওদিকে ছড়িয়ে পড়লো শব্দ করে। যেন এইমাত্র জননী বিশালাক্ষী প্রাঙ্গণের উপর দিয়ে হেঁটে গিয়ে তাঁর পূজাবেদীতে উঠলেন।

রাখাল ছেলেদের কলকণ্ঠের হাসি শোনা গেল।

দূর থেকে দেখতে পেলাম পঞ্চবটীর তলায় আভূমিপ্রণত এক সন্ন্যাসী। অনেকক্ষণ প্রণাম সেরে শান্তভাবে একটি পাশে বসে রইলেন। পাশে কল্লোলবাহিনী গঙ্গা, মাঝে মাঝে দু'চারটি পাতা ঝরে পড়ছে, মাটিতে ছায়ারৌদ্রের খেলা।

সামনে নহবত পার হয়ে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ঘর, সে ঘর পেরিয়ে মন্দিরপ্রাঙ্গণ, দ্বাদশ শিব, রাধাকান্ত, ভবতারিণী মা। আবার ঘুরে ফিরে পঞ্চবটীর কাছে এলাম। সেই সন্ন্যাসীটি স্থির ধ্যানে আসীন। সামনে দিয়ে লোকজন ঘুরছে ফিরছে। কেউ গল্প করছে, কোন তরুণ-দলের চড়ুইভাতির কলরব, ধনাঢ্য মোটরবিহারীর বিস্তৃত শতরঞ্জিতে তাস ও ট্রান্সিস্টারের আয়োজন। পঞ্চবটীর একটু দূরে দূরে—নানা মানুষের জটলা। ভীড় আরো বাড়বে। আজ ছুটির দিন।

ফিরে এসে গঙ্গার সামনে একে একে জড়ো হওয়া নৌকোগুলির দিকে চেয়ে রইলাম। এখান থেকে নৌকো করে শ্রীরামকৃষ্ণ কতদিন কত জায়গায় গিয়েছেন—কলকাতা—কলকাতার আশেপাশে—শেষ যাওয়া সেই পানিহাটির মহোৎসবে।

এই পথ দিয়ে তিনি কতবার এসেছেন—গিয়েছেন, এই পঞ্চবটী থেকে মায়ের মন্দির—এই পথটিই তো তাঁর একান্ত পথ। সব সাধনার সুরু ও শেষ মৃন্ময়ী, চিন্ময়ী, মানবী—সব মূর্তিতে মায়ের আরাধনা করার সঙ্কল্প এই পথে যেতে আসতে। কোন দিব্যমূহূর্তে মহাজননীর প্রকাশ ঘটেছিল পাষাণমূর্তির মাঝখানে। এই গঙ্গার তীরে তাঁর ব্যাকুল কান্নার উত্তরে পরমপ্রার্থিতা জননী সন্তানকে চিরদিনের মতো অভয় অঙ্কে স্থাপন করে নবযুগের সূচনা করলেন। কিন্তু সে পূজার

পরিপূর্ণতা মানবীদেহে তাঁর পূজা গ্রহণে। ফলহারিণী কালীপূজার পুণ্যতিথিতে পত্নী সারদাদেবীর চরণে উৎসর্গিত হল এতকালের তপের ফল, জপের ফল, যা কিছু ফল অফল।

এই পঞ্চবটীতেই সেই মাতৃসাধনার সূত্রপাত, ক্রমবিকাশ। শুধু মাতৃসাধনার কেন, শ্রীরামকৃষ্ণ-সাধনার বেশীর ভাগ এই পঞ্চবটীতে অনুষ্ঠিত। এইখানেই প্রথম জনমদুখিনী সীতার আবির্ভাব, এইখানেই দাস্য ও বাৎসল্যভাবে রামচন্দ্রের আরাধনা, চৌষট্টি তন্ত্রের সাধনা, সখ্য ও মধুরভাবে কৃষ্ণতন্ময়তা, আবার এইখানেই একদিন নির্বিকল্প ধ্যানমগ্ন শ্রীরামকৃষ্ণ মাতৃমূর্তি অতিক্রম করে অদ্বৈত ব্রহ্মসত্তায় লীন হয়ে গেলেন। রূপ থেকে রূপাতীত সমাধিলোকে মহাযাত্রার সব পদচিহ্ন এই পঞ্চবটীর চারপাশে। আবার সত্যের অদ্বয় উপলব্ধির পরেও লীলানন্দময় শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্তসঙ্গ ও আদর্শ মানবজীবনগঠনের শুভসাধনাও এই পঞ্চবটীতে। লাটু, রাখাল, নরেন্দ্রনাথ—সকলকেই এই পঞ্চবটীতে সাধকজীবন শুরু করতে হয়েছে। দক্ষিণেশ্বর থেকে বেলুড় অবধি এই পঞ্চবটীরই প্রসারিত ছায়া।

*

আড়াইহাজার বছর আগে নিরঞ্জনাতীরে শাক্য সিংহ বসেছিলেন বোধিদ্রুমতলে। আজ সে মূলবৃক্ষ নেই, কিন্তু তারই অগণিত শাখাপ্রশাখার অভিযান হয়েছে নানা দেশে। নানা মনে। তাদেরই সূত্র ধরে বোধিতরু আবার ফিরে এসেছে ভগবান বুদ্ধের সাধনভূমিতে।

সামান্য পরিবর্তন হলেও দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটী এখনো তার মূল জায়গায়ই রয়ে গেছে। এখনও তার শিরায় শাখায়, নেমে-আসা ঝুরির ফাঁকে কোথাও না কোথাও শ্রীরামকৃষ্ণস্পর্শের আনন্দ শিহরণ সঞ্চারিত। আমরা, যারা তাঁকে দেখি নি, তারা পঞ্চবটী দেখে তাঁকে অনুমান্ করে নিতে পারি। এই নিঃশব্দ ছায়াবীথির অন্তরালে

কী প্রচণ্ড সাধনার ঝড় বয়ে গেছে একটি মানবদেহকে অবলম্বন করে। পৃথিবীর ইতিহাসে এক একটি অধ্যাত্মভাবের আবির্ভাবেই মানব চিন্তার ইতিহাসে কী বিপুল আলোড়ন! শাক্ত, বৈষ্ণব, ইসলাম, খ্রীষ্ট, সব সাধনার মিলিত ফল এই পঞ্চবটীর ছায়াঘন নির্জনতায় বিগ্রহ ধারণ করে শ্রীরামকৃষ্ণে পরিণত। নানা বৃক্ষের সমাহার শুধু নয়, জগতের শ্রেষ্ঠ অধ্যাত্মচিন্তা ও উপলব্ধির সমাহার এই পঞ্চবটীতে।

*

অশ্বত্থবিল্ববৃক্ষঞ্চ বটধাত্রী-অশোককম্।
বটীপঞ্চকমিত্যুক্তং স্থাপয়েৎ পঞ্চদিক্ষু চ॥
অশ্বত্থং স্থাপয়েৎ প্রাচি বিল্বমুত্তরভাগতঃ।
বটং পশ্চিমভাগে তু ধাত্রীং দক্ষিণতস্তথা॥
অশোকং বহ্নিদিক্‌স্থাপ্যং তপস্যার্থং সুরেশ্বরি।
মধ্যে বেদীং চতুর্হস্তাং সুন্দরীং সুমনোহরাম্॥

[স্কন্দপুরাণ]

অশ্বত্থ, বিল্ব, বট, আমলকী ও অশোক—এই পাঁচটি বৃক্ষকে একত্রে পঞ্চবটী বলে। এই পাঁচটি বৃক্ষকে পাঁচদিকে স্থাপন করতে হয়—পূর্বে অশ্বত্থ, উত্তরে বিল্ব, পশ্চিমে বট, দক্ষিণে আমলকী এবং অগ্নিকোণে অশোক; আর তার মাঝখানে তপস্যার জন্য চার হাত পরিমাণ সুন্দর সুমনোহর বেদী স্থাপন করতে হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ আসবার আগে থেকেই একটি পঞ্চবটী ছিল দক্ষিণেশ্বরে। কালক্রমে প্রাচীন বটগাছটি ছাড়া আর সব গাছগুলিই নষ্ট হয়ে যায়। সেই পুরানো পঞ্চবটীর বদলে শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের হাতে নতুন পঞ্চবটী স্থাপন করেছিলেন। আগে একটি আমলকী-তলায় তিনি ধ্যান করতেন। পুরানো পঞ্চবটীর কাছাকাছি হাঁসপুকুরটি নতুন করে খুঁড়ে তার মাটিতে চারদিক ভরাট করে ফেলায় সেই আমলকী গাছটি নষ্ট হয়ে যায়। তাই

সাধনকুটিরের পশ্চিমে শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন নিজের হাতে একটি অশ্বত্থের চারা রোপন করে তাঁর ভাগ্নে হৃদয়কে দিয়ে বট, অশোক, বেল ও আমলকী গাছের চারা রোপণ করালেন। তারপর তুলসী ও অপরাজিতার অনেকগুলি চারা পুঁতে চারদিকে ঘিরে দিলেন। তবু উপযুক্ত বেড়ার অভাবে পঞ্চবটীর গাছগুলি প্রথমদিকে ছাগল গোরুতে মুড়িয়ে ফেলেছিল। শোনা যায়, গাছগুলির এই দুরবস্থা দেখে এদের বেড়া দিয়ে রক্ষা করবার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ যখন চিন্তিত, তখনই গঙ্গার বানে বেড়া তৈরীর সব উপকরণ ভেসে এসে গঙ্গাতীরে উপস্থিত—কতগুলি গরাণের খুঁটি, নারকোলের দড়ি, বাঁকারি, এমন কি একটি কাটারি! কালীবাড়ীর ভর্তাভারি নামে এক মালীকে দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ কত আনন্দের সঙ্গে সেদিন বেড়াটি তৈরী করেছিলেন সেকথা সহজেই অনুমেয়। কিছুদিন নিয়মিত জলসিঞ্চনে তুলসী ও অপরাজিতার বেড়াগুলি উঁচু হয়ে নবজাত পঞ্চবটীর চারপাশে এমন আবেষ্টনী রচনা করলো যে, বাইরে থেকে আর শ্রীরামকৃষ্ণের তপস্যার কোন বিঘ্ন হবার সম্ভাবনা রইল না।

*

পঞ্চবটীর এই জন্ম-ইতিহাসেও একটু অলৌকিক যোগাযোগের আভাস আছে। আমরা বানের জলে ভেসে-আসা বেড়ার উপকরণের ব্যাপারটি কেবলমাত্র আকস্মিক ঘটনাই মনে করতে পারি। আবার সিদ্ধ সঙ্কল্প মহাপুরুষের ক্ষেত্রে এমন যোগাযোগ দৈব ইচ্ছা বলে যাঁরা মনে করেন, তাঁদেরও অস্বীকার করা যায় না। আসলে লৌকিকে অলৌকিকে ভেদ অনেকটাই দৃষ্টিভঙ্গীগত। অধ্যাত্মসাধনার ক্ষেত্রে সাধারণ মানবদৃষ্টি বহুদূর প্রসারিত হয়ে এমন অনেক সত্য প্রত্যক্ষ করে, যা লৌকিক জগতে অবাস্তব ও অসম্ভব মনে হওয়াই স্বাভাবিক। তাই তো সাধকের জিজ্ঞাসা—এহ বাহ্য, আগে কহ আর।

অলৌকিক ঘটনা বা উপলব্ধির প্রমাণ লৌকিকজীবনের পূর্ণাঙ্গ

সমুন্নতি। বিশেষ মুহূর্তের আবেগ উচ্ছ্বাস অথবা অঘটন ঘটনা—পরবর্তীকালে তাৎপর্য হারিয়ে ফেলে সাধনা বা প্রযত্নের অভাবে। এক্ষেত্রে বিবেকানন্দের বাণী স্মরণীয়—"অলৌকিকত্বরূপ যে অদ্ভুত বিকাশ, চিরোপার্জিত লৌকিক চেষ্টাই তাহার কারণ; লৌকিক ও অলৌকিক কেবল প্রকাশের তারতম্যে।"* শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবন সেই অলৌকিক সত্য লাভের লৌকিক প্রচেষ্টাকে উপেক্ষা তো করেই নি, বরং জীবনের সর্বক্ষেত্রে ব্যবহারিক নৈপুণ্যকেও অধ্যাত্মসাধনার অন্যতম মাপকাঠি করে গিয়েছে। ভক্ত হওয়া আর বোকা হওয়া তাঁর কাছে এক নয়। আবার ঈশ্বরলাভের চাতুরীই যথার্থ চাতুরী। ঘটনাগত যোগাযোগের আকস্মিকতা ছাড়াও এমন অনেক সাধারণ-বুদ্ধির অগোচর পরমসত্যের জ্যোতির্ময় প্রকাশ শ্রীরামকৃষ্ণ-শ্রেণীর মহামানবদের জীবনে দেখা দেয়, যা আমাদের সীমাবদ্ধ ধারণায় মাপ করতে যাওয়াই মূঢ়তার নামান্তর। এই সব ঘটনার তাৎপর্য উপলব্ধির প্রয়োজন আছে বৈ কি! শুধু মনকে সেই উপলব্ধির যোগ্য করে তোলা প্রয়োজন। দৃষ্টি থাকলে তবে তো অনুবীক্ষণে চোখ রাখার ফল।

যীশু, বুদ্ধ, মহম্মদ, শংকর, চৈতন্য—কার জীবনীতে অলৌকিকতা নেই? শুধু দিনযাপনের প্রাণধারণের সাধনা করতে তো তাঁরা আসেন নি, এসেছিলেন জীবনধারণের পরমসার্থকতার দিকে আমাদের চোখ ফেরাতে। বলা বাহুল্য, সে চোখ বাইরের চর্মচক্ষু নয়। অন্তরতম দৃষ্টি। সে আলোয় এ জগৎ ও জীবনের রূপান্তর ঘটে বলেই তা আলৌকিক। কিন্তু কোনমতেই ভেলকিবাজি নয়। 'লাগ্ ভেলকি লাগ' বলে যে বাজীকরের সমাধি হয়েছিল, সেই বহিরঙ্গ সমাধি ভাঙতেই বাজিকর রাজার উদ্দেশ্যে "টাকা দেও, কাপড়া দেও"—এই

* ভাববার কথা—জ্ঞানার্জন, পৃঃ ৪১, স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (৬ষ্ঠ খণ্ড)

চেয়েছিল। উপরি-উক্ত মহামানবেরা চেয়েছিলেন সর্বস্বের পরিবর্তে পরমসত্যের আবির্ভাব। ভেলকির সঙ্গে ধর্মের এইখানে পার্থক্য।

তুলসী-অপরাজিতার বেড়ার আড়ালে ক্রমবর্ধমান পঞ্চবটীর পল্লবঘন ছায়াতলে কিন্তু জগতের সেরা যাদুকরের রঙ্গমঞ্চ তৈরী হচ্ছিল। দিনের পর দিন সাধনা থেকে সাধনান্তরে পরমসত্যের বহুবিচিত্র রূপায়ণের সে কাহিনীর বেশীর ভাগই লোকলোচনের অন্তরালে। সন তারিখের হিসাবে শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনকাল বারো বৎসর, কিন্তু এই বারোটি বৎসর ভারতাত্মার সংক্ষেপিত পাঁচহাজার বৎসরের তপস্যা। শুধু ভারতের নয়, লীলাপ্রসঙ্গকার স্বামী সারদানন্দজীর অনুসরণে বলা যায়, বেদ, উপনিষদ, বাইবেল, কোরাণ প্রভৃতি জগতের শ্রেষ্ঠ ধর্মশাস্ত্রসমূহের অধ্যাত্মসত্যের নিশ্চিত প্রমাণস্বরূপ শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনপর্ব সর্বমানবের তপস্যার ফলশ্রুতি।

তাই ভারতের ধর্মসাধনার ইতিহাসে বোধিদ্রুমের পরেই পঞ্চবটীর স্থান। আর পৃথিবীর ইতিহাসে এমন সর্বধর্মমিলনের সাধনতীর্থ আর কোথাও দেখা যায় কি ? যায় না বলেই দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটী যে আমাদের পরমযত্নের আরাধ্য বস্তু—এ কথা বারংবার স্মরণীয়।

শুধুমাত্র দক্ষিণেশ্বরের মন্দির প্রাঙ্গণই নয়, এই পঞ্চবটী, অদূরে বিল্বতলে পঞ্চমুণ্ডির আসন, হাঁসপুকুর—এসবই শ্রীরামকৃষ্ণতীর্থরূপে স্মরণ মনন ও বন্দনার যোগ্য তীর্থ।

*

তবু, দিন যত শেষ হয়ে এলো পঞ্চবটীর চারপাশে জনতার কোলাহল কেবলই বাড়তে লাগল। ছুটির দিনের অবসর যাপনের মত্ততায় তখন এই পঞ্চবটী যে কোন পার্ক, যে কোন সখের বাগান মাত্র।

শুধু পঞ্চবটীর তলায় সেই সন্ন্যাসীটি এখনো ধ্যানস্থ। আমাদের শুভবুদ্ধি আবার একদিন এই সাধনপীঠের প্রশান্ত নির্জনতা ফিরিয়ে আনবে, এই সমাহিত সাধক হয়তো তারই প্রতীক।

দক্ষিণেশ্বর থেকে বালি সেতু-সংযোগটির নতুন নামকরণ হয়েছে বিবেকানন্দ সেতু। নামটি নানা কারণে সমর্থনীয়। প্রধান কারণ, বিবেকানন্দের সমগ্র জীবনটিই সেতুশোভন। উনবিংশ শতাব্দীর সঙ্গে বিংশ শতাব্দীর, প্রাচীন ভারতবর্ষের সঙ্গে আধুনিক পৃথিবীর, শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে নিখিলমানবের অমৃতসেতু রচনাই বিবেকানন্দ-জীবনের প্রধান সাধনা। সে সাধনায় তাঁর সিদ্ধির সূচনা দক্ষিণেশ্বরে, সাফল্যের পরিণতরূপ বেলুড়মঠে।

পরিণতি হয়তো দেশেকালে আরো দূরবিস্তৃত। আপাততঃ কামারপুকুর থেকে দক্ষিণেশ্বর এবং দক্ষিণেশ্বর থেকে বেলুড়মঠে—বালক গদাই থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসে ক্রমবিকাশের মতো তীর্থ রচনারও ক্রমবিকাশ দেখতে পাচ্ছি চোখের সামনেই দেবতা কখন মানুষ হয়ে আসেন, মানুষ কখন দেবতা হয়ে ওঠে—ভূগোলে বা ইতিহাসে তার নিশ্চিত নির্দেশ নেই, আছে মানুষেরই প্রাণের উপলব্ধিতে।

কেউ কেউ প্রশ্ন করেন, এত দেশ থাকতে ভারতবর্ষেই বার বার অবতারের আবির্ভাব হয় কেন? পাশাপাশি আর একটি প্রশ্ন, আর কোন দেশের মানুষ কি ধর্মচর্চা করে না? যদি না করে থাকে, সে সব দেশের এত উন্নতি হল কেমন করে?

আসলে হয়তো এরা একই প্রশ্ন, অন্ততঃ একই মানসিকতার ফল। ধর্মজীবন সম্বন্ধে নিশ্চিত কোন প্রত্যয় দেখা দেবার আগে বিরামহীন

এই সব প্রশ্নের মুখোমুখি আমাদের হতেই হবে। আর যখন অধ্যাত্মজীবনের 'শরবৎ' তন্ময়তায় লক্ষ্য ভেদ হয়ে গেছে, তখন মুখ বন্ধ, জীবন কথা বলবে। শ্রেষ্ঠ উপলব্ধির ভাষাই নীরবতা।

সে অতল উপলব্ধিতে উপনীত হবার আগে আমরা যারা জীবনের সহস্র তরঙ্গে ভাসমান, চিন্তার ঘাত-প্রতিঘাতে আমাদের সন্ধানের সার্থকতা ঘোষণা করতে হবে বৈ কি! একথা বলতেই হবে, ভারতবর্ষে ভগবানের বারংবার আবির্ভাব এইজন্যেই হয়েছে যে, ভারতবর্ষই বিশেষভাবে তাঁর আবির্ভাব প্রার্থনা করেছে।

শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের জন্য যেমন অদ্বৈতাচার্যের প্রার্থনা, তেমনি চেতনার সঙ্কটমুহূর্তে ভারতবর্ষ বারে বারে সেই নররূপী নারায়ণের প্রত্যক্ষ আবির্ভাব প্রার্থনা করেছে। ভগবানের বাণী স্বয়ং ভগবানের মুখে না শুনে, স্বয়ং ভগবানের জীবনে প্রত্যক্ষ না করে সে তৃপ্ত হয় নি। 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্'—ভারতবর্ষ যেমনভাবে চেয়েছে ভারতের ভগবান তাকে সেইভাবেই ভালোবেসেছেন।

ধর্মচর্চা জগতের চিরন্তন সত্য। ভারতবর্ষ কখনই তাঁর একমাত্র সত্ত্বাধিকারী নয়। পৃথিবীর সব প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাসেই ধর্ম অসাধারণ গুরুত্ব লাভ করেছে। কিন্তু ভারতবর্ষে বা ভারতের বাইরে যেখানেই ধর্ম অধ্যাত্মজিজ্ঞাসার বদলে পার্থিব আকাঙ্ক্ষার রূপান্তর হয়ে উঠেছে সেখানেই তার সমূহ সর্বনাশ। যথার্থ ধর্মচর্চা সাংসারিক সুখসমৃদ্ধির মানদণ্ডে কখনই বিচার্য নয়। রাজধর্ম, লোকধর্ম, এমন কি মানবধর্মের চেয়েও অধ্যাত্মধর্মের প্রকৃতি সম্পূর্ণ আলাদা। যে স্থিতপ্রজ্ঞ আত্মার দর্পণে পরমসত্যের জ্যোতি উদ্ভাসিত হয়, তার দ্বারা সাংসারিক কল্যাণ হতে পারে, নাও হতে পারে—অমলিন আত্মোপলব্ধির আনন্দেই যথার্থ আধ্যাত্মিকতা।

তাই ধর্মসাধনার দ্বারা কোন দেশ বা ব্যক্তি যদি ঐহিক উন্নতি লাভ নাও করে থাকে, তার দ্বারা অধ্যাত্মসাধনার অসার্থকতা প্রতিপন্ন হয়

না। পৃথিবীতে এমন বহু জাতি বা দেশই উন্নতির চরমশিখরে উঠেও নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে—তার একমাত্র কারণ বস্তুসম্পদের অতীত আত্মিক সম্পদের প্রতি অবহেলা। অপরপক্ষে, 'ধর্ম' কথাটির লৌকিক প্রয়োগে রাজধর্ম, প্রজাধর্ম, অর্থনীতি ও সমাজনীতির ধর্ম—এই সব ক্ষেত্রে যে সব দেশে অনলস আত্মত্যাগ ও সঙ্ঘবদ্ধতার সাধনা রয়েছে, সে সব দেশের মহিমা অবশ্য স্বীকার্য। তবু মনে রাখতে হবে পার্থিব-সম্পদের জন্য আত্মত্যাগ এবং পরমসত্যোপলব্ধির জন্য আত্মত্যাগ এ দুয়ের মধ্যে মেরুপ্রমাণ পার্থক্য।

আজকাল যাঁরা আমেরিকা, রাশিয়া ইয়োরোপ বা জাপান ঘুরে আসেন, তাঁরা অনেকেই ফাঁকা আধ্যাত্মিকতার বড়াই ত্যাগ করে সর্বপ্রযত্নে পাশ্চাত্যের মতো সম্পদবৃদ্ধির আদর্শই আমাদের একমাত্র অনুসরণীয় বলে ঘোষণা করেন। দরিদ্র ভারতবর্ষ যাঁদের শিক্ষাদীক্ষা দিয়ে মানুষ করেছে, তাঁরাও অনেকে একবার পাশ্চাত্যের উচ্চমানের জীবনযাত্রার আস্বাদ পেলে আর মাতৃভূমির ঋণের কথা মনে রাখেন না। কিন্তু একথাটা তাঁদের মনেও হয় না যে, পার্থিব সম্পদের প্রতিযোগিতার কোন শেষ নেই, এবং তার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি বিশ্ববিধ্বংসী মহাযুদ্ধ। এই পারমাণবিক প্রলয়ের তীরে দাঁড়িয়েও অন্ধ অনুকরণের মত্ততা আর যারই হোক ভারতবাসীর সাজে না।

কারণ, বিবেকানন্দ এবং বিবেকানন্দগুরু শ্রীরামকৃষ্ণ উনবিংশ-বিংশ শতাব্দীর সন্ধিক্ষণে মানবচৈতন্যকে এই প্রলয় থেকে রক্ষা করতে চেয়েই বস্তুবিশ্বের অতীত চিন্ময় উপলব্ধির অমৃতভাণ্ডার আমাদের জন্য অবারিত রেখে গেছেন। সে অমৃত ভারতবর্ষের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের নিত্যসম্পদ। সে অমৃত আছে বলেই মানুষের বেঁচে থাকার সার্থকতা। তাই মরণ আছে জেনেও আমরা মৃত্যুঞ্জয়ী।

ভারতবর্ষের সেই অতীতকে বর্তমানের সঙ্গে যুক্ত করে অনাগত

ভবিষ্যতের ধ্রুবনির্দেশ দিয়েছে বিবেকানন্দরূপ মহাজীবনের সেতু। তাই বালিব্রীজের নবনামকরণ বিবেকানন্দ-সেতুর প্রতি অন্তরের সমর্থন জানাই।

*

"তোমার জীবনে অসীমের লীলাপথে
নূতন তীর্থ রূপ নিল এ জগতে"—শ্রীরামকৃষ্ণ-শতবার্ষিকী উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথের এই বন্দনাংশটুকু হয়তো দক্ষিণেশ্বর ও বেলুড়কে মনে রেখেই রচিত। আজ অবশ্য জয়রামবাটী ও কামারপুকুর—সারদাদেবী ও শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মভূমিরূপে তীর্থপথিকদের কাছে সমান গুরুত্ব লাভ করেছে। তাছাড়া কলকাতায় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ব্যাধিজীর্ণ দেহে শ্যামপুকুর ও কাশীপুরে অবস্থান স্মরণ করে এ দুটি স্থানও অনেকের কাছেই তীর্থস্বরূপ। শ্রীরামকৃষ্ণজীবনের অধ্যাত্মপ্রকাশের দিক থেকে দুটি স্থানই উল্লেখযোগ্য। কাশীপুরে যোগ্য প্রচেষ্টা হয়েছে। কিন্তু শ্যামপুকুরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অবস্থানের স্মৃতি এখনো উপযুক্ত মর্যাদা পায় নি। তাছাড়া শ্রীরামকৃষ্ণজীবনীর সঙ্গে পরিচিত অনেকেই কলকাতার বিভিন্ন অংশে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের যাতায়াতের কথা মনে রেখে এই শহরটিকে শুধুমাত্র 'মিছিলের শহর' মনে করেন না। উনবিংশ শতাব্দীর জাগরণ এই শহরটিকেই কেন্দ্র করে হয়েছে, আবার শ্রীরামকৃষ্ণসাধনার প্রত্যক্ষ ফলভোগ করেছে এই শহরেরই আধুনিক যুগের মানুষেরা—সেকালের 'ইয়ং বেঙ্গল'। শ্রীরামকৃষ্ণ-সাধনার প্রধান লক্ষ্য ছিল কলকাতার তরুণসমাজে ভারতীয় অধ্যাত্ম-চিন্তা ও জীবনাদর্শের পুনরুদ্বোধন। কলকাতা ও তার আশেপাশের মফস্বল শহর ও গ্রাম থেকেই তাঁর সর্বত্যাগী শিষ্যবৃন্দ সমাহৃত। এক সাধু নাগমশায় এবং লাটু মহারাজ ছাড়া তাঁর প্রায় কোন বিশিষ্টভক্তই দূরাঞ্চলের লোক নন। সুতরাং আমাদের নবজাগরণের শ্রেষ্ঠ ফল যে

অধ্যাত্ম-চেতনার সমুন্নয়ন ও সর্বধর্মপ্রীতির মাধ্যমে উদার মানবিকতার জাগরণ—রামমোহন থেকে রামকৃষ্ণ অবধি সেই জাগরণের 'কেন্দ্রতীর্থ এই কলকাতা।

গঙ্গার এপারে ওপারে শ্রীরামকৃষ্ণের যাতায়াতের ফলে কখন অলক্ষ্যে একদল গৃহীসাধক তাঁর চারপাশে এসে সমবেত হলেন; ক্রমে তাঁর ত্যাগী সন্তানেরাও তাঁর কাছে যাতায়াতের মধ্য দিয়ে একান্ত অন্তরঙ্গ মহাসঙ্ঘের সূচনা করলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজাগ্রত বাংলাদেশ তখন জীবনের পন্থা খুঁজে দিশেহারা। রাজনৈতিক ভাবে পরাভূত, সামাজিক দিক থেকে অন্তর্দ্বন্দ্বে বিভক্ত, অর্থনৈতিক শোষণে রিক্ত সর্বস্বহারা এই দেশের সনাতন জীবনযাত্রা থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় সর্বাংশে পাশ্চাত্য অনুকরণ ও অনুসরণ ছাড়া অন্য কোন উপায় তখন অচিন্তনীয়। রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, ভূদেব, কেশবচন্দ্র প্রভৃতির চিন্তাধারায় জাতীয় আদর্শের প্রতি অনুরাগ থাকলেও ভারতের অধ্যাত্মসাধনার জীবন্ত জ্বলন্ত প্রত্যক্ষ উদাহরণ না পেয়ে এই বহির্মুখীনতা তখন তরুণসমাজকে গ্রাস করেছে। ব্রাহ্মসমাজের প্রচেষ্টায় ও বিদ্যাসাগরের আন্দোলনে অভ্যস্ত জড়তায় আঘাত লাগলেও জাতির অন্তর থেকে সত্যোপলব্ধির বাণী ধ্বনিত না হওয়া পর্যন্ত সব বহিরঙ্গ সংস্কারই নিতান্ত সাময়িক প্রচেষ্টায় পরিণত।

এমন সময় নিতান্ত সাধারণ নিম্নমধ্যবিত্ত দরিদ্রের বেশে শ্রীরামকৃষ্ণ এসে দাঁড়ালেন কলকাতার আধুনিকতম চিন্তানায়কদের সামনে। অধ্যাত্ম উপলব্ধি যে শুধু কথার কথা নয়, কবিতারচনা বা বিতর্ক-সভার বিষয়বস্তু নয়, কোন বিশেষ দেশ, কাল বা সম্প্রদায়ের অধিগত নয়, সেই একান্ত গভীর জীবনসত্যের মর্মোদ্ঘাটন করলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। কখনো দক্ষিণেশ্বরে তাঁ। ছোট্ট ঘরটির ছোট্ট খাটটিতে বসে, কখনো কলকাতার শ্রেষ্ঠ মনীষীদের সান্নিধ্যে 'এসে, কখনো ঈশ্বরানুরাগী ভক্তবৃন্দের বাড়ি বাড়ি ঘুরে।

ভগবৎ উপলব্ধির সঙ্গে যে জাগতিক আর কোন ক্ষণসত্যের আপোষ চলে না, অথচ সেই এক উপলব্ধির আলোকে জগতের ধূলিকণা পর্যন্ত পরমসত্যের প্রকাশে পরিণত হয়—সেকথাটি আধুনিক যুগের সূচনায় আমাদের নতুন করে জানা প্রয়োজন ছিল। শুধু জানা নয়, শ্রীরামকৃষ্ণ এবং তাঁর আদর্শে গঠিত ত্যাগী ও গৃহী ভক্তমণ্ডলীর জীবনে ভারতবর্ষের চিরন্তন অধ্যাত্ম আদর্শের জীবনধারা প্রত্যক্ষ বাস্তবে পরিণত হল। অথচ কোন বিশেষ সম্প্রদায় রচনায় নয়, এই অধ্যাত্ম-প্রেরণার পাবকস্পর্শে পৃথিবীর সব ধর্মসাধনাই আপন পরমমূল্যে সঞ্জীবিত করাতেই শ্রীরামকৃষ্ণসাধনার সার্থকতা।

শ্রীরামকৃষ্ণসাধনার প্রায় সমস্তটাই এই দক্ষিণেশ্বরে—ভবতারিণীর মন্দির থেকে পঞ্চবটী—এই সীমার মধ্যে। কামারপুকুরের আগে ও পরে ভূতির খাল ও বুধুই মোড়লের শ্মশান দুটিতেও তাঁর সাধনার সামান্য অংশ ব্যয়িত। কিন্তু দক্ষিণেশ্বরই তাঁর সাধনা ও উপলব্ধির বহু স্রোতধারার সঙ্গমতীর্থ। সেই সঙ্গে তাঁর তপস্যার উত্তরাধিকারীদেরও জীবনের গঠনপর্ব এই দক্ষিণেশ্বরে এবং কাশীপুরে। যারা দক্ষিণেশ্বরের আনন্দের হাটে বেচাকেনা করতে এসেছিল, কাশীপুরের অন্তিমশয্যার পাশে তাদের শেষ পরীক্ষা হয়ে গেল। জীবনে মরণে যারা তাঁকে আশ্রয় করে রইল পববর্তী রামকৃষ্ণযুগসৃষ্টির অধিকার তাদেরই হাতে সমর্পিত।

বিশেষভাবে সে অধিকার পেলেন শ্রীরামকৃষ্ণেব স্ব-নির্বাচিত উত্তরাধিকারী নরেন্দ্রনাথ। অর্থাভাবে কাশীপুরেব আশ্রয় হারাতে হল। বরাহনগর, সেখান থেকে আলমবাজার, সেখান থেকে বেলুড়—নীলাম্বরবাবুর বাগানবাড়ি—তারপর বেলুড় মঠের জন্য জমি কেনা। এ জমি কেনার অর্থও সংগৃহীত হয়েছিল বিবেকানন্দের আমেরিকায় প্রদত্ত বক্তৃতামালায়। সঙ্ঘজননী সারদাদেবীর প্রার্থনা পূরণ হয়ে "এতদিনে ছেলেদের একটা মাথা গোঁজবার জায়গা"

হল।[১] বেলুড় মঠের ওপারে কাশীপুরে শ্রীরামকৃষ্ণের মহাশ্মশান—এপারে রচিত হয়েছে মহামন্দির। মরদেহের অতীত শ্রীরামকৃষ্ণ আজ শুভ্র মর্মরমূর্তিতে সৌম্যহাস্যে চিরপ্রদীপ্ত।

কাশীপুরে শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রনাথকে বলেছিলেন, 'তুই কাঁধে করে আমায় যেখানে নিয়ে যাবি, আমি সেখানেই যাব ও থাকব।'[২] ১৮৯৮-এর ৯ই ডিসেম্বর শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পূত ভস্মাস্থি ডান কাঁধে নিয়ে স্বামীজী নীলাম্বরবাবুর বাগানে ভাড়াটে বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত মঠ থেকে নূতন কেনা জমিতে যাত্রা করলেন। স্বামীজী সেদিন একান্তে শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীকে বলেছিলেন, "··· আমাদের এই যে মঠ হচ্ছে, তাতে সকল মতের, সকল ভাবের সামঞ্জস্য থাকবে। ঠাকুরের যেমন উদার মত ছিল, এটি ঠিক সেই ভাবের কেন্দ্রস্থান হবে, এখান থেকে যে মহাসমন্বয়ের উদ্ভিন্ন ছটা বেরুবে, তাতে জগৎ প্লাবিত হয়ে যাবে।"[৩]

স্বামীজীর পরিকল্পনা ছিল—"এই মঠ হবে বিদ্যা ও সাধনার কেন্দ্র স্থান। ···ধার্মিক গৃহস্থেরা এর চারিদিককার জমিতে ঘরবাড়ি করে থাকবে, আর মাঝখানে ত্যাগী সন্ন্যাসীরা থাকবে।"[৪]

"এখান থেকে যে শক্তির অভ্যুদয় হবে, তা জগৎ ছেয়ে ফেলবে; মানুষের জীবনগতি ফিরিয়ে দেবে; জ্ঞান ভক্তি যোগ ও কর্মের একত্র সমন্বয়ে এখান থেকে ideals বেরোবে; এই মঠভুক্ত সাধুদের ইঙ্গিতে কালে দিগদিগন্তরে প্রাণের সঞ্চার হবে।"[৫]

The spiritual impact that has come here to Belur will last fifteen hundred years—and this will be a great university. Do not think I imagine it, I see it. বেলুড়ে

১ শ্রীমা সারদাদেবী—স্বামী গম্ভীরানন্দ

২, ৩ স্বামিশিষ্য সংবাদ: উত্তরকাণ্ড: শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী

যে অধ্যাত্মপ্রেরণা সঞ্চারিত হয়েছে তা পনেরো শো বছর স্থায়ী হবে—এখানে এক বিরাট বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠবে। মনে করো না, এ আমার কল্পনা, এ আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। (শ্রীমতী জোসেফাইন ম্যাকলিয়ডের স্মৃতিকথা—Reminiscences of Vivekananda.)

দক্ষিণেশ্বরে যে বিশ্বকল্যাণযজ্ঞের শুভসূচনা, বেলুড়মঠে সেই হোমানল চিরপ্রজ্বলিত রাখাই স্বামীজীর উদ্দেশ্য ছিল। সে আগুন সন্ন্যাসের গৈরিক আভায়, ভক্তহৃদয়ের অরুণরাগে শ্রীরামকৃষ্ণ-মহাজীবনের চিরন্তন শিল্পরূপ জাগিয়ে তুলবে জগতের চরিতচিত্রশালায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ নিজে শিল্পী ছিলেন—ছবি আঁকতে পারতেন, সুন্দর মূর্তি গড়ে পূজো করতেন, ভাঙা মূর্তি জোড়া দিতেন দক্ষ কারিগরের মতো। তাঁর সেই শিল্পদৃষ্টি বিবেকানন্দের ভারত ও বিশ্বপরিক্রমায় পরিব্যাপ্ত হয়ে ভারতশিল্পের নবজাগরণের অন্যতম প্রধান প্রেরণা হয়ে উঠেছে। রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতীক ও বেলুড় মঠে শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির পরিকল্পনায় বিবেকানন্দের শিল্পদৃষ্টির উজ্জ্বলতম পরিচয়।

রামকৃষ্ণ মিশনের প্রকাশিত গ্রন্থাবলীতে এবং বেলুড়ে শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দিরের প্রবেশদ্বারের উপরে যে সর্পবেষ্টিত হংস-চিত্রটি দেখা যায়, সংক্ষেপে তা শ্রীরামকৃষ্ণজীবন ও দর্শনের প্রতীকস্বরূপ। "চিত্রস্থ তরঙ্গায়িত সলিলরাশি—কর্মের, কমলগুলি—ভক্তির এবং উদীয়মান সূর্যটি—জ্ঞানের প্রকাশক। চিত্রগত সর্পপরিবেষ্টনটি—যোগ এবং জাগ্রত কুণ্ডলিনী শক্তির পরিচায়ক। আর চিত্রমধ্যস্থ হংস-প্রতিকৃতিটির অর্থ পরমাত্মা। অতএব কর্ম, ভক্তি ও জ্ঞান, যোগের সহিত সম্মিলিত হইলেই পরমাত্মার সন্দর্শন লাভ হয় ...।"[৬] এই প্রতীকটি বিবেকানন্দরচিত শ্রীরামকৃষ্ণজীবনভাষ্য। শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবন ওই কর্ম, জ্ঞান, ভক্তির সঙ্গে যোগের সম্মেলনের আদর্শ। এই সম্মেলন যাঁর জীবনে ঘটেছে তিনিই পরমহংস—আত্মস্বরূপ।

বেলুড় মঠে শ্রীরামকৃষ্ণমন্দির-নির্মাণে বিবেকানন্দের কল্পনা—"এই ভাবী মঠ মন্দিরটির নির্মাণে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় শিল্পকলার একত্র সমাবেশ করবার ইচ্ছা আছে আমার। পৃথিবী ঘুরে গৃহশিল্প সম্বন্ধে যত সব idea নিয়ে এসেছি, তার সবগুলিই এই মন্দির নির্মাণে বিকাশ করবার চেষ্টা করব। বহু সংখ্যক জড়িত স্তম্ভের উপর একটি প্রকাণ্ড নাটমন্দির তৈরী হবে। তার দেওয়ালে শত সহস্র প্রফুল্ল কমল ফুটে থাকবে। হাজার লোক যাতে একত্র ব ধ্যান জপ করতে পারে, নাটমন্দিরটি এমন বড় করে নির্মাণ করতে হবে। আর শ্রীরামকৃষ্ণমন্দির ও নাটমন্দিরটি এমনভাবে গড়ে তুলতে হবে যে, দূর থেকে দেখলে ঠিক 'ওঁকার' বলে ধারণা হবে। মন্দির মধ্যে একটি রাজহংসের উপর ঠাকুরের মূর্তি থাকবে। দোরে ছদিকে ছটি ছবি এইভাবে থাকবে—একটি সিংহ ও একটি মেষ বন্ধু ভাবে উভয়ে উভয়ের গা চাটছে—অর্থাৎ মহাশক্তি ও মহানম্রতা যেন প্রেমে একত্র সম্মিলিত হয়েছে। মনে এই সব ভাব রয়েছে, এখন জীবনে কুলোয় তো কাজে পরিণত করে যাব।"[৭]

স্বামীজীর কল্পনা বাস্তবে রূপায়িত করতে গিয়ে কিছু অদলবদল হলেও শ্রীরামকৃষ্ণের সর্বধর্মসমন্বয়ের ভাবটি বেলু মন্দিরের চূড়াগুলি লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে। মন্দির, মসজিদ ও গীর্জার—ভারতীয় অধ্যাত্ম-ইতিহাসের কয়েকসহস্র বৎসর — একত্রে বেলুড়মঠের শ্রীরামকৃষ্ণমন্দিরের চূড়ায় এসে ধরা দিয়েছে। সমগ্র মন্দিরটি ভারতীয় স্থাপত্যশিল্পে ও অলঙ্করণে নয়নাভিরাম সার্থকতায় মণ্ডিত। শ্রীরামকৃষ্ণজীবন এই মন্দিরের রূপায়িত পাষাণে ধ্যানস্তব্ধ মহিমায় সমাসীন।

দক্ষিণেশ্বরের ভবতারিণীমন্দির, বিষ্ণুমন্দির ও দ্বাদশ শিবমন্দিরের

৪, ৫, ৬, ৭ স্বামিশিষ্যসংবাদ: উত্তরকাণ্ড।

স্থাপত্যরীতি বাংলার নিজস্ব মন্দিরশিল্পের অনুসরণ। বেলুড়মঠে শ্রীরামকৃষ্ণমন্দিরে সর্বভারতীয় তথা সমগ্র বিশ্বের অধ্যাত্মপ্রেরণাজাত স্থাপত্যকলার সমন্বয়। দক্ষিণেশ্বর থেকে বেলুড়—বাংলা থেকে ভারতে, ভারত থেকে সমগ্র বিশ্বে উত্তরণ।

স্বপ্নাদিষ্টা রাণী রাসমণি "গঙ্গার পশ্চিমকূল বারাণসী সমতুল" জেনে মন্দির স্থাপনার জন্য গঙ্গার পশ্চিমেই জমি খুঁজেছিলেন। কিন্তু পশ্চিমকূলে জমি পাওয়া সম্ভব হয় নি বলেই পূর্বকূলে দক্ষিণেশ্বরে ভবতারিণীর মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। তার কতকাল পরে সেই বারাণসী সমতুল গঙ্গার পশ্চিমকূলে বেলুড়মঠের প্রতিষ্ঠা। রাণী রাসমণির স্বপ্নসাধ হয়তো বেলুড়মঠে এসে পূর্ণ হবার প্রতীক্ষায় ছিল। এক অখণ্ড সংগীতের পরিপূর্ণতার মতো দক্ষিণেশ্বরের বিশ্বজননীর প্রসন্ন বরাভয়ের নিশ্চিত নিদর্শন ফুটেছে বেলুড়মঠে শ্রীরামকৃষ্ণের মর্মরমূর্তির অমল হাসির মাধুর্যে। দক্ষিণেশ্বর থেকে বেলুড় মানবাত্মার অমৃত অধিকারের অনন্ত প্রতিশ্রুতি।

মনন

শ্রীরামকৃষ্ণ : যুগ জীবন সাহিত্য

এক

উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলাদেশে ধর্ম ও সমাজ বিষয়ক যে আন্দোলনগুলি দেখা দিয়েছিল, তাদের মতামতের বিতর্কে বৈজ্ঞানিক যুক্তিশীলতা, মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর দরদ, এবং স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি আন্তরিক অনুরাগ ছিল,—কিন্তু যথার্থ আধ্যাত্মিকতা এসব কিছুর ঊর্ধ্বে এক চিরন্তন সত্তার অভিমুখে মানবচেতনাকে পরিচালিত করে। সেই একাগ্র আধ্যাত্মিকতার কিছু পরিচয় মেলে দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র প্রমুখ ব্রহ্মসমাজের নেতৃবৃন্দের মধ্যে। প্রধানতঃ সংস্কারক হলেও রাজা রামমোহন যথার্থ অধ্যাত্ম অনুরাগের অধিকারী ছিলেন। কিন্তু ঐ অধ্যাত্ম অনুরাগকে অবলম্বন করে একটি পরিপূর্ণ সাধক-জীবনের আবির্ভাব না ঘটলে ধর্মবিষয়ক বিচিত্র মতামতগুলি বিতর্কের বিষয়ই থেকে যেত, গতিশীল জীবন-সত্যে পরিণত হতে পারত না। সেকালের কোন কোন বুদ্ধিজীবী (বিদ্যাসাগর বা কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য স্মরণীয়) এই কারণে ধর্মচিন্তাকে অনাবশ্যক ভেবে সম্পূর্ণ পরিহার করতেন। ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে হুগলী জেলার কামারপুকুর গ্রামে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের ঘরে রামকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করলেন এই অধ্যাত্ম আদর্শের জীবন্তরূপ জাতির সামনে তুলে ধরবার জন্য।

চৈতন্যদেবের পরে অধ্যাত্ম অনুভূতির এত বিরাট প্রকাশ বাংলাদেশে আর হয় নি। উনিশ শতকের শিক্ষিত বাঙালী বৈজ্ঞানিক

চিন্তাধারার সংস্পর্শে এসে প্রত্যক্ষ সত্যের উপর অনেক বেশী নির্ভরশীল হয়ে পড়ল। অথচ শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর অলৌকিক দর্শন ও অনুভূতি পাণ্ডিত্যস্পর্শহীন সরল ভাষায় এমন জীবন্তরূপে ফুটিয়ে তুলতেন যে নব্যশিক্ষিত বাবু ও পণ্ডিতের দল জীবনের গভীরতম সত্যোপলব্ধির সামনে স্তব্ধ হয়ে যেতেন। হিন্দু কলেজের ছাত্রেরা তখন ছাত্র-সমাজের নেতৃস্থানীয়; তাদের প্রভাবে বিচার, বিতর্ক, বিজ্ঞান বিদ্যার্থীদের বরণীয়। সেজন্য প্রয়োজন বহুবিস্তৃত অধ্যয়ন ও অনুশীলন। অথচ শ্রীরামকৃষ্ণের দৃষ্টিতে আত্মজ্ঞানলাভের জন্য কোন 'বই' পড়ার দরকার নেই, শাস্ত্রজ্ঞান না থাকলেও চলে। প্রয়োজন শুধু শুদ্ধ মন ও ব্যাকুলতা। অর্থকরী বিদ্যার নব নব প্রচেষ্টা যখন চারিদিকে চলছে, তখনই বালক "গদাধর" চালকলা-বাঁধা বিদ্যায় বিতৃষ্ণা প্রকাশ করলেন। অন্য সকলে যখন ধর্মবিষয়ক তর্কে বিতর্কে মত্ত, গদাধর তখন ধর্মপথে সাধনা করে যথার্থ আধ্যাত্মিকতা লাভে সমুৎসুক। পাশ্চাত্য জীবনধারার সংস্পর্শে যখন নিত্য নূতন ভোগাদর্শ সাধারণ মানুষকে উদ্দীপ্ত করে চলেছে, ঠিক সেই সময় রামকৃষ্ণ বর্জন করলেন কাম-কাঞ্চন। সাধারণ বামুন-পুরুতের মতো পূজো-অর্চায় সন্তুষ্ট না থেকে সত্যি সত্যি ভগবানের জন্য ব্যাকুল হলেন এবং তাঁর ব্যাকুল আহ্বানে দক্ষিণেশ্বরের ভবতারিণী জাগ্রত হয়ে "নিরক্ষর" রামকৃষ্ণের হৃদয়ে অনন্ত জ্ঞানের ভাণ্ডার ঢেলে দিলেন। ভারতবর্ষে বহুযুগের অধ্যাত্ম-সাধনার ঘনীভূত উপলব্ধি এসে ধরা দিল রামকৃষ্ণের হৃদয়ে। যীশুর ভগবৎপ্রেম ও সন্দর্শন এবং চৈতন্যের ভাবোন্মাদ ও কৃষ্ণপ্রাপ্তি যে অর্থে সত্য, রামকৃষ্ণের এই উপলব্ধিও সে অর্থে সত্য। যাঁরা ভক্ত, তাঁদের কাছে এই ধরণের সাধক পুরুষেরা অবতার বলে গৃহীত। কিন্তু শুধু ভক্তিবাদের দৃষ্টিতে না দেখেও বলা যায়, এই সব ক্ষণজন্মা পুরুষদের অনুভূতিলব্ধ সত্যকে অবলম্বন করেই যথার্থ ধর্মভাব সমাজ ও জাতিকে ধারণ করে থাকে।

উনিশ শতকের ধর্মান্দোলনে এই যথার্থ ধারণী শক্তি ছিল শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনায়।

ব্যক্তি হিসাবে এমন সরল, সত্যনিষ্ঠ, নির্লোভ ও জিতেন্দ্রিয় পুরুষ সব সমাজেই শ্রদ্ধার যোগ্য। আজীবন ভগবৎ তন্ময়তায় কাটিয়ে গেলেও জীবনের প্রতিটি খুঁটিনাটি কর্মে সতর্ক দৃষ্টি; কঠোর নীতিপরায়ণ বৈরাগ্যধর্মী সাধক হয়েও মানুষের দুঃখ বেদনায় ভ্রান্তিতে সমব্যথিত; জ্ঞানভক্তির সম্মিলিত ভাববিগ্রহ অথচ নিপুণ পরিহাস-রসিক এই চরিত্রটি উনিশ শতকের এক বিস্ময়কর সৃষ্টি।

তবু আধুনিক কোন কোন বুদ্ধিজীবী সামাজিক ও জাতীয় প্রয়োজনের বিচারে শ্রীরামকৃষ্ণকে তেমন উল্লেখযোগ্য স্থান দিতে কুণ্ঠিত। এ দ্বিধা ভ্রান্তদৃষ্টির ফল। ভারতবর্ষের যে ব্রহ্মদৃষ্টি ইহলোকের সঙ্গে অনন্তলোকের রাখীবন্ধন করে মানুষকে সীমা থেকে অসীমের স্তরে উন্নীত করার জন্য যুগে যুগে সাধকদের মধ্য দিয়ে উদ্ভাসিত, তারই পূর্ণ উদ্ভাসন শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনে। সুতরাং উনিশ শতকের চিন্তাধারার আলোচনাকালে ভারতের জাতীয় চৈতন্যের শ্রেষ্ঠ বিকাশ এই মহামানব সম্বন্ধে ধীর স্থিরভাবে বিচারমূলক আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে আধুনিক পণ্ডিতদের মধ্যে যে নেতিবাদী দৃষ্টিভঙ্গী দেখা যায়, তা মোটামুটি এই তিন ভাগে বিভক্ত—(১) উনিশ শতকের চিন্তাজগতের বিজ্ঞাননিষ্ঠ প্রগতি "রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ" প্রবর্তিত অধ্যাত্মচিন্তার দ্বারা ব্যাহত হওয়ায় উনিশ শতকের জাগরণ সম্পূর্ণ হতে পারে নি। (২) সেই সঙ্গে এই আধ্যাত্মিকতা 'হিন্দু' ধর্মকে অবলম্বন করে বিকশিত হওয়ায় পরবর্তীকালে সাম্প্রদায়িক অহমিকাজাত সংঘর্ষ দেখা দিয়েছে; এর ফলে জাতীয় ঐক্য বিনষ্ট হয়। (৩) পারমার্থিক কল্যাণের উপর জোর দেওয়ার ফলে

অলৌকিক ও অবাস্তব কল্পনার প্রতি মধ্যযুগীয় দৃষ্টিভঙ্গী আবার ফিরে এসেছে এবং তার ফলে জাতীয় অবনতি ঘটেছে।

সংক্ষেপে এই ধরনের সমালোচনার উত্তর এই—(১) বিজ্ঞান ও ধর্মের যে ভেদ আমরা ইউরোপের বৈজ্ঞানিক যুগে দেখতে পেয়েছি, ভারতবর্ষে সেভাবে কোন পার্থক্যবোধ দেখা দেয় নি। কারণ ভারতবাসীরা যেমন তৃণ লতায় মাটিতে পাথরে প্রতিমায় দেবতার অধিষ্ঠান অনুভব করে, তেমনি তারা জানে যে সর্বসৃষ্টির অন্তরালে এক পরম সত্য রয়েছেন। এই সত্যের উপলব্ধির সঙ্গে বিজ্ঞানের কোন বিরোধ নেই। সূর্য-উপাসক তাই সূর্যের বৈজ্ঞানিক স্বরূপ জেনেই ব্রহ্মের বিশেষ প্রকাশরূপে সূর্যবন্দনা করতে পারেন।

'এহ বাহ্য'। বিজ্ঞান বহির্জগতের কারবারী। তার নিজস্ব ক্ষেত্রে বিজ্ঞান কালে আরও উন্নত হবে। কিন্তু আধ্যাত্মিকতা যে জগতের সংবাদ এনে দেয়, সে জগৎ সম্বন্ধে বিজ্ঞান নিরুত্তর। মানব হৃদয়ের পরমশান্তি, মুক্তি, নির্বাণ, salvation, যাই তাকে আখ্যা দিই না কেন, সে ব্যাপারে বিজ্ঞানের কোন কৃতিত্ব নেই। হয়তো কোনদিন এই বাইরের জগতের সঙ্গে অন্তরজগতের পুনর্মিলন ঘটবে। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, তখন বিজ্ঞান অধ্যাত্মসত্যেরই আর এক পন্থায় পরিণত হবে। বলা বাহুল্য, একমাত্র পন্থা নয়।

যথার্থ আধ্যাত্মিকতা অলৌকিকতার উপরে নির্ভরশীল নয়, মানব-মানসের সম্যক বিকাশেই তার মহিমা। আজ বিজ্ঞান মানব-মনের বিকারের ক্ষেত্রে অসহায় যন্ত্রে পরিণত। মানবকল্যাণে বহির্বিজ্ঞানের যথার্থ প্রয়োগের জন্যই অধ্যাত্মবিজ্ঞানের চর্চা প্রয়োজন। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেই অধ্যাত্মবিজ্ঞানে পারদর্শী ছিলেন। অথচ বহির্বিজ্ঞানকে তাঁরা অস্বীকার করেন নি। যুগোপযোগী পরিবর্তনকে জাতীয় বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে খাপ খাইয়ে আমাদের অগ্রসর হতে হবে, একথা অবশ্য স্মরণীয়। রামকৃষ্ণ-শিষ্য বিবেকানন্দ ভারতবর্ষকে

আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানে প্রাগ্রসর একটি মহাজাতিরূপেই দেখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বর্তমান ভারত যেন প্রতীচ্যের সব কিছুকেই প্রগতি মনে না করে এবং বিচারশীল মন নিয়ে আপন স্বাতন্ত্র্যে প্রতিষ্ঠিত থেকেই ধর্ম, সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতি সর্ব বিষয়ে সংগঠিত হয় এই ছিল তাঁর আদর্শ।

আমরা বিশ শতকে ধর্মচিন্তাকে যতটা ব্যক্তিগত ব্যাপার বলে মনে করি, উনিশ শতকের চিন্তানায়কেরা তা করতেন না। রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ অধিকাংশ মনীষীই ধর্মচিন্তার আলোকে ইহজীবনের কথা ভেবেছেন। মতামতের বিভ্রান্তি থেকে নিশ্চিত উপলব্ধির ভিত্তিভূমিতে "যত মত তত পথ" ঘোষণা করে রামকৃষ্ণ একটি পরম ঐক্যসূত্রে উনিশ শতকের ধর্মচিন্তাকে গ্রথিত করেছিলেন। সাকার ও নিরাকার সাধনার স্তরপরম্পরা নির্দিষ্ট করে রামকৃষ্ণই দেখিয়ে দিলেন যে, দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও অদ্বৈত এই ক্রমবিভাগের সোপান পরম্পরায় মানুষ অধ্যাত্মজ্ঞানের সর্বোচ্চ উপলব্ধিতে এসে পৌঁছায়।

মানবজীবনের বহুমুখী জিজ্ঞাসার মধ্যে অধ্যাত্ম-জিজ্ঞাসা একটি প্রধান জিজ্ঞাসা। আমরা যে পাশ্চাত্য দেশকে জড়বাদী, বস্তুবাদী বা মানবতাবাদী বলে ধারণা করে সর্ববিষয়ে তাদেরই অনুকরণ করতে চাই সেই দেশের অন্তরেতিহাসেও অধ্যাত্মসাধনার ধারা নিয়ত প্রবহমান। এই অতি প্রগতির যুগেও সে দেশের চিন্তাশীল মানুষের একাংশ অধ্যাত্মজগতের আদর্শ ও অনুভূতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধাশীল। খ্রীষ্টজীবন ও ধর্মাদর্শের কথা বাদ দিলেও বুদ্ধের প্রতি পাশ্চাত্য মনীষীদের অপরিসীম শ্রদ্ধার কথা তো সুবিদিত। উনিশ শতকে রামকৃষ্ণের প্রতি পাশ্চাত্যবাসীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন মনীষী ম্যাক্সমূলর ও পরবর্তীকালের রমঁ্যা রলঁ্যা। এই দুই ভারত-প্রেমিকের গ্রন্থ পাঠ করে অগণিত পাশ্চাত্যবাসীর ঔৎসুক্য জেগেছে

ভারতবর্ষের মর্ম ও ধর্মসাধনার প্রতি। এদিক থেকে দেখতে গেলে ইউরোপ-আমেরিকাকে শুদ্ধমাত্র ঐহিকতাপরায়ণ মনে করে যাঁরা তুষ্ট বা রুষ্ট—দু দলই ভ্রান্ত।

আসল কথা এই, আধ্যাত্মিকতার একটি নিজস্ব স্থান মানব-ইতিহাসে রয়েছে। তাকে যুক্তিসঙ্গতভাবে প্রমাণ করা যায়, আবার যুক্তির অতীতরূপে উপলব্ধি করা যায়। মানবমানসে এর চিরন্তন স্থান অস্বীকার করাই অন্ধত্বের পরিচায়ক।

উনিশ শতকের নবজাগরণকে বিশ শতকের জিজ্ঞাসুরা অনেক সময় ইউরোপের রেনেসাঁসের সঙ্গে তুলনা করে থাকেন। স্বভাবতই তাঁরা এ দুই জাগরণের মিলের দিকটাই বেশী করে দেখে থাকেন। আমাদের মনে হয়, অমিলের দিকটিও বিশেষভাবে লক্ষণীয়। ইউরোপীয় চিন্তাজগতে খ্রীষ্টধর্মের ত্যাগ বৈরাগ্য এবং গ্রীক জীবনাসক্তির দ্বন্দ্ব মধ্যযুগ থেকে চলে এসেছে। রেনেসাঁস গ্রীক মনোধর্মকেই প্রাধান্য দিয়েছিল। বাংলা তথা ভারতের নবজাগরণ কিন্তু পাশ্চাত্য জীবনপ্রবাহেই আবদ্ধ নয়, প্রাচ্য সাধনার অধ্যাত্ম সম্পদকেও আমরা এই জাগরণের ফলেই নতুন করে উপলব্ধি করেছি। রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ তাই উপনিষদের বাণীকে জীবনের অবলম্বন করেছিলেন; বঙ্কিমচন্দ্র গীতা ও পৌরাণিক ধর্মচেতনার পটভূমিতে কর্ম ও ভক্তির আদর্শ প্রচার করেছিলেন; আর রামকৃষ্ণদেবের মধ্যে ভারতের নানামুখী সাধনার স্রোত মিলিত হয়ে এক উদার ভাব-সাগরের সৃষ্টি করেছিল। এই দিক থেকে দেখলে মনে হয় রামকৃষ্ণদেবের মধ্যেই উনিশ শতকের নবজাগরণের ধ্যানলব্ধ পূর্ণতা ধরা দিয়েছে, বিবেকানন্দ তাঁরই বাণীরূপ।

(২) সকলেই জানেন যে, রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সব ধর্মের প্রতিই তাঁদের শ্রদ্ধা জানাতেন। কিন্তু সে কেবল মৌখিক শ্রদ্ধা নিবেদন নয়। বাস্তবিক, তাঁরা মনে করতেন যে আন্তরিক হলে মানুষ সব

পথেই ভগবানের কাছে গিয়ে পৌঁছায়। সেই সঙ্গে তাঁরা এও জানতেন যে, কোন একটি নির্দিষ্ট সাধনপন্থা ধরেই সাধনা চলবে না। এ বিষয়ে রামকৃষ্ণদেবের উপমা—"বাড়ীর বউ, দেওর, ভাসুর ইত্যাদিকে পা ধোয়ার জল, আসন দিয়ে সেবা করে, কিন্তু স্বামীকে যেমন সেবা করে, তেমন সেবা আর কাউকে করে না। স্বামীর সঙ্গে সম্বন্ধ আলাদা।" (কথামৃত—৩য় ভাগ)

আধুনিক পণ্ডিত হেসে অর্থ করলেন, তার মানে আসলে হিন্দুধর্মের প্রতি নিষ্ঠাই থাকবে। সুতরাং "যত মত তত পথ" কথাটি শিথিল বাক্য মাত্র। বলা বাহুল্য, অত সহজে রায় দিলেই বিষয়টি পুনর্বিচার করা প্রয়োজন হয়। রামকৃষ্ণদেবের জীবন ও বাণী আলোচনা করে সাধনপন্থা সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য এই মনে হয়—যার যার নিজের ধর্মে বা ভাবে অধিষ্ঠিত থেকে সাধনা করাই আগে প্রয়োজন। হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান সকলের পক্ষেই তাই। তারপর সাধনসহায়ে যথার্থ উপলব্ধি হলে তখন সাধক সব পথেই যে ভগবানের কাছে যাওয়া যায় একথা আপনিই বুঝতে পারবেন। "সব পথ দিয়ে তাঁকে পাওয়া যায়। সব ধর্মই সত্য। ছাদে ওঠা নিয়ে বিষয়। তা তুমি পাকা সিঁড়ি দিয়েও উঠতে পার; কাঠের সিঁড়ি দিয়েও উঠতে পার; বাঁশের সিঁড়ি দিয়েও উঠতে পার; আর দড়ি দিয়েও উঠতে পার।"

(কথামৃত ৫ম ভাগ)

সুতরাং হিন্দুধর্ম বা শক্তিসাধনা এমন কোন নির্দিষ্ট পন্থাকেই একমাত্র সত্য মনে করে বিশ্বশুদ্ধ লোককে সেই গড্ডালিকার অনুগামী হতে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ কোথাও বলেন নি। যুগযুগান্ত ধরে ভারতীয় অধ্যাত্মসাধনার যে ধারা প্রবহমান, সে ধারার মধ্যে প্রাণ-শক্তির প্রকাশ তাঁরা অনুভব করেছিলেন, তার প্রচার তাঁদের কর্তব্য ছিল। তবু কখনও এমন কথা তাঁরা বলেন নি যে, একমাত্র তাঁদের পন্থাই সত্য। এ অবস্থায় রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক কারণে সঞ্জাত

হিন্দু-গোঁড়ামিকে যাঁরা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ঘাড়ে চাপাতে চান, তাঁরা হয় উদ্দেশ্য-প্রণোদিত, নয় আচ্ছন্নদৃষ্টি।[১]

কেউ কেউ এমন কথাও বলেন, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ যে হিন্দুধর্মের গৌরববোধকে জাগ্রত করে তুলেছিলেন সেই গৌরববোধই পরবর্তীকালে হিন্দুসাম্প্রদায়িকতার জনক। বোধ করি এক হিন্দুরাই নিজেদের ধর্মগৌরবকে লজ্জার দৃষ্টিতে দেখে থাকেন। আমাদের নেতারাও যখন তখন হিন্দুদের সহনশীল উদারনৈতিক হবার উপদেশ দিয়ে থাকেন। কিন্তু অন্য ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা রেখেই স্বধর্মে গৌরবান্বিত হওয়া চলে এ কথাটি আমাদের মনে থাকে না। জাতীয় সংস্কৃতি, ইতিহাস, চিন্তাধারা নিয়ে গৌরব করা চলবে, কিন্তু ধর্মের নাম থাকলেই গৌরব চলে যাবে, এ ধরনের চিন্তাধারা নিতান্ত বিকৃত। ধর্ম আমাদের জাতীয় চেতনার মেরুদণ্ড। ধর্ম-নামাঙ্কিত সামাজিক আচরণগুলি নিতান্ত পরিবর্তনশীল। কিন্তু আধ্যাত্মিকতা শাশ্বতকালের সম্পদ। সেই গৌরববোধ নষ্ট হলে জাতীয় গৌরব নষ্ট হয়। পরবর্তীকালে যারা সাম্প্রদায়িক হয়ে উঠেছে তারা কেউ রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের অনুগামী নয়। যে কারণে ক্যাথলিক প্রটেষ্টাণ্ট, খৃষ্টান-মুসলমান, শাক্ত-শৈবদের দ্বন্দ্ব হত, সেই কারণগুলির একটিও ধর্ম নয়, ধর্মের একান্ত অভাব। হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার কারণও

১। ১৮৯৩ সনের ১০ই সেপ্টেম্বর বিশ্বধর্মসভায় বিবেকানন্দের প্রথম ভাষণের অংশবিশেষ এ প্রসঙ্গে লক্ষণীয়—I am proud to belong to a religion which has taught the world both tolerance and universal acceptance. We believe not only in universal toleration, but we accept all religions as true. I am proud to belong to a nation which has shelterd the persecuted and the refugees of all religions and all nations of the earth.

তাই। তাছাড়া, জাতীয় সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামির জন্য আমাদের দেশের কোন কোন নেতা বা বুদ্ধিজীবীরা কেবল হিন্দুদেরই দায়ী করেন। অন্য ধর্মের গোঁড়ামি সম্বন্ধে উচ্চবাচ্য করতে তাঁদের সাহসে কুলায় না। ইতিহাস কিন্তু অন্যরকম সাক্ষ্য দেয়।

উনিশ শতকের প্রথমার্ধে ইংরেজী শিক্ষা প্রচারিত হওয়ার পর নব্য শিক্ষিতেরা অনেকেই নিজেদের ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলেন। তার কারণ আমাদের ধর্ম ও সমাজ অনেক ক্ষেত্রেই একাকারিত। সামাজিক ত্রুটিগুলি যে মূল অধ্যাত্মসত্যের ত্রুটি নয়, একথা তখন আমরা ভেবে দেখি নি। হিন্দুধর্মে সর্বস্তরের লোকের জন্য ধর্মচেতনার যে বিভিন্ন সাধনপন্থা রয়েছে সেগুলি জাতির ইতিহাস ও মানবমনস্তত্ত্বের কোন্ কোন্ প্রয়োজনে উদ্ভূত, সে কথা তখন উপেক্ষিত ছিল। পুতুলপূজা, পাথরপূজা, কালীপূজা এসব সাহেবদের কাছে নিন্দিত, সুতরাং বিদেশীদের অনুসরণে হিন্দুধর্মের নিন্দা করাটাই তখন শিক্ষিতের লক্ষণ ছিল। কিন্তু যে জাতির ধর্ম নিজস্ব জীবনধারা থেকে আহৃত না হয়ে পরজাতির অনুকরণ করে চলে সে জাতির প্রাণশক্তিও বিনষ্ট হতে থাকে। কথাটা ব্রাহ্মসমাজের উদাহরণ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়। রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ উপনিষদের মধ্যে প্রাণের প্রেরণা খুঁজে পেলেও হিন্দুধর্মের আচার পদ্ধতিতে আস্থা পান নি। অনেকটা খ্রীষ্টীয় উপাসনাপদ্ধতির অনুকরণ তাঁদের ধর্মমতে এসে গিয়েছিল। কেশবচন্দ্র সেই ভাবটিকে আরো জোরালো করলেন তাঁর খ্রীষ্ট-ভক্তিদ্বারা। ব্যক্তিগতভাবে খ্রীষ্টভক্তি শ্রদ্ধার যোগ্য, সন্দেহ নেই। মুশকিল বাঁধলো তখনই যখন ব্রাহ্মরা হিন্দুর নিজস্ব সাধনাগুলির মধ্যে এক ব্রহ্মোপাসনা ছাড়া আর সব কিছুকেই বুদ্ধিযোগে বাতিল করে বসলেন। ধর্মমত সম্বন্ধে এই গোঁড়ামির ফলেই ব্রাহ্মরা কিছুকালের মতো হিন্দুসমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন বলে মনে হত। যাঁরা ব্রাহ্ম নন, তাঁরা হয় গোঁড়া বামুনগিরিতে ফিরে যেতে

চাইলেন, নয়তো ধর্মকে নিতান্তই অর্থহীন বলে মনে করলেন। হিন্দু-ধর্ম সম্বন্ধে হিন্দুদের কুণ্ঠাও বড় কম ছিল না। তাই রাজনারায়ণের 'হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা' বক্তৃতাটি সেকালের শ্রোতাদের মনে এত আগ্রহ জাগিয়ে তুলেছিল। কিন্তু শুধু বক্তৃতায় তো ধর্মপ্রতিষ্ঠা হয় না। জীবন চাই। রামকৃষ্ণজীবন সেই প্রতিষ্ঠাভূমি। সেই ভূমির ভিত্তিতেই হিন্দুধর্মের নিজস্ব মহিমাবোধ শিক্ষিতদের উদ্বুদ্ধ করে তোলে। সেই সময়ে ইংল্যাণ্ডে, জার্মানীতে, সমগ্র ইয়োরোপে পণ্ডিতবর্গের সংস্কৃত-চর্চাও নব্য হিন্দুয়ানির গরিমা বাড়িয়েছিল।

কিন্তু একদা যারা নিজেদের সব কিছু, এমন কি, ধর্ম পর্যন্ত হীন বলে মনে করত, তারা যদি আবার আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়ে গৌরবদীপ্ত হয়ে উঠে, সে জন্য তাদের কোন দোষ দেওয়া যায় না। এই গৌরব-বোধের দ্বারা তারা অন্য সম্প্রদায়কে হীন মনে করলেই সেটা দূষণীয় হতে পারতো। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের উদার ধর্মাদর্শ সেই হীনতা থেকে আমাদের রক্ষা করেছিল ।

(৩) উনিশ শতকের মানবিকতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে পরমার্থবাদীদের দৃষ্টিভঙ্গীর বিরোধ ছিল না। ইউরোপীয় রেনেসাঁসের ইতিহাসেও অধ্যাত্ম-চেতনার সঙ্গে মানবিক চেতনার সহাবস্থান ছিল। কোন দেশেই এ দুটি জিনিস সম্পূর্ণ পৃথক নয়। মাঝে মাঝে হয়তো গির্জা, মঠ, পুরোহিত পাদ্রী এরা আধ্যাত্মিকতাকে আচ্ছন্ন করে কতকগুলি প্রাণহীন আচারকে বড় করে তোলে। তারপর আবার যথার্থ অধ্যাত্মচেতনা এসে মানবমঙ্গল ও পরমার্থিকতার যোগসূত্র স্থাপন করেছে। পাশ্চাত্য দেশে খ্রীষ্ট-উপাসকেরা মানবকল্যাণের জন্য কতশত আয়োজন করেছেন, তা আমরা জানি; আমাদের দেশেও দানধর্ম, উৎসব-অনুষ্ঠান, বৃক্ষ, পুষ্করিণী, ধর্মশালা প্রতিষ্ঠাদির ভিতর দিয়ে এই ধর্মচেতনা ও মানবচেতনার মিলন ঘটত। আধুনিক কালে সেবাধর্মের কিছু সূচনা দেখা দেয় কেশবচন্দ্রের কালে। রামকৃষ্ণ-

বিবেকানন্দ প্রচারিত সেবামূলক ত্যাগধর্মে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের শ্রেষ্ঠ ভাবাদর্শগুলি মিলিত হয়ে জাতির সামনে এক নূতন অধ্যাত্ম-আদর্শ স্থাপন করেছে।

বিশুদ্ধ মানবিকতাবাদ বলতে যদি এই বুঝায় যে "মানব" ছাড়া অন্য কিছুই তার লক্ষ্য হবে না, তা হলে বলতে হয় সে রকম খাঁটি "মানব" বলতে কিছু নেই। মানুষের দেহধর্ম যদি সত্য হয় তবে তার অধ্যাত্মধর্মও সত্য। মানবপ্রেমিকেরা মানবচিত্তের এত বড় একটা উপলব্ধিকে যদি অস্বীকার করেন, তা হলে বলতে হবে, তাঁদের মানবিকতাও অপূর্ণ। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ মানুষের দেহ, মন অধ্যাত্মস্বরূপকে সামগ্রিকভাবে দেখে যে মানবপ্রেমের মন্ত্র প্রচার করে গেছেন, তা ই ভারতবর্ষীয় আদর্শের "মানবতাবাদ"।

কিন্তু অধ্যাত্ম-উন্নতি যে ঐহিক উন্নতিবিহীন জড়প্রাণ মানব বা জাতির পক্ষে সম্ভব নয় সে কথাও রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ উপলব্ধি করতেন। তাই বিবেকানন্দ ভারতবাসীকে রজোগুণে সমৃদ্ধ হয়ে জাতীয় উন্নতির পথে অগ্রসর হতে বারংবার আহ্বান করেছেন। তবে ত্যাগের সনাতন আদর্শ সামনে রেখেই অগ্রসর হতে বলেছেন। ভারতবর্ষের ব্রহ্মোপলব্ধির আদর্শ সামনে রেখেই পাশ্চাত্য সভ্যত উন্নতির উপকরণে বর্তমান ভারতকে অগ্রসর হতে হবে।

যথার্থ অধ্যাত্মসাধনার অধিকারী লক্ষে একজন পাওয়াও কঠিন। এই তত্ত্বটি জেনেই রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাধারণ মানুষকে সংসার-সম্ভোগের মধ্য দিয়ে ক্রমে অগ্রসর হতে বলেছেন।[৩] অলৌকিক

৩। রামকৃষ্ণদেব বলতেন, "খালি পেটে ধর্ম হয় না।"
বিবেকানন্দের মত—"ধর্মের চেয়ে মোক্ষটা' অবশ্য অনেক বড়,—কিন্তু আগে ধর্মটি করা চাই।" ধর্ম বলতে বিবেকানন্দ বুঝিয়েছেন—"বীরভোগ্যা বসুন্ধরা"। বীর্য প্রকাশ কর, সাম, দান, ভেদ, দণ্ডনীতি-প্রকাশ কর, পৃথিবী

দর্শন বা অনুভূতি রাস্তা-ঘাটে মেলে না একথা মনে রাখলেই আজকালকার "বিরিঞ্চিবাবা" ও "মা"-য়েদের সম্বন্ধে বিভ্রান্তদের চোখ খুলতো। সে যাই হোক, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ এই অলৌকিকতাকেই তাঁদের সাধনার প্রমাণস্বরূপ পেশ করেন নি যে অধ্যাত্ম অনুভূতি তাঁদের হয়েছিল, তার দ্বারা তাঁরা শুদ্ধসত্ত্ব সত্যনিষ্ঠ পূর্ণত্যাগী হয়ে উঠেছিলেন এবং সেই ধরনের মানুষই তৈরি করে গেছেন। যথার্থ আধ্যাত্মিকতার পরীক্ষা ওইখানে। হাজার বুজরুকিব দ্বারা সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার জো নেই। তবে অধ্যাত্মসাধনার স্তর-বিশেষে এমন অনেক উপলব্ধিই জাগে যা সাধারণ মানুষের দৃষ্টি বা মানসে ধরা দেয় না। যীশু, বুদ্ধ, মহম্মদ, চৈতন্য, রামকৃষ্ণের জীবনে এমন অনেক উপলব্ধিক্ষণ এসেছে। কিন্তু সেই সব উপলব্ধি তাঁদের সাংসারিক যশ, অর্থ, সম্মানের প্রতি আকৃষ্ট করে নি; বরং আরো বৈরাগ্য ও আধ্যাত্মিকতার পথেই নিয়ে গেছে।

অধ্যাত্মজীবনের এই বিশুদ্ধ প্রশান্তির মূল্য অসাধারণ। পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পন্থায় যুগ-যুগ-ধাবিত মানবযাত্রীর হৃদয়ে এই প্রশান্তিই ধ্রুবনির্দেশ দিয়েছে জীবনের পরমলক্ষ্যের। রাজনীতি অর্থনীতির কলকোলাহলের ঊর্ধ্বে মানবপ্রাণে এই চিরন্তন সত্যের প্রতি শ্রদ্ধা চির-জাগরুক। তাই অধ্যাত্মসাধনার দ্বারা আমাদের জাতীয় প্রাণ-শক্তির পুনরাবাহন করে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভারতবাসীর মহত্তম কল্যাণসাধন করেছেন।

ভোগ কর, তবে তুমি ধার্মিক। আর ঝাঁটা, লাথি খেয়ে, চুপটি করে ঘৃণিত জীবন যাপন করলে ইহকালেও নরকভোগ, পরকালেও তাই। এইটি শাস্ত্রের মত।" (প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য)

দুই

রামকৃষ্ণদেবের শৈশব ও কৈশোরের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য স্মৃতি মনে পড়ছে—"ও দেশে ছেলেবেলায় আমায় পুরুষ মেয়ে সকলে ভালবাসত। আমার গান শুনত।…ছোকরাদের ভিতর দু'একজন ভাল লোক দেখলে খুব ভাব করতুম। কারুর সঙ্গে সেঙ্গাত পাতাতুম। কিন্তু এখন তারা ঘোর বিষয়ী। এখন তারা কেউ কেউ এখানে আসে, এসে বলে, ওমা পাঠশালেও[1] যেমন দেখেছি এখানেও[2] ঠিক তাই দেখছি।

পাঠশালে শুভঙ্করী আঁক ধাঁধা লাগত। কিন্তু চিত্র বেশ আঁকতে পারতুম, আর ছোট ছোট ঠাকুর বেশ গড়তে পারতুম।

সদাব্রত, অতিথিশালা, যেখানে দেখতুম সেখানে যেতুম; গিয়ে অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতুম। কোনখানে রামায়ণ কি ভাগবত পাঠ হচ্ছে, তা বসে বসে শুনতুম। তবে যদি ঢং করে পড়ত, তাহলে তার নকল করতুম, আর অন্য লোকেদের শুনাতুম।

মেয়েদের ঢং বেশ বুঝতে পারতুম। তাদের কথা সুর নকল করতুম।…নষ্টমেয়ে বুঝতে পারতুম।

…আমি এ সব গান ছেলেবেলায় খুব গাইতাম (ভক্তিমূলক গান—দাশরথি, রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত প্রভৃতির)[3]এক এক যাত্রায় সমস্ত পালা গেয়ে দিতে পার্তাম। কেউ কেউ বলত আমি কালীয়দমন যাত্রার দলে ছিলাম।[4]

সেটা জ্যৈষ্ঠ কি আষাঢ়মাস হবে; আমার তখন ছয় কি সাত বছর

১। কামারপুকুর ২। দক্ষিণেশ্বর ৩। বন্ধনীস্থিত মন্তব্য লেখকের
৪। কথামৃত (৫ম ভাগ)

বয়স। একদিন সকালবেলা টোকোয় মুড়ি নিয়ে মাঠের আলপথ দিয়ে ক্ষেতে যাচ্ছি। আকাশে একখানা সুন্দর জলভরা মেঘ উঠেছে—তাই দেখছি ও যাচ্ছি। দেখতে দেখতে মেঘখানা আকাশ প্রায় ছেয়ে ফেলেছে, এমন সময় এক ঝাঁক সাদা দুধের মত বক ঐ কাল মেঘের কোল দিয়ে উড়ে যেতে লাগলো। সে এমন একটা বাহার হলো! —দেখতে দেখতে অপূর্বভাবে তন্ময় হয়ে এমন একটা অবস্থা হলো যে আর হুঁস রইলো না! পড়ে গেলুম—মুড়িগুলো আলের ধারে ছড়িয়ে গেল। কতক্ষণ ঐভাবে পড়েছিলাম বলতে পারি না। লোকে দেখতে পেয়ে ধরাধরি করে বাড়ী নিয়ে এসেছিল। সেই প্রথম ভাবে বেহুঁস হয়ে যাই।"[৫]

এই প্রথম ভাবাবস্থার পরে দেবী বিশালাক্ষী দর্শন করতে গিয়ে এবং গ্রামের যাত্রায় শিবের ভূমিকায় অভিনয় করতে গিয়েও বালক রামকৃষ্ণের ভাবাবেশ হয়েছিল। শৈশব থেকেই অধ্যাত্মবিষয়ের প্রতি বালক রামকৃষ্ণের আন্তরিক অনুরাগের ফলে কামারপুকুরে যে সব সাধুফকিরেরা পুরী যাবার পথে উপস্থিত হতেন গদাধর তাদের সঙ্গে সানন্দে মেলামেশা করতেন। আশৈশব এই সহজাত বৈরাগ্যপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ বালক তাই কলকাতায় কামারপুকুরে এসে দাদার টোলে পড়াশুনো করতে চাইলেন না। স্পষ্টই দাদাকে বললেন—"চালকলা বাঁধা বিদ্যা আমি শিখতে চাই না।"

দক্ষিণেশ্বরে কালীমন্দিরে আসার পর থেকেই রামকৃষ্ণদেবের অধ্যাত্ম-জীবনের পূর্ণ বিকাশ ঘটেছিল। এই মন্দিরে মাতৃপূজার মধ্য দিয়ে তিনি প্রথম চৈতন্যজ্যোতির সর্বব্যাপী বিস্তার অনুভব করেন। এই দর্শনের বিবরণ তিনি এইভাবে দিয়েছিলেন—"মার" দেখা পেলাম না বলে তখন হৃদয়ে অসহ্য যন্ত্রণা, জলশূন্য করবার জন্য লোকে যেমন

৫। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গ (সাধক ভাব) পৃঃ ৪৭-৫৮

জোরে গামছা নিঙড়িয়ে থাকে মনে হল হৃদয়টাকে ধরে কে যেন সেই রকম করছে। মার দেখা বোধ হয় কোন কালেই পাব না ভেবে যন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগলাম। অস্থির হয়ে ভাবলাম, তবে আর এ জীবনের দরকার নেই। মার ঘরে যে অসি ছিল হঠাৎ তার উপর চোখ পড়ল। এই দণ্ডেই জীবন শেষ করব ভেবে পাগলের মত তলোয়ারটি ছুটে ধরতে যাব, এমন সময় সহসা মার অদ্ভুত দর্শন পেলাম ও সংজ্ঞাশূন্য হয়ে পড়লাম। • তারপর বাইরে যে কি হয়েছে কোন দিক দিয়ে সেদিন ও তার পরদিন যে গেছে তার কিছুই জানতে পারি নি। অন্তরে কিন্তু একটা জমাট বাঁধা আনন্দের স্রোত বয়ে যাচ্ছিল - এবং মার সাক্ষাৎ প্রকাশ উপলব্ধি করেছিলাম।[৬]

এরপর মাতৃভাবের সাধক রামকৃষ্ণের কাছে জগন্মাতা মানবী মায়ের মতো ধরাছোঁয়াব মধ্য দিয়ে বাস্তব প্রত্যক্ষ হয়ে উঠলেন। কিন্তু তবু সাধনার শেষ হল না। হিন্দুধর্মের বিচিত্রভাবের বহুমুখী সাধনাগুলি তিনি একে একে গ্রহণ করলেন। দাস্যভাব সাধনাকালে তিনি সীতার দর্শনলাভ করলেন, ভৈরবী ব্রাহ্মণীকে গুরুপদে বরণ করে তন্ত্রোক্ত সাধনপথে সিদ্ধিলাভ করলেন।

তারপর বাৎসল্য ও মধুর ভাবের বৈষ্ণব সাধনায় মহাভাবে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন; অদ্বৈতবেদান্তী তোতাপুরীর সহায়তায় নির্বিকল্পসমাধি পর্যন্ত হিন্দুসাধনার সর্বোচ্চস্তরে তাঁর প্রতিষ্ঠা ঘটল স্ফূফীসাধক গোবিন্দের “আল্লা” মন্ত্রজপে ইসলামধর্মে সিদ্ধিলাভ হল; অবশেষে সমস্ত জগতে ও জীবে ব্রহ্মোপলব্ধি করে নিখিলজগতের সঙ্গে পরম ঐক্যবোধের পূর্ণতা তিনি লাভ করলেন। এই সাধনসময়ের মধ্যেই কালীদর্শনের কিছুকাল পরে তাঁর বিয়ে হয়। সেই বিয়ের সময় বালিকাবধূ সারদা রামকৃষ্ণের সাধনপর্বের শেষ অধ্যায়ে যুবতী

৬। দ্রষ্টব্য: শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গ (সাধক ভাব)

সারদায় পরিণত হয়ে দক্ষিণেশ্বরে আসেন পাগল স্বামীর সেবার জন্য। রামকৃষ্ণ তোতাপুরীর কাছে বেদান্ত সাধনার সময় সন্ন্যাস নিয়েছিলেন। কিন্তু এই অপূর্ব সন্ন্যাসী স্ত্রীকে ত্যাগ করলেন না। যথার্থ ব্রহ্মজ্ঞের মতো স্ত্রী পুরুষ ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে সারদাকে তিনি নিজের সাধনা ও তপস্যার সমানাধিকার দিলেন। তারপর একদিন ফলহারিণী কালীপূজার রাত্রে সারদার মধ্যে জগন্মাতার আবির্ভাব উপলব্ধি করে তাঁকে "ষোড়শী" রূপে পূজা করলেন এবং এতকাল যে সব বৈধী ভক্তির বাহ্য আচরণ বজায় রেখেছিলেন সব সেই দেবীর চরণে অর্পণ করে জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ লোককল্যাণের জন্য দেহধারণ করে রইলেন। এই ঘটনার কিছুকাল পরেই ম্যাডোনার কোলে যীশুর দেবমানবমূর্তির দর্শন ও আলিঙ্গনের মধ্য দিয়ে তিনি সগুণ ব্রহ্মের উপলব্ধিতে ডুবে যান।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এই সাধন পর্বের সঙ্গে সঙ্গে নবযুগের অধ্যাত্ম ইতিহাসও নূতনভাবে গড়ে উঠল। সেকালের ইয়ং-বেঙ্গল বা নব্য শিক্ষিতসমাজ প্রাচীন ও আধুনিক চিন্তাধারার মধ্যে দুস্তর ব্যবধান দেখতে পেয়ে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ বা ধর্ম সম্বন্ধে উপেক্ষার মনোভাব এ দুই-ই ঐ দ্বিধার পরিণাম। সমসাময়িক কালের ধর্মভাব সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত 'বঙ্গে ধর্মভাব' প্রবন্ধটি স্মরণীয়। 'কৃতবিদ্য সম্প্রদায়ের মধ্যে অধিকাংশই হয় কঠোর নাস্তিক, নয় কঠোরতর উদাসীন। কিন্তু একটা আশ্চর্য এই যে, যাহাদের দোহাই দিয়া ইঁহারা নাস্তিক, তাঁহারা কেহই ঠিক নাস্তিক নহেন।'[৭] মিল, ডারুইন, স্পেন্সার, কোমত প্রভাবিত শিক্ষিত সমাজে এই মনীষীদের ভগবৎ বিশ্বাস ততটা কার্যকরী হয় নি। প্রবন্ধপ্রান্তে এই মন্তব্য করা হয়েছে, "আমরা যে বিচার করিলাম, তাহাতে বুঝা গেল যে ধর্মভাবের আবশ্যকতা আছে। সমাজের হিতের জন্য, মানবের মঙ্গলের জন্য, ধর্মভাবের আবশ্যকতা আছে। পাপ হইতে

বিরত থাকিতে, সৎপথে উৎসাহিত করিতে, উচ্চতর প্রবৃত্তি সকলের উন্নতি সাধনে, পশুভাবের সংযমনে, ধর্মভাবের আবশ্যকতা আছে"।[৮] অপরপক্ষে, যাঁরা ধর্মভাবে বিশ্বাস করতেন তাঁদের মধ্যেও মতামতের বা সাধনপন্থার বিতর্ক ছিল। বহুযুগ ধরে হিন্দুধর্মের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধ তো ছিলই, সেই সঙ্গে হিন্দুধর্মের নব্যরূপ ব্রাহ্মধর্মের সঙ্গে সনাতনী হিন্দুদের মতবিরোধও তীব্র আকার ধারণ করেছিল। ব্রাহ্ম এবং খ্রীষ্টানেরা হিন্দুধর্মের সাকার উপাসনাকে হীন দৃষ্টিতে দেখতেন এবং সমাজের যাবতীয় গলদের জন্য হিন্দুর অধ্যাত্ম-আদর্শকে দায়ী করতেন। এই অবস্থায় শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্যব্যক্তিত্ব আবির্ভূত হয়ে হিন্দুধর্মের পক্ষ থেকে ধর্মের যথার্থ আদর্শটি স্থাপন করে অসার মতামতের দলাদলি নিরসন করলেন। পাশ্চাত্য ভাববন্যায় আমাদের জাতীয় ধর্মাদর্শ পর্যন্ত হীন বলে প্রমাণিত হতে চলেছিল; শ্রীরামকৃষ্ণ সেই হীনতা থেকে উদ্ধার করে আমাদের জাতীয় মর্যাদাবোধে সুপ্রতিষ্ঠিত করলেন। রামমোহন বেদান্তচর্চা করেছিলেন ঠিক এই উদ্দেশ্যেই। কিন্তু রামকৃষ্ণ শুধু চর্চা করেন নি, উপলব্ধি করেছিলেন। রামমোহন বিভিন্ন ধর্মের চর্চার মধ্য দিয়ে যে উদার বিশ্বজনীন ধর্মের পরিকল্পনা করেছিলেন, তার মধ্যে হিন্দুধর্মের দ্বৈত ও বিশিষ্টাদ্বৈত চিন্তাধারার বিশাল অংশ অনুপস্থিত ছিল। বাস্তবিক ধর্মমতকে যুগোপযোগী অদল বদল করে নিয়ে তবে রামমোহন তাকে শ্রদ্ধা করতে পেরেছিলেন। কিন্তু রামকৃষ্ণ অন্তরের অনুভূতি দিয়ে সব ধর্মপন্থাকেই ঈশ্বরলাভের উপায় নির্দিষ্ট করে দিয়ে আমাদের ধর্মচিন্তাকে হীনতাবোধ থেকে রক্ষা করলেন এবং ধর্ম যে মতামতের বিষয় নয়, প্রত্যক্ষ উপলব্ধির বিষয়, এই সত্যটি পুনরুজ্জীবিত করলেন।

৭, ৮, বঙ্গদর্শন (৫ম খণ্ড—১২৮৪) পৃঃ ১৫৩

রামকৃষ্ণদেবের মুহুর্মুহু সমাধি ও পরক্ষণেই কীর্তনানন্দে বিভোর ভাব, সর্বক্ষণ মাতৃ-অনুগত বিড়ালছানার মতো ভবতারিণীর পদতলে সর্বস্ব সমর্পণের ব্যাকুলতা—এসব লক্ষণ অনেকে কেবল ভক্তিভাবের পরিচায়ক বলে মনে করেন। কিন্তু রামকৃষ্ণ-জীবনে অদ্বৈতজ্ঞান ও মহাভাব এ দুই-ই একত্রে এসে মিলেছিল। এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় নিবেদিতার স্মৃতিকথায় স্বামীজীর সাক্ষ্য—"...Sri Ramakrishna, while seeming to be all Bhakti was really, within, all Jnana ; [but he himself, (স্বামীজী নিজে) apparently all Jnana, was full of Bhakti.]" "শ্রীরামকৃষ্ণকে বাইরে থেকে কেবল ভক্তিময় মনে হলেও অন্তরে তিনি ছিলেন পূর্ণজ্ঞানী, আর বাইরে থেকে তাঁকে (স্বামীজীকে) কেবল জ্ঞানী মনে হলেও অন্তরে তিনি পরিপূর্ণ ভক্ত।"

বাংলাদেশের শাক্তসাধনার ইতিহাসে আমরা এ বৈশিষ্ট্য বহুকাল থেকে দেখে আসছি। বিশেষতঃ রামপ্রসাদ-কমলাকান্তের গানে জগজ্জননী অবশেষে 'নিরাকারা' ব্রহ্মস্বরূপিণী। বৈষ্ণবসাধনায় দ্বৈত থেকে বিশিষ্টাদ্বৈতভূমিতে প্রয়াণ; এবং শাক্তসাধনায় দ্বৈত থেকে অদ্বৈত ভূমিতে অধিষ্ঠান এ দুটি সাধনধারার বৈশিষ্ট্য। মূলতঃ শাক্তসাধক রামকৃষ্ণ তাঁর শক্তিপূজা থেকেই অদ্বৈত ভাবের প্রেরণা পেয়েছিলেন। পরবর্তীকালে তোতাপুরীর সাহায্যে এই অদ্বৈতভাবে তাঁর পূর্ণ অধিষ্ঠান ঘটে।

সাধনানুভূতির বিস্তার ও গভীরতায় শ্রীরামকৃষ্ণ সত্যই তুলনাহীন। দ্বৈত থেকে অদ্বৈতে, লীলা থেকে নিত্যে পরিব্যাপ্ত তাঁর উপলব্ধিজগতের পরিচয়স্বরূপ তাঁর দু-একটি কথা এখানে উদ্ধৃত করা চলে। 'বেদান্ত-বিচারে সংসার মায়াময় স্বপ্নের মত মিথ্যা। যিনি পরমাত্মা, তিনি সাক্ষিস্বরূপ।...আমি সবই লই। তুরীয় আবার জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি। আমি তিন অবস্থাই লই। ব্রহ্ম আবার মায়া, জীব, জগৎ

আমি সবই লই। সব না নিলে ওজনে কম পড়ে। যাঁরই নিত্য তাঁরই লীলা। তাই আমি নিত্য লীলা সবই লই। মায়া বলে জগৎ সংসার উড়িয়ে দিই না। তা হলে ওজনে যে কম পড়বে।'[৯]

'ওঁকারের ব্যাখ্যা তোমরা কেবল বল অকার উকার ম-কার। আমি উপমা দিই ঘণ্টার টং শব্দ। ট-অ-অ-ম-ম। লীলা থেকে নিত্যে লয়; স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ থেকে মহাকারণে লয়। জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি থেকে তুরীয়ে লয়। আবার ঘাজল, যেন মহাসমুদ্রে একটি গুরু জিনিষ পড়ল আর ঢেউ আরম্ভ হল। নিত্য থেকে লীলা আরম্ভ হল, মহাকারণ থেকে স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ শরীর দেখা দিল—সেই তুরীয় থেকেই জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি সব অবস্থা এসে পড়ল। আবার মহাসমুদ্রের ঢেউ মহাসমুদ্রেই লয় হল। নিত্য ধরে ধরে লীলা, আবার লীলা ধরে ধরে নিত্য। আমি টং শব্দ উপমা দিই। আমি ঠিক এই সব দেখেছি। আমায় দেখিয়ে দিয়েছে চিৎ সমুদ্র, অন্ত নাই। তাই থেকে এই সব লীলা উঠলো। আর ঐতেই লয় হয়ে গেল। চিদাকাশে কোটি ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি, আবার ঐতেই লয় হয়; তোমাদের বইয়ে কি আছে, অত আমি জানি না।'[১০]

এই সঙ্গে কালীর স্বরূপ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তাঁর উক্তি স্মরণীয়—'যিনি ব্রহ্ম, তিনিই কালী (মা আদ্যাশক্তি)। যখন নিষ্ক্রিয়, তাঁকে ব্রহ্ম বলে কই। যখন সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় এই সব কাজ করেন, তাঁকে শক্তি বলে কই। স্থির জল ব্রহ্মের উপমা। জল হেলচে, দুলচে, শক্তি বা কালীর উপমা। কালী কি না—যিনি মহাকালের (ব্রহ্মের সহিত) রমণ করেন। কালী 'সাকার আকার নিরাকার'।...যিনি ব্রহ্ম, তিনিই শক্তি তিনিই মা।'[১১]

অদ্বৈতভাবভূমিতে অধিষ্ঠানকালে রামকৃষ্ণ কীভাবে সর্বত্র ব্রহ্মোপলব্ধি

৯, ১০, ১১, কথামৃত (১ম)

করতেন তার বহু নিদর্শন তাঁর জীবনীতে পাওয়া যায়। গঙ্গার বুকে মাঝিরা ঝগড়া করতে করতে একজন আর একজনের পিঠে চড় মেরেছে সেই চড়ের দাগ রামকৃষ্ণদেবের পিঠে ফুটে উঠল। নবীন দুর্বাদলের সৌন্দর্যে মুগ্ধহৃদয় রামকৃষ্ণদেবের সামনে দিয়ে একজন সেই দুর্বা মাড়িয়ে গেল—মনে হল কেউ যেন তাঁর বুকের উপর দিয়ে চলে গেল—যন্ত্রণায় সমস্ত বুক লাল হয়ে উঠল—এ সব ঘটনার মধ্য দিয়ে শাস্ত্রোক্ত ব্রহ্মবিহারের অপূর্ব উদাহরণ পাওয়া যায়।[১২]

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এই সাধনকালে একে একে বহু সাধক দক্ষিণেশ্বরে এসেছেন, আর তাঁদের সাধনার উত্তরাধিকার নিয়ে তিনি পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছেন। শুধু যে তিনিই পূর্ণ হয়েছেন তা নয়, এই অসাধারণ শিষ্যের কাছে এসে তাঁর গুরুরাও অধ্যাত্মজীবনে নতুন আলোর সন্ধান পেয়েছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ ভৈরবী ব্রাহ্মণী ও তোতাপুরীর কথা বলা যায়। বৈষ্ণবীয় সাধনায় সিদ্ধা ব্রাহ্মণী বেদান্তের নির্গুণ ব্রহ্মবাদকে শ্রদ্ধা করতে পারেন নি। তাই শিষ্য রামকৃষ্ণের অদ্বৈত সাধনায় তাঁর আপত্তি ছিল। এমন কি নিজের আধিপত্য খাটাতে গিয়ে রামকৃষ্ণের পারিবারিক জীবনেও তিনি অশান্তি এনেছিলেন। শেষ অবধি নিজের ভুল বুঝতে পেরে কাশী গিয়ে আবার সাধনায় নিযুক্ত হন। তোতাপুরী চল্লিশ বছরের সাধনায় ব্রহ্মোপলব্ধি করেছিলেন। সাকার উপাসনাকে তিনি অবজ্ঞার চোখে দেখতেন। রামকৃষ্ণ যখন সাধনবলে মাত্র তিন দিনে সেই ব্রহ্মোপলব্ধির জগতে পৌঁছালেন, তখনও তোতাপুরী ব্রহ্মের শক্তি বা লীলার প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হবার কোন কারণ দেখেন নি। তবু, শিষ্যের স্নেহবন্ধনে তিনি মাসের পর মাস দক্ষিণেশ্বরে কাটাতে লাগলেন। ঐ সময় কঠিন আমাশায় ভুগে তাঁর দেহে বিতৃষ্ণা আসে এবং ঐ বিতৃষ্ণা নিয়ে

১২। শ্রীরামকৃষ্ণ লীলা প্রসঙ্গ (১১শ সংস্করণ) পৃঃ ৩৩৮-৩৯

দেহত্যাগ করতে গিয়েই সহসা অন্তরে তিনি ব্রহ্মশক্তির অপার মহিমা উপলব্ধি করেন। নিরাকারবাদী তোতাপুরী সাকারা জগজ্জননীর পায়ে প্রণাম জানিয়ে রামকৃষ্ণের কাছে বিদায় নিলেন। এই দুটি মহান জীবনই শ্রীরামকৃষ্ণ-সংস্পর্শে এসে মহত্তর সত্যের সন্ধান লাভ করে।

কলকাতার লোকসমাজে পরিচিত হওয়ার আগে শ্রীরামকৃষ্ণকে যাঁরা চিনেছিলেন, তাঁদের মধ্যে বৈষ্ণবশাস্ত্রবিদ বৈষ্ণবচরণ, দাক্ষিণাত্যের পণ্ডিত নারায়ণ শাস্ত্রী, এবং ইঁদেশের গৌরী পণ্ডিত উল্লেখযোগ্য। এঁদের চোখে রামকৃষ্ণদেবের অসাধারণত্ব ধরা পড়েছিল। রাণী রাসমণি ও মথুরামোহনের রামকৃষ্ণভক্তি এই পণ্ডিতদের দ্বারা আরো দৃঢ় হয়। বাস্তবিক, মাত্র সাতটাকা মাইনের ভট্চায বামুনের মহিমা উপলব্ধি করে রাণী ও তাঁর জামাই যে ভাবে রামকৃষ্ণদেবের সাধনজীবনে তাঁকে সর্বতোভাবে সাহায্য করেছিলেন সে কথা মনে করলে এঁদের প্রতি শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে আসে।

এইভাবে প্রায় সকলের অলক্ষ্যে দক্ষিণেশ্বরে যখন সাধনার এই লীলাকমলটি ফুটে উঠল তখন সন্ধানী মধুকরের দৃষ্টির আড়ালে থাকা আর সম্ভব হল না। একদিকে এই শতদলের আহ্বান আকাশে আকাশে ধ্বনিত হতে লাগল। অন্যদিকে ভগবৎ-সন্ধানী মধুকরেরা দলে দলে তাঁর উদ্দেশ্যে ছুটে চলল। শ্রীরামকৃষ্ণ আগে থেকেই উপলব্ধি করেছিলেন যে, তাঁর কাছে বিবেক-বৈরাগ্যবান ভক্তেরা আসবেন। কিন্তু তাঁর সাধনার দিনগুলি শেষ হল, তবু তাঁদের দেখা নেই। দক্ষিণেশ্বর থেকে তিনি সন্ধ্যার অন্ধকারে তাদের উদ্দেশ্যে ডাকতেন, 'ওরে, তোরা কে কোথায় আছিস আয়।'

একে একে কেশবচন্দ্র, শিবনাথ শাস্ত্রী, গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত করতে লাগলেন। কলকাতা শহরের তৎকালীন দিকপালদের কারু কারু সঙ্গে নিজে থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ

দেখা করেছিলেন—দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্র। দেবেন্দ্রনাথের অধ্যাত্মভাব ও বিদ্যাসাগরের দয়াধর্ম এ দুইই তাঁর দ্বারা প্রশংসিত হয়েছিল। তবে সবচেয়ে তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন কেশবচন্দ্রের ভক্তিতন্ময়তায়। শিবনাথ শাস্ত্রী সম্বন্ধেও তাঁর উচ্চ ধারণা লক্ষণীয়। কেশবানুচর ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল (চিরঞ্জীব শর্মা) বিরচিত মাতৃভাবের গানগুলি তাঁকে বিশেষভাবে মুগ্ধ করতো। ত্রৈলোক্যনাথের 'নিবিড় আঁধারে মা তোর চমকে ও রূপ-রাশি', 'গভীর সমাধিসিন্ধু অনন্ত অপার' ; 'চিদাকাশে হল পূর্ণ প্রেম-চন্দ্রোদয়' 'চিদানন্দ-সিন্ধু-নীরে প্রেমানন্দের লহরী', 'আমায় দে মা পাগল করে'— প্রভৃতি গান শ্রীরামকৃষ্ণের মাতৃভাব, ভক্তি-উচ্ছ্বাস ও সমাধিতন্ময়তার দ্বারা অনুপ্রাণিত। তবে, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীই বোধকরি রামকৃষ্ণদেবের প্রভাবে সবচেয়ে পরিবর্তিত হয়েছিলেন। ক্রমে সাকার-সাধনায় সত্যের সন্ধান পেয়ে বিজয়কৃষ্ণ ব্রাহ্মসমাজ ত্যাগ করে বৈষ্ণবসাধনায় ডুবে যান।

এইভাবে ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গতা গড়ে উঠতে থাকে। বিশেষভাবে ভারতবর্ষীয় ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নেতারা শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হন। এঁদের মধ্যে সর্বাগ্রে স্মরণীয় কেশবচন্দ্র। আদি ব্রাহ্মসমাজের "জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি"র আদর্শের চেয়ে কেশবচন্দ্রের মন তখন "জ্ঞানশূন্যা ভক্তি"র জন্য উন্মুখ। সেই শুভক্ষণে একদিন[১৩] কেশবচন্দ্রের বেলঘরিয়ার উদ্যানে শ্রীরামকৃষ্ণ এলেন কেশবচন্দ্রের হরিপ্রসঙ্গ শুনবার জন্য।

"যখন কেশব সেনকে বাগানে প্রথম দেখলুম, বলেছিলাম—'এরই ল্যাজ খসেছে।' সভাশুদ্ধ লোক হেসে উঠল। কেশব বললে, তোমরা হেসো না, এর কিছু মানে আছে, এঁকে জিজ্ঞাসা করি।'

১৩। ১৫ই মার্চ, ১৮৭৫, দ্রষ্টব্য আচার্য কেশবচন্দ্র : গৌরগোবিন্দ উপাধ্যায়।

আমি বললাম, যতদিন ব্যাঙাচির ল্যাজ না খসে ততদিন কেবল জলে থাকতে হয়, আড়ায় উঠে ডাঙ্গায় বেড়াতে পারে না; যেই ল্যাজ খসে, অমনি লাফ দিয়ে ডাঙ্গায় পড়ে। তখন জলেও থাকে, আবার ডাঙ্গায়ও থাকে। তেমনি মানুষের যতদিন অবিদ্যার ল্যাজ না খসে, ততদিন সংসারজলে পড়ে থাকে। অবিদ্যার ল্যাজ খসলে—জ্ঞান হলে, তবে মুক্ত হয়ে বেড়াতে পারে, আবার ইচ্ছে হলে সংসারে থাকতে পারে।"[১৪]

শ্রীরামকৃষ্ণ-সাক্ষাৎকারের পর কেশবের ভক্তিতন্ময়তা গাঢ়তর হয়। "Indian mirror" ও "সুলভসমাচারে"র মাধ্যমে কেশবচন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী প্রচার করতে থাকেন। ব্রাহ্মসমাজের তরুণবৃন্দ কেশবের প্রচেষ্টার ফলেই রামকৃষ্ণের প্রতি আকৃষ্ট হন। কিন্তু এই প্রচারকার্যের প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণের মনোভাব—(কেশবের প্রতি) "আমার নাম কাগজে প্রকাশ কর কেন? বই লিখে, খবরের-কাগজে লিখে, কারুকে বড় করা যায় না। ভগবান যাকে বড় করেন, বনে থাকলেও তাকে সকলে জানতে পারে। গভীর বনে ফুল ফুটেছে, মৌমাছি কিন্তু সন্ধান করে যায়। অন্য মাছি সন্ধান পায় না। মানুষ কি করবে? মানুষের মু চেয়ো না—লোক পোক! যে মুখে ভাল বলছে, সেই মুখে আবার মন্দ বলবে। আমি মান্যগণ্য হতে চাই না। যেন দীনের দীন—হীনের হীন হয়ে থাকি।"[১৫]

কেশবচন্দ্রের "জীবনবেদে"র ভক্তিসঞ্চার অধ্যায়ে শ্রীরামকৃষ্ণ-সান্নিধ্যের স্পষ্ট আভাস মেলে। উদাহরণস্বরূপ—"হে ঈশ্বর, রক্ষা কর, রক্ষা কর; হে ভগবান্ বাঁচাও' এই বলিয়া বলিয়া দিন যাইতেছে; শীঘ্র

১৪। কথামৃত (১ম): ২৮শে অক্টোবর, ১৮৮৪

১৫। কথামৃত (৫ম): পরিশিষ্ট।

ভক্তির পথ আন, এ কথা তো কেহই বলিলেন না। কেবল একজন বলিলেন, যাঁর বলিবার তিনি বলিলেন। সাহারার মধ্যে কমল ফুটিল। পাথরের উপর প্রেমফুল প্রস্ফুটিত হইল।…কে কে আমার আনন্দময়ী মাকে দেখিয়াছেন? যিনি দেখিয়াছেন তাঁকে আমার সখা বলি, আলিঙ্গন করি; তিনি আমার বন্ধু হন; তিনি সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।”[১৬]

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবৎকালেই ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল (চিরঞ্জীব শর্মা) তাঁর “কেশবচরিতে” লিখেছিলেন—“উভয়ের[১৭] যোগে ধর্মজগৎ অনেক বিষয়ে উপকৃত হইয়াছে, হিন্দুধর্মের শাখা-প্রশাখার মধ্যে যে সকল আধ্যাত্মিক মধুর ভাব আছে তাহা বিধানবিশ্বাসীদিগের দ্বারা ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। যে ধর্ম এক সময় নিতান্ত কঠোর নীরস ছিল, এইরূপে তাহা সরস এবং অত্যন্ত সরল হইল। কোথায় বৈদান্তিক জ্ঞানবিচার, আর কোথায় মাতার সহিত শিশুর কথোপকথন। আরাধনা প্রার্থনায় গ্রাম্য কথার চলন এই সময় হইতে আরম্ভ হইয়াছে।”

ব্রাহ্মসমাজের উপর হিন্দুসমাজের সর্বগ্রাসী প্রভাবের এইভাবেই সূচনা।

“সুলভসমাচার”-পত্রিকায় শ্রীরামকৃষ্ণপ্রসঙ্গের একটু উদাহরণ—“আমরা এই মহাত্মাকে যতবার দেখিতেছি,—ততবার তাঁহার উচ্চজীবন ও ভাব দেখিয়া অবাক হইতেছি, তিনি একজন প্রকৃত সিদ্ধপুরুষ, তাঁহার মতন লোক আর এদেশে আছে কিনা সন্দেহ। যোগবলে তাঁহার মন সর্বদাই ভগবানেতেই সংযুক্ত থাকে, আমরা যেমন ঘর, বাড়ি, ধন, মানের কথা কহি ও সর্বদাই সেই সমস্ত চিন্তা

১৬। জীবনবেদ (৭ম সংস্করণ): পৃ: ৬২—৬৩

১৭। রামকৃষ্ণ ও কেশবচন্দ্র

করি, তিনি পরমেশ্বরকে লইয়া সেইরূপ করেন।...কখন কখন দেখিতেন, ব্রহ্মরূপ সমুদ্র আসিয়া তাঁহাকে ডুবাইল, তিনি মনে করিতেন যেন সচ্চিদানন্দরূপ জলে ডুবিয়া রহিয়াছেন, যখন এই ভাবে থাকিতেন, তাঁহার আহারাদি বাহ্যক্রিয়া দূরে যাইত, একটু এই ভাব কমিলে তিনি আপন পরিবারকে বলিতেন, এই বেলা আমাকে আহার দেও, সে ভাব এখন আমার কমিয়াছে। কিন্তু বলিতে বলিতে বানের জলে পড়িলে নিরাশ্রয় মনুষ্যের অবস্থা যেরূপ হয় তাঁহারও অবস্থা সেইরূপ হইত। অমনি ব্রহ্মরূপ সমুদ্রে যেন বান ডাকিত এবং তাঁহার নিরাশ্রয় আত্মাকে ভাসাইয়া লইয়া যাইত। তিনি আবার বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িয়া থাকিতেন।"[১৮]

"দক্ষিণেশ্বরের পরমহংসকে কলিকাতার ভদ্রলোকেরা ক্রমেই চিনিতেছেন।...উক্ত মহাত্মাদ্বারা কলিকাতার হিন্দুসমাজে ধর্মভাব জাগ্রত হইতেছে।"[১৯]

শুধু হিন্দুসমাজে নয়, কলিকাতার শিক্ষিত সর্বসাধারণের মধ্যে এই "অ-শিক্ষিত" ব্রাহ্মণের বাণী ও চরিত্রমহিমা যে কী গভীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল, তার প্রমাণ আছে ব্রাহ্মনেতা প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের শ্রদ্ধাঞ্জলিতে—শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সমসাময়িক কালেই যা Theistic Quarterly Review পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল—

"My mind is still floating in the luminous atmosphere which that wonderful man diffuses around him whenever and wherever he goes...What is there common

১৮। সুলভ সমাচার, শনিবার, ১৬ই শ্রাবণ, ১২৮৮; ৩০ জুলাই, ১৮৮১ [শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস: সমসাময়িক দৃষ্টিতে—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস]

১৯। তদেব: ৩ পৌষ, ১২৮৮, শনিবার [তদেব]।

between him and me? I, a Europeanised, civilised self-centred, semi-sceptical so-called educated reasoner, and he, a poor, illiterate, shrunken, unpolished, diseased, half-dressed, half-idolatrous, friendless Hindu devotee? Why should I sit long hours to attend him, I who have listened to Disraeli and Fowcett, Stanley and Max Muller, and a whole host of European Scholars and divines? I who am an ardent disciple and follower of Christ, a friend and admirer of liberal-minded Christian Missionaries and preachers, a devoted adherent and worker of the rationalistic Brahma-Samaj—why should I be spellbound to hear him? And it is not I only, but dozens like me who do the same....

A living evidence of the sweetness and depth of Hindu religion is this holy and good man. He has wholly controlled and nearly killed his flesh. He is full of soul, full of reality of religion, full of joy, full of blessed purity. As a Siddha Hindu ascetic he is a witness of the falsehood and emptiness of the world. He has no other thought, no other occupation, no other relation, no other friend in his humble life than his God. That God is more than sufiicient for him. His spotless holiness, his deep unspeakable blessedness, his unstudied endless wisdom, his childlike peacefulness, and affection towards all men, his con-

suming, all-absorbing love for his God are his only reward."*

* সেই আশ্চর্য মহাপুরুষটি যখনই যেখানে যান, এক অপূর্ব দিব্য পরিবেশের সৃষ্টি হয়। সেই জ্যোতির্ময় দিব্য পরিবেশের স্মৃতি এখনও আমার অন্তর ভরে রয়েছে। আমি একজন য়ুরোপীয় ভাবে ভরপুর, সুসভ্য, আত্মকেন্দ্রিক অর্ধসংশয়ী তথাকথিত শিক্ষিত ও যুক্তিবাদী ; আর তিনি—দরিদ্র, অ-শিক্ষিত, শীর্ণদেহ, অসংস্কৃত, ব্যাধিগ্রস্ত, অর্ধ-উলঙ্গ, অর্ধ পৌত্তলিক, নির্বান্ধব এক হিন্দু ভক্ত—তাঁর সঙ্গে আমার মিল কোনখানে? ডিসরেলী, ফসেট (Fowcett), স্ট্যানলি, ম্যাক্সমূলার প্রমুখ পণ্ডিত ও মহাজ্ঞানীদের বক্তৃতা আমি শুনেছি, আমি কি জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাঁর কথা শুনবার জন্যে বসে থাকব? আমি যীশুর অনুগত বিশ্বস্ত ভক্ত, উদারহৃদয় খ্রীষ্টান মিশনরী ও প্রচারকদের বন্ধু ও গুণগ্রাহী, যুক্তিবাদী ব্রাহ্মসমাজের কর্মী ও অনুগামী—আমি কেন তাঁর কথা মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনতে যাব? শুধু আমি নই, আমার মতো আরো বেশ কিছু লোক এইরকম করে থাকে…

এই সৎ ও পুণ্যাত্মা মহাপুরুষ হিন্দুধর্মের মাধুর্য ও গভীরতার জীবন্ত প্রতিমূর্তি। ইন্দ্রিয়চেতনাকে ইনি সম্পূর্ণ দমন করে প্রায় নিশ্চিহ্ন করে ফেলেছেন। তাঁর সবটাই পরম পবিত্রতায়, পরম আনন্দে, আত্মিক সত্যে ও ধর্মচেতনার প্রত্যক্ষ উপলব্ধিতে পরিপূর্ণ। সিদ্ধ হিন্দু সন্ন্যাসীরূপে তিনি জগতের অন্তঃসারশূন্যতা ও মিথ্যা স্বরূপের সাক্ষী। ভগবান ছাড়া তাঁর নিষ্কিঞ্চন জীবনে আর অন্য কোন চিন্তা, চেষ্টা, সম্বন্ধ বা বান্ধব নেই। ভগবানই তাঁর পক্ষে একান্ত এবং একমাত্র প্রয়োজনীয়। নিষ্কলুষ পবিত্রতা, বাক্যের অগোচর গভীর আনন্দময় উপলব্ধি, শৈশবোচিত প্রশান্তি, সর্বমানবের প্রতি প্রসারিত প্রীতি এবং ঈশ্বরে সর্বময় ভালোবাসাই তাঁর জীবনের একমাত্র সার্থকতা।

নাট্যকার গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে রামকৃষ্ণদেবের পরিচয় ও গিরিশচন্দ্রের "পাঁচ সিকে পাঁচ আনা" ভক্তির কথা রামকৃষ্ণ-কাহিনীর সুপরিচিত বিষয়বস্তু। গিরিশচন্দ্র সে যুগের ইংরেজী-শিক্ষিত সমাজের

প্রতিনিধি হলেও যাত্রা-পালা রচনার ঐতিহ্যে তাঁর শিল্পদৃষ্টি গড়ে ওঠার দরুণ জনমানসের অন্তর্লীন ভক্তিধারার সঙ্গে তিনি সুপরিচিত ছিলেন। তাই রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে গণচিত্তের সংযোগ সাধনকল্পে তিনি পৌরাণিক বিষয়বস্তু নিয়ে রচনা শুরু করেন। "চৈতন্যলীলা" অভিনয় উপলক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণ রঙ্গমঞ্চে অভিনয় দেখতে আসেন (২১ শে সেপ্টেম্বর, ১৮৮৪)। সে যুগের জনসমাজ এই চৈতন্যলীলার অভিনয়ে নূতন করে ভক্তিভাবে উদ্দীপ্ত হয়েছিলেন। সেই দর্শকবৃন্দের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণের মতো ভাবকল্পনাময় দর্শকও এলেন এবং অভিনয় দেখে বললেন, "আসল নকল এক দেখলুম।" গিরিশ-রামকৃষ্ণ শুভ-সংযোগের ফলে গিরিশচন্দ্রের নাটকে রামকৃষ্ণের বাণী ও আদর্শের প্রভাব দেখা দিতে লাগল।

'গিরিশচন্দ্রের বিল্বমঙ্গল, নসীরাম, পূর্ণচন্দ্র, কালাপাহাড়, জনা প্রভৃতি নাটকে শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রভাবপুষ্ট চরিত্রের নিদর্শন মেলে। 'কালাপাহাড়' নাটকের একটু অংশ এই প্রভাবের উদাহরণ স্বরূপ উদ্ধৃতিযোগ্য—

কালাপাহাড়। মহাশয়, ঈশ্বর আছেন?

চিন্তামণি। খুব আছে, সত্যি আছে, তিন সত্যি আছে। আর কিছু আছে কি-না জানি না।

কালাপাহাড়। কোথায় ঈশ্বর?

চিন্তামণি। (সম্মুখে একটি তেঁতুল গাছ দেখাইয়া) ঐ তেঁতুলগাছে।

কালাপাহাড়। এ পাগল নাকি?

চিন্তামণি। কেন, পছন্দ হল না? আচ্ছা ভাল করে বলছি, তোমার কাছে, অন্তরে অন্তরে সর্বত্র। এই যে, ঐ যে! হৃদয়েশ্বর এই যে আমার হৃদয়ে!

কালাপাহাড়। কই কোথায় ঈশ্বর?

চিন্তামণি। ওঃ,-তাই তুমি বেজার হয়েছ না? তুমি ডেকেছ আর

কেন ধেয়ে আসে নি, শোন, আমার কথা বিশ্বাস কর তুমি যেমনি ডেকেছ, অমনি এসেছে, তুমি চিনতে পার নি।

কালাপাহাড়। তুমি দেখেছ, তুমি চিনেছ ?

চিন্তামণি। হ্যাঁ, গুরু দেখিয়ে দিয়েছে, আর চিনি নি ?

কালাপাহাড়। গুরু কে ?

চিন্তামণি। গুরু লাখ লাখই আছে, চেলা মেলাই মুস্কিল !

কালাপাহাড়। আচ্ছা বলতে পারো শাস্ত্র কি সত্য ?

চিন্তামণি। সব সত্য, সব সত্য, সব সত্য গুরুর কৃপায়, সব বোঝা যায়।

কালাপাহাড়। মহাশয়, গুরু কেমন তিনি ?

চিন্তামণি। ঘটক হে, ঘটক, জুটিয়ে দেয়।

কালাপাহাড়। কি বুঝব ? সবই অন্ধকার !

চিন্তামণি। তা তো সত্য, গুরু না আলো জ্বেলে দিলে কি করে দেখবে ?

ক্ষুদ্র নর ক্ষুদ্র জ্ঞানে বুঝিবে কেমনে
উপদেশ বিনে, তত্ত্ব কিবা, স্বর্গ মর্ত্য
রসাতলে বুদ্ধিবলে নির্ণয় না হয়,
সংশয়, সংশয়, মন পরাজয় ক্লান্ত
অশান্ত কল্পনা, ভ্রমে ব্যাকুল বাসনা,
ক্ষিপ্তপ্রায় মত্তচিত্ত ধায়, নিরুপায়
দৃষ্টি নাহি চলে মোহ-ঘোর আবরণে।
গুরু পদ সার, অন্য নাহি আর ; তারে
ত্বস্তর পাথারে নরে গুরু বিনা কেবা ?
কর গুরু পদাশ্রয়, নিশ্চয় সংশয়
যাবে দূরে ; ভবপারে গুরু কর্ণধার
ঈশ্বর বিরাজমান নর-কলেবরে।

কালাপহাড়। হায়, অন্ধবিশ্বাস, আশ্রয়, যুক্তিশূন্য
অনুমান! যাহে বিশ্বব্যাপী কহে নর-
কলেবরে বিরাজিত জানিব কেমনে?
গুরু, গুরু, কেবা গুরু, কোথায়? কোথায়?
কি প্রত্যয় কথায় তাঁহার?…

চিন্তামণি। ক্ষুদ্র নর তোমা সম গুরু! গুরু কল্প-
তরু ভবে, ভীরু জনে অভয় প্রদানে
আবির্ভাব, ধরাধামে, দীন নর-সাজে
সমাজে বিরাজে,…

এই বিশ্বাস-সংশয়ের আলো-অন্ধকারের পটভূমিতে গিরিশচন্দ্র সরল, নিরভিমান, রিক্ত দীন অথচ চতুর পরিহাসনিপুণ মানবের বেশে প্রচ্ছন্ন ভস্মাগ্নির মতো কয়েকটি দিব্যচরিত্র তাঁর নাটকে উপস্থিত করেছেন। সমাজ-সংসারের সমস্ত হীনতা ও ক্লেদের ঊর্ধ্বে, এমনি সব মহামানবেরা লোকলোচনের অন্তরালে থেকেই জগৎ ও জীবনের কল্যাণ সাধন করেন, হয়তো এই তাঁর বক্তব্য ছিল। তার ফলে তদানীন্তন বাংলা রঙ্গমঞ্চের দ্বারা সাধারণ মানুষের ধর্মশিক্ষার অনেকখানি সহায়তা হয়েছিল সন্দেহ নেই।

আধুনিক সমালোচকদের মতে গিরিশচন্দ্রের নাটকে শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রভাবের ফলে নাট্যগুণ ব্যাহত হয়েছে। কিন্তু মনে রাখতে হবে গিরিশচন্দ্রের নাটকের প্রাণ যাত্রা। পাশ্চাত্য মানদণ্ডের শ্রেষ্ঠ নাটকের সঙ্গে যাত্রাপ্রধান নাটকের তুলনা করা চলে না। তত্ত্বচিন্তার সঙ্গে উচ্চাঙ্গের নাট্যকৌশল যুক্ত করার মতো প্রতিভাও গিরিশচন্দ্রের ছিল না। কিন্তু সেজন্য শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রভাবকে ব্যর্থতার কারণ বলা চলে না। বরং এক হিসাবে যাত্রাপ্রধান নাটকের মূলে যে গভীর ভাবাবেগ থাকা প্রয়োজন, গিরিশচন্দ্রের নাটকের সেই প্রাণবস্তু শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাবেই পূর্ণতা লাভ করেছে।

ব্রাহ্মসমাজের ভারতবর্ষীয় এবং সাধারণ দলের সঙ্গে নরেন্দ্রনাথ দত্তের ঘনিষ্ঠতা বেশী ছিল। কলকাতার শিমুলিয়া পাড়ার বিখ্যাত এটর্নী বিশ্বনাথ দত্তের ছেলে নরেন্দ্রনাথ সে যুগের যুক্তিপন্থী যুবসমাজেরই অন্যতম। শ্রীরামকৃষ্ণ-সান্নিধ্যে এসেই নরেন্দ্রনাথ বিবেকানন্দে পরিণত হন।

স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর অজস্র বক্তৃতা ও রচনাবলীতে গুরুর নাম খুব বেশী করেন নি। তবু, তাঁর সমগ্র চিন্তাধারা যে গুরুর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত একথা বলাই বাহুল্য। স্বামীজীর বাংলা রচনায় কথ্য-ভাষার অনুপম ভঙ্গী তাঁর গুরুদেবের কথ্যভাষার আদর্শে গড়ে উঠেছে। একটু তুলনামূলকভাবে বলা যায়, শ্রীরামকৃষ্ণের গদ্য উপমাপ্রধান, ভাবতন্ময়; আর বিবেকানন্দের ভাষা ঋজু বলিষ্ঠতায় স্পন্দিত। এই পার্থক্য সত্ত্বেও একথা স্মরণীয় যে রামকৃষ্ণদেবের ভাষা থেকেই বিবেকানন্দ কথ্যভাষায় মহত্তম বিষয়বস্তু আলোচনার প্রেরণা পেয়ে উনিশ শতকের বাংলা গদ্যে এক অভিনব আদর্শ স্থাপন করে গেছেন।

স্বামীজীর "বর্তমান ভারত" পুস্তিকায় তিনি ভারতীয় সভ্যতার যে বিশ্লেষণ করেছেন তার মানদণ্ড নির্ধারিত হয়েছে শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগ, বৈরাগ্য ও সাধনার দ্বারা। তাঁর "ভাববার কথা" বইয়ের "হিন্দুধর্ম ও শ্রীরামকৃষ্ণ" প্রবন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণআবির্ভাবের-তাৎপর্য ঘোষণা করে এ যুগের মানবজাতিকে ঐ আদর্শে উদ্বুদ্ধ হতে আহ্বান করেছেন।

স্বামীজীর লেখা বাংলা ও ইংরেজী কবিতার মধ্যে "সখার প্রতি", "গাই গীত শোনাতে তোমায়", "Kali the mother" "নাচুক তাহাতে শ্যামা" এবং দুটি গান—"একরূপ-অরূপ-নাম-বরণ" ও "নাহি সূর্য নাহি জ্যোতি"—এই সব রচনায় শ্রীরামকৃষ্ণপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ বিবেকানন্দের জীবনদর্শনের গভীর পরিচয় নিহিত।

ইংরেজী বক্তৃতা "My Master"-এ শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে বিবেকানন্দ তাঁর ব্যক্তিগত অনুভূতির আভাস দিয়েছেন। এক্ষেত্রে সেই বক্তৃতার অংশবিশেষ উদ্ধৃতিযোগ্য—This man came to live near Calcutta, the capital of India, the most important University town in our country, which was sending out sceptics and materialists by the hundreds every year, yet many of these university men, sceptics and agnostics, used to come and listen to him. He looked just like an ordinary man, with nothing remarkable about him. He used the most simple language, and I thought "can this man be a great teacher ?" Crept near to him and asked him the question which I had been asking others all my life. "Do you believe in God, Sir ? "Yes". "How ?" "Because I see him just as I see you here, only in much intenser sense." That impressed me at once. For the first time I found a man who dared to say he saw God, that religion was a reality, to be felt, to be sensed in an infinitely more sensible way than we can sense the world. I began to go to that man, day after day, and I actully saw that religion could be given. One touch, one glance can change a whole life. I have read about Buddha and Christ and Mahomed, about all those different luminaries of ancient times, how they would stand up and say, "Be thou whole" and the man became whole. I found it to be true, and when I

myself saw this man all scepticism was brushed aside....[২০]

In the presence of my master I found out that man could be perfect, even in this body. Those lips never cursed anyone, never even criticised anyone. Those eyes were beyond the possibilty of seeing evil, that mind had lost the power of thinking evil. He saw nothing but good. That tremendous purity that tremendous renunciation is the one secret of spirituality." [২১]

২০। Complete works of Swami Vivekananda, Vol. IV. Sixth Edn. P. 175.

২১। তদেব P. 179

* অনুবাদ ;—তিনি ভারতের রাজধানী (তখন কলকাতাই ভারতের রাজধানী)—আমাদের দেশে শিক্ষার প্রধান কেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় নগরী—যেখান থেকে প্রত্যেক বছর শত শত জড়বাদী ও সন্দেহবাদীর সৃষ্টি হচ্ছিল, সেই কলকাতার কাছে এসে বাস করতে লাগলেন। কিন্তু এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী এবং অনেক নাস্তিক্যবাদী ও সন্দেহবাদীরা তাঁর কাছে যাতায়াত করতেন, তাঁর কথা শুনতেন।... তাঁকে দেখতে একজন সাধারণ লোকের মতো মনে হ'ল। এমন কিছু অসাধারণত্ব দেখলাম না। অত্যন্ত সরল ভাষায় তিনি কথা বলছিলেন। শুনে আমি ভাবলাম, "ইনি কি একজন মহান ধর্মাচার্য হতে পারেন ?" সারা জীবন অন্যদের যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে এসেছি তাঁর কাছে গিয়ে তাঁকেও সেই প্রশ্ন করলাম, "আপনি কি ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন ?" তিনি বললেন, "হ্যাঁ"। "আপনি কি তাঁর অস্তিত্বের প্রমাণ দিতে পারেন ?" "হ্যাঁ"। "কি প্রমাণ ?" "তোমাকে যেমন সামনে দেখছি তার চেয়ে স্পষ্ট, তার চেয়ে তাঁকে উজ্জলরূপে দেখতে পাই।" কথাটি তৎক্ষণাৎ আমার অন্তরে

দাগ কাটলো। এই প্রথম আমি এমন একজনকে দেখলাম যিনি সাহস করে বলতে পারেন, "আমি ভগবানকে দেখেছি, ধর্ম সত্য, বাস্তবে তা অনুভব করা যায়, এই পৃথিবী আমরা যেমন স্পষ্ট দেখতে পাই, তার চেয়ে অনেক স্পষ্টতরভাবে ভগবানকে প্রত্যক্ষ করা যায়। আমি দিনের পর দিন এই মহাপুরুষের কাছে যেতে লাগলাম। ধর্ম যে প্রত্যক্ষ অনুভব করানো যায়, তা আমি নিজেই দেখতে পেলাম। একটি মাত্র স্পর্শে, একবার চেয়ে দেখায় একটি গোটা জীবন পরিবর্তিত হয়ে যেতে পারে। বুদ্ধ, খ্রীষ্ট, মহম্মদ এবং প্রাচীনযুগে অন্যান্য জ্যোতির্ময় সত্তাদের সম্বন্ধে পড়েছিলাম, তাঁরা উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "তুমি সুস্থ হও," আর অমনি লোকটি সুস্থ হয়ে গেল। সে কাহিনী আমি সত্য হতে দেখেছি। এই মহাপুরুষকে দেখে আমার সব সংশয় বিদূরিত হ'ল।"

"আমার আচার্যদেবের কাছে থেকে আমি উপলব্ধি করেছি, মানুষ এই দেহেই সিদ্ধাবস্থা লাভ করতে পারে। তার মুখ থেকে কখনো কারু প্রতি অভিশাপ বর্ষিত হয় নি। এমন কি তিনি কারু সমালোচনা পর্যন্ত করতেন না। তাঁর চোখে জগতে মন্দ বলে কিছু ছিল না। তাঁর অন্তরে কোন মলিন চিন্তার ছায়াপাতও ঘটা অসম্ভব ছিল। সেই মহাপবিত্রতা, মহাত্যাগই ধর্মলাভের একমাত্র নিগূঢ় উপায়।"

শিক্ষিত সমাজে রামকৃষ্ণদেবের পুণ্য প্রভাব কী ভাবে বিস্তৃত হচ্ছিল, তার স্পষ্ট সাক্ষ্য মিলবে পূর্বোদ্ধৃত মন্তব্যগুলিতে।

"কথামৃত"-সঙ্কলয়িতা শ্রী 'ম' বা শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত কলকাতায় মেট্রোপলিটন স্কুল, রিপন কলেজ প্রভৃতি নানাস্থানে অধ্যাপনা করেছেন। তাই "মাষ্টার মশাই" নামে তিনি পরিচিত হন। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে ফেব্রুয়ারী একদিন দক্ষিণেশ্বরে এসে তিনি রামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে পরিচিত হন। এর আগে কেশব সেনের বক্তৃতা ও রচনাবলীতে এবং আত্মীয় নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের কাছে তিনি রামকৃষ্ণদেব সম্বন্ধে অবহিত হয়েছিলেন। দিনে দিনে মহেন্দ্রনাথের

কবিপ্রাণ ভক্তহৃদয়ে রামকৃষ্ণের পূতসঙ্গ ও অমৃতবাণী অমেয় প্রভাব বিস্তার করে। শ্রীরামকৃষ্ণ-দর্শনের আগে তিনি "চৈতন্যচরিতামৃত" ও "বাইবেলের" অনুরাগী ছিলেন; তবু ধর্মচিন্তার ক্ষেত্রে তখনকার যুক্তিবাদী চিন্তানুসারে "নিরাকার"-সাধনায় বিশ্বাসী ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণসান্নিধ্যের ফলে ধর্মচিন্তার গণ্ডী অতিক্রম করে মহেন্দ্রনাথ উদারহৃদয় ও সর্বধর্মে শ্রদ্ধাশীল হয়ে উঠেন। তাঁর ছাত্রেরা রাখাল (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) বাবুরাম (স্বামী প্রেমানন্দ), সুবোধ (স্বামী সুবোধানন্দ), পূর্ণ (পূর্ণচন্দ্র ঘোষ) প্রমুখ অনেকে তাঁরই যোগাযোগ রামকৃষ্ণসান্নিধ্যে উপনীত হয়। এজন্য "ছেলেধরা মাষ্টার" বলে তাঁর অপবাদও রটেছিল। কিন্তু এই আদর্শ শিক্ষক অভিভাবকদের ভ্রূকুটি উপেক্ষা করে জীবনের মহত্তম সত্যোপলব্ধি ছাত্রদের জীবনে ও হৃদয়ে সঞ্চারিত করেছিলেন।

ছোটবেলা থেকে তাঁর ডায়েরী রাখা অভ্যাস ছিল। প্রধানতঃ সেই ডায়েরীতে ধর্মানুভূতির কথাই থাকত। সেই অভ্যাসই উত্তর জীবনে মহেন্দ্রনাথকে শ্রীরামকৃষ্ণ-বাণী-সংগ্রহে প্রেরণা দেয়। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দেহান্তের বেশ কিছুকাল পরে তিনি তাঁর একান্ত হৃদয়সম্পদ ধীরে ধীরে জনসাধারণের কাছে প্রকাশ করেন। প্রথমে ইংরেজী পুস্তিকাকারে Gospel of Sri Ramakrishna (১৮৯৭) প্রকাশিত হয়। পরে স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ রামকৃষ্ণানুরাগীদের প্রেরণায় বাংলায় বৃহত্তর আকারে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত প্রথম খণ্ড ১৯০২ সালে, দ্বিতীয় খণ্ড ১৯০৪ সালে, তৃতীয় খণ্ড ১৯০৮ সালে, চতুর্থ খণ্ড ১৯১০ সালে এবং মহেন্দ্রনাথের লোকান্তরের পর ১৯৩২ সালে পঞ্চম খণ্ড প্রকাশিত হয়। এই পঞ্চম খণ্ডের সামান্য কিছু অংশ মহেন্দ্রনাথ দেখে যেতে পেরেছিলেন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি। পৃথিবীর ধর্মসাহিত্যে 'ধম্মপদ', 'বাইবেল', 'কোরান' প্রভৃতির

পাশাপাশি "কথামৃত"র স্থান। প্রত্যক্ষ অধ্যাত্ম-অনুভূতির এমন সরল অথচ উপমামধুর উপস্থাপনায় বাংলা গদ্যে চলতি ভাষার অনন্ত সম্ভাবনার ইঙ্গিত দিয়েছে। বাস্তবিক 'কথা'র শিল্পে রামকৃষ্ণ অদ্বিতীয়।

মহেন্দ্রনাথ নিজের নাম গোপন করে 'শ্রীম' এই নামে কথামৃত সঙ্কলন করেছিলেন। পাঁচটি খণ্ডে তাঁর নাম 'শ্রীম', মাষ্টার, মণি, মোহিনী-মোহন, একজন ভক্ত। এমনিভাবে তিনি শুধু নাম গোপনই করেন নি, সমগ্র গ্রন্থটির মধ্যে মাঝে মাঝে স্বগত ভাষণ ছাড়া অন্য কোন মন্তব্য বা বিশ্লেষণ প্রচেষ্টাই তিনি করেন নি। এর ফলে রামকৃষ্ণদেবের বাণীভঙ্গী যথাযথভাবে রক্ষিত হয়েছে। সে বাণী অনুলেখকের প্রগল্‌ভতাবর্জিত।

অল্ডাস হাক্সলি 'কথামৃত'কে বসওয়েলকৃত জনসনের জীবনী ও বাণী সংগ্রহের সঙ্গে তুলনা করেছেন। তবে ভাবের মহত্ত্বে কথামৃতের স্থান অনেক ঊর্দ্ধে—তাতে সন্দেহ নেই। শ্রীরামকৃষ্ণের এই বাণী সংগ্রহ ভারতবর্ষের সমগ্র অতীতের অধ্যাত্মসাধনা ঘনীভূত আকারে প্রকাশিত। তাই 'কথামৃত' মানবাত্মার শাশ্বত সম্পদ।

'কথামৃতে' উপমার পাশাপাশি রয়েছে parable জাতীয় ছোট ছোট গল্প। এই সব গল্পের সঙ্গে জাতক ও বাইবেলের উপদেশাত্মক গল্পগুলি তুলনীয়। ছোট্ট কাহিনীর শিশির বিন্দুতে অনন্ত আকাশের উদ্ভাসনে এই গল্পগুলি বাংলা কথাসাহিত্যের আসরে চিরস্মরণীয়। একটি উদাহরণ দিয়ে এ প্রসঙ্গ সমাপ্ত করি—

"যতদিন সংসারে সুখ পাবার আছে, ততদিন কেউ ছাড়তে পারে না। যতদিন আশা, ততদিন কাজ।

গঙ্গার উপর দিয়ে একটি জাহাজ চলেছে। একটি পাখী উড়তে উড়তে আনমনে এসে জাহাজের মাস্তুলে বসল। জাহাজ গঙ্গার ভিতর ছিল, ক্রমে মহাসমুদ্রে এসে পড়ল। তখন পাখীর চটকা

ভাঙল। সে চেয়ে দেখল চারদিকে কূল-কিনারা নেই। তখন ডাঙ্গায় ফিরে যাবার জন্যে উত্তর দিকে উড়ে গেল। অনেক দূর গিয়ে সে শ্রান্ত হয়ে গেল, তবু কূল-কিনারা দেখতে পেলে না। তখন কি করে—ফিরে এসে আবার মাস্তুলে বসল।

অনেকক্ষণ পরে পাখীটা আবার উড়ে গেল,—এবার পূব দিকে গেল। সে দিকে কিছুই দেখতে পেলে না, চারিদিকে কেবল অকূলপাথার! তখন ভারি পরিশ্রান্ত হয়ে আবার জাহাজে ফিরে এসে মাস্তুলের উপর বসল। অনেকক্ষণ জিরিয়ে নিয়ে এবার দক্ষিণ দিকে গেল। আবার ফিরে এসে বসল। এমনি করে আবার পশ্চিম দিকে গেল। যখন দেখল কোথায়ও কূল-কিনারা নেই, তখন সেই মাস্তুলের উপর শান্ত হয়ে বসল, আর উঠল না। তখন তার মনে আর কোন অশান্তি নেই। সে সব দিকে চেষ্টা করে দেখেছে। এখন নিশ্চিন্ত হয়ে মাস্তুলের উপর চুপচাপ বসে রইল।

সংসারের আশা মিটলে, তবে মানুষ ভগবানের উপর পুরো নির্ভর করে।”

শ্রীরামকৃষ্ণ স্পর্শ করেছিলেন নরেন্দ্রনাথকে। যুক্তি নয়, শাস্ত্র নয়, তর্ক নয়,--শুধু একটি স্পর্শ—অথবা হয়তো ঐ স্পর্শের মধ্যেই সব—তর্ক, শাস্ত্র, যুক্তি মিলিত। নরেন্দ্রনাথ রূপান্তরিত হলেন—সচ্চিদানন্দ, বিবিদিষানন্দ বিবেকানন্দ শেষ অবধি বিবেকানন্দ; এবং প্রথম থেকেই বিবেক আনন্দ।

সদসৎ বিচারের ও সহজাত বৈরাগ্যের যে ধ্যানীসত্তা নরেন্দ্রনাথের শৈশব-কৈশোরের বিচিত্র কাহিনীগুলিতে নিহিত; শ্রীরামকৃষ্ণ-'সান্নিধ্যে এসে সেই সহস্রদল পদ্মের পরিপূর্ণ উন্মীলন। ভারতীয় মানস-সরোবরের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য নরেন্দ্রপদ্মের মহাবিকাশের জন্য আমরা শ্রীরামকৃষ্ণসূর্যের উদ্দেশে চিরপ্রণত। তবু মনে রাখতে হবে, আমরা কেবল বিবেকানন্দকেই পাই নি;— শ্রীশ্রীমা সারদামণি, গোপালের মা, স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী শিবানন্দ, স্বামী তুরিয়ানন্দ, স্বামী অখণ্ডানন্দ, লাটু মহারাজ (স্বামী অদ্ভুতানন্দ), গিরিশচন্দ্র ঘোষ, দুর্গাচরণ নাগ, রামচন্দ্র দত্ত, মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত—এই মুহূর্তে যে কটি নাম মনে এলো,—তাঁরা ছাড়াও তাঁর গৃহী ও সন্ন্যাসী শিষ্যদের মধ্যে এমন অনেককেই আমরা জানি যাঁদের জীবন যে কোন দেশে যে কোন যুগে পরম শ্রদ্ধার আসনে নিত্য বন্দনীয় হতে পারতো। এঁদের মধ্যে শ্রীশ্রীমা সারদামণিকে স্বামীজী তুল্য সম্মান দিয়ে গেছেন। বস্তুতঃ তাঁর কাছে শ্রীরামকৃষ্ণ ও সারদাদেবীর মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না, কখনো কখনো 'মা ঠাকরুণ' তাঁর কাছে শ্রীরামকৃষ্ণের মহিমাকেও অতিক্রম করে গেছেন। লজ্জাপটাবৃতা সারদামূর্তির অন্তরালে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের মাতৃসাধনার পরিপূর্ণ বিগ্রহটি প্রত্যক্ষ করেছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্তর্ধানের পর তাঁর অনুরাগীমণ্ডলীর চিন্তাজগতে সারদাদেবী ও নরেন্দ্রনাথ—এঁরাই ছিলেন কেন্দ্রস্বরূপ। শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্তানদের জননী হয়ে সারদামণি কেমন করে ধীরে ধীরে বিশ্বমাতৃত্বের অধিকারিণী হয়ে উঠেছিলেন, সে ইতিহাস যাঁরা জানেন, তাঁরা শ্রীরামকৃষ্ণ-ব্যক্তিত্বের বিশ্বমুখীনতার স্বতঃসিদ্ধ পরিচয় পেয়ে বিমুগ্ধ।

লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকে জননী সারদামণি বিবেকানন্দের জীবনধারাকে কতখানি নিয়ন্ত্রিত করেছিলেন তার পরিচয় মেলে 'পত্রাবলীতে'। নিবেদিতা যে নারী জাগরণের ব্রত গ্রহণ করেছিলেন, তারও কেন্দ্রশক্তি ছিলেন সারদাদেবী। সারদাদেবী, গোপালের মা, যোগীন মা ও গোলাপ মা—এই অন্তঃপুরচারিণীদের জীবনযাত্রার অন্তরালে যে ভক্তিবিশ্বাসময় পৌরাণিক ভাবকল্পনার জগৎ ছিল, ব্রত উপবাস, নিয়ম নিষ্ঠার মধ্য দিয়ে যে ভারতাত্মার নিঃশব্দ আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল তার সংস্পর্শে এসেই ভারতীয় নারীত্বের আদর্শ সম্বন্ধে নিবেদিতার ধারণা সম্পূর্ণ হয়।

এক হিসাবে শ্রীরামকৃষ্ণ-আদর্শও সারদাদেবীকে ছাড়া অসম্পূর্ণ থাকত। সংসারজীবনের সব দায়িত্ব গ্রহণ করেও কেমন করে একান্ত ঘরোয়া এক বাঙালী বধূ বিশ্বজননী হয়ে উঠতে পারেন, সারদাদেবীর মধ্যে আমরা সে আদর্শ প্রত্যক্ষ করেছি। শ্রীরামকৃষ্ণ-সাধনার অন্তরে এমন একটি বিশ্বতোমুখী মনোভাব ছিল বলেই তাঁর শিষ্য ও অনুরাগীদের অসাম্প্রদায়িক উদার ধর্মচিন্তা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের রাখীবন্ধনে এত সার্থকতা অর্জন করেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবন ও তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিতদের জীবন—দু'দিক থেকেই শ্রীরামকৃষ্ণ জগতের একজন সেরা জীবনশিল্পী। 'চারিত্রপূজা' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "ভাষা, প্রস্তর, অথবা চিত্রপটের দ্বারা সত্য এবং সৌন্দর্য প্রকাশ ক্ষমতার কার্য সন্দেহ নাই; তাহাতে বিচিত্র বাধা অতিক্রম এবং অসামান্য নৈপুণ্য প্রয়োগ করিতে হয়। কিন্তু নিজের

সমগ্র জীবনের দ্বারা সেই সত্য ও সৌন্দর্য প্রকাশ করা তদপেক্ষা আরো বেশী দুরূহ, এবং তাহাতে পদে পদে কঠিনতর বাধা অতিক্রম করিতে হয়, এবং তাহাতে স্বাভাবিক সূক্ষ্মবোধশক্তি ও নৈপুণ্য, সংযম ও বল অধিকতর আবশ্যক হয়।"

সুতরাং সব শিল্পের উপরে জীবনশিল্প। শিল্প জীবনকে পূর্ণতা দেয় এবং জীবনও শিল্পকে প্রবুদ্ধ করে। তবু এক একজন যুগমানবের হৃদয়কেন্দ্রে নিত্যকালের প্রেরণাশক্তি থাকে, কালের সীমা পার হয়েও যার স্পন্দন অনাহত। বিশেষ যুগের প্রয়োজন তাঁদের আবির্ভাবের উপলক্ষ্য মাত্র। আসলে তাঁদের আবির্ভাব মানুষের সত্যানুসন্ধানের চিরন্তনতায়।

নরেন্দ্রনাথ ও শ্রীরামকৃষ্ণের যোগাযোগ এমনি সত্যান্বেষী মনের ব্যাকুলতায়। নরেন্দ্রপর্বের আগে শ্রীরামকৃষ্ণজীবনের সেই সত্যসন্ধান আমাদের স্মরণীয়। 'সত্য'—এই বিশেষ শব্দটিই শ্রীরামকৃষ্ণের অতি প্রিয় ছিল। মায়ের চরণে তিনি সর্বস্ব দিয়েছিলেন, কিন্তু 'সত্য' দিতে পারেন নি। "যে সত্যকে ধরে আছে সে ভগবানের কোলে শুয়ে আছে।"—শ্রীরামকৃষ্ণের কাছেই সারদাদেবী এই মহাবাণী লাভ করেছিলেন।

দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে তরুণ রামকৃষ্ণ দাদার সঙ্গে এসেছিলেন অনেকটাই ঘটনাচক্রে। অখ্যাত পল্লীর পুঁথিপাণ্ডিত্যহীন বিষয়বুদ্ধিবর্জিত এক সরল ব্রাহ্মণ। জাতিগত গোঁড়ামি বা নিষ্ঠা তখন পূর্ণ মাত্রায়। কৈবর্তপ্রতিষ্ঠিত কালীমন্দিরে সেদিন তিনি অন্ন গ্রহণ করেন নি।

স্নানযাত্রার তিথিতে কালীমন্দিরের প্রতিষ্ঠা; মন্দিরপ্রাঙ্গণে ভবতারিণী, রাধাকৃষ্ণ, এবং দ্বাদশ শিবমন্দির। বাংলার ধর্মসংস্কৃতির ত্রিবেণীসংগম ওই মন্দিরচ্ছায়ায় আপনি রূপায়িত, সেই সমন্বয়বার্তা বহন করে ভাগীরথী নিত্য প্রবাহিতা সাগর-সন্ধানে। ধীরে ধীরে পূজোর যোগাড় দেওয়া থেকে মায়ের পূজারী হওয়া অবধি তরুণ

রামকৃষ্ণের সাধকসত্তার জাগরণ। বাংলা সাল হিসাবে ১২৬২ থেকে ১২৭৩ শ্রীরামকৃষ্ণজীবনের সাধনপর্ব। কলকাতার উপকণ্ঠে দক্ষিণেশ্বরে যখন ভারতবর্ষের পাঁচ হাজার বৎসরের সাধনধারা সংক্ষেপে পুনরাবৃত্ত হয়ে চলেছে, তখন ভারতের বহিরঙ্গ ইতিহাসেও সিপাহীবিদ্রোহ থেকে আরম্ভ করে স্বদেশী প্রেরণায় নবযুগের সূচনা। পাশ্চাত্য সভ্যতার বিজয়দ্ধোত ভঙ্গীর প্রতিবাদে ক্রমে ক্রমে জাতীয়তাবাদী চেতনা ভারতীয় মানসের সর্বক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করেছে। অস্বাভাবিক বিদেশী অনুকরণ এযুগে যতখানি সত্য, ততখানি সত্য জাতীয় চিত্তের আত্মানুসন্ধান। ইতিহাসের অমোঘ প্রয়োজনেই শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনায় ভারতাত্মার পুনরাবিষ্কার সম্ভব হয়েছিল। ভারতীয় চেতনার প্রাণকেন্দ্রে যে আধ্যাত্মিকতা, শ্রীরামকৃষ্ণ সেই প্রাণকেন্দ্রে নূতন শক্তি সঞ্চার করেছেন বলেই ভাতরবর্ষের বাণী বিবেকানন্দের মাধ্যমে সমগ্র বিশ্বকে আত্মীয় সম্বোধনে আহ্বান করতে পেরেছে।

বৈষ্ণব ও শাক্ত সাধনার বিচিত্র পন্থায় উত্তীর্ণ শ্রীরামকৃষ্ণ ইসলাম ও খ্রীষ্টধর্মের সাধনাতে ভগবৎস্বরূপের উপলব্ধি করে সাকার থেকে নিরাকার, সগুণ থেকে নির্গুণ—যাবতীয় অধ্যাত্মধারণার পূর্ণ অধিকারী হয়েছিলেন। ধর্মীয় দর্শনের বিচারে সাধনার প্রথম পর্বে তিনি দ্বৈত ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী। কিন্তু তোতাপুরীর কাছে অদ্বৈত-বেদান্তের সাধনায় সিদ্ধ হওয়াই তাঁর সাধকজীবনের পূর্ণ পরিণতি। সাধারণ ভক্তদের সঙ্গে আলাপ আলোচনায় তিনি ভক্তির উপরেই জোর দিতেন। বারংবার বলেছেন, 'কলিতে নারদীয় ভক্তি'। 'যতক্ষণ আমি আছি, ততক্ষণ তুমি আছ।' ইহসংসারে থেকে মানুষের পক্ষে 'ভগবান'কে ছাড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয় বলেই তিনি মনে করতেন।

কিন্তু বিশেষ অধিকারীর কাছে তিনি নিরাকার নির্গুণ ব্রহ্মচেতনাই যে সাধনার চরম লক্ষ্য এ কথাও বারবার বলেছেন। তাঁর শ্রেষ্ঠ

আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকারী নরেন্দ্রাথকে তিনি অদ্বৈত সাধনার পথেই পরিচালিত করেছেন। পঞ্চদশী, অষ্টাবক্র-সংহিতা প্রভৃতি অদ্বৈত সিদ্ধান্তমূলক রচনাপাঠে তিনিই নরেন্দ্রনাথকে উৎসাহিত করেন। ব্রাহ্মসমাজের মতো ভক্তিই ঈশ্বরোপলব্ধির একমাত্র পন্থা—একথা মনে করা ভারতসাধনার উত্তরাধিকারী শ্রীবামকৃষ্ণের পক্ষে সম্ভব ছিল না। দার্শনিক বিচারে তিনি শেষ পর্যন্ত অদ্বৈতবাদী, এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু সাধনার স্তরপবম্পবা স্বীকাব করে উপদেশের পাত্র অনুসারে তিনি কখনো দ্বৈত, কখনো বিশিষ্টাদ্বৈত এবং কখনো অদ্বৈতবাদী মনোভাব প্রকাশ করেছেন।

কালীপূজারী শ্রীবামকৃষ্ণ ব্রহ্ম আব শক্তিকে অভেদ মনে করতেন। বাংলার শক্তিসাধনার অন্তর্নিহিত অদ্বৈতভাব রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত প্রমুখ কবিদের রচনায় যুগ যুগ ধরেই বাঙালী হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত। এই শাক্তাদ্বৈতসাধনা থেকে যাত্রা করে শ্রীবামকৃষ্ণ যে পরিপূর্ণ অদ্বৈত-সিদ্ধিতে পৌঁছেছিলেন, বিবেকানন্দ তারই বাণীমূর্তি।

প্রতিমাপূজা ও নিরাকার সাধনা—এ দুয়ের সামঞ্জস্য অনেক চিন্তাশীল প্রগতিবাদীদের মতে অসম্ভব বলেই বিবেচিত। তরুণ নরেন্দ্রনাথও দক্ষিণেশ্বরের ভবতারিণীকে শ্রীবামকৃষ্ণের একটি কথাতেই মেনে নেন নি। স্বভাবতঃই মানববুদ্ধিব বিচারে অসীম সত্যকে নিজের সিদ্ধান্তে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা দেখা দেয়। এ দিক থেকে শ্রীবামকৃষ্ণের কালী প্রতিমার ব্যাখ্যা স্মরণীয়—"কালী কি কালো? দূরে তাই কালো, জানতে পারলে আর কালো নয়। আকাশ দূর থেকে নীলবর্ণ। কাছে দ্যাখো, কোনো রং নাই।"

"কালী আর কেউ নয়, যিনি ব্রহ্ম তিনিই কালী। কালী আদ্যাশক্তি। যখন নিষ্ক্রিয় তখন ব্রহ্ম বলে কই। যখন সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করেন, তখন শক্তি বলে কই, কালী বলে কই।"

ভারতীয় সাধনার ইতিহাসে সুপ্রাচীন বৈদিকযুগ থেকেই আমরা

সব দেবতার নিখিল ব্রহ্মময়ত্ব লক্ষ্য করতে পারি, সুতরাং উনিশ শতকের শাক্তসাধক যখন ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তিকে অভেদ জেনে কালী ও ব্রহ্মকে স্বরূপতঃ এক মনে করেন, তখন খুব আশ্চর্য হওয়ার কথা নয়। তবু আমরা নাম, রূপ ও শব্দের মহিমায় এত সহজে মুগ্ধ হই যে বিভিন্ন শব্দ ও সংজ্ঞার আড়ালে এক অনন্ত সত্যের অস্তিত্ব অস্বীকার করে বসি।

ব্রহ্মের নিত্য ও লীলাস্বরূপ—দুটিই শ্রীরামকৃষ্ণের আকাঙ্ক্ষিত ছিল। সাধকের আদর্শ ছিলেন নারদ শুকদেবাদি—যাঁরা নিত্যে পৌঁছেও লোককল্যাণের জন্য লীলায় দেহধারণ করেছেন। প্রিয় শিষ্য নরেন্দ্রনাথকে তিনি সেই আজন্মবৈরাগ্যবান তপস্বী শুকদেবের মতোই —একাধারে ব্রহ্মজ্ঞানী ও পরমভক্তরূপে দেখতে চেয়েছিলেন। তাই ব্রহ্মোপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গে কালীর প্রত্যক্ষ মহিমা নরেন্দ্রনাথের হৃদয়ে চিরকালের জন্য প্রতিষ্ঠিত করে তবে তাঁর কাজ শেষ হয়েছে।

উনিশ শতকের শিক্ষিত সমাজে ধর্মসংস্কার একটি প্রধান চিন্তনীয় বিষয় হয়ে উঠেছিল। রামমোহনের আদর্শে উদ্বুদ্ধ ব্রহ্মসমাজ প্রধানতঃ উপনিষদের বাণী অবলম্বনে গড়ে উঠলেও বেদান্তের অদ্বৈতোপলব্ধিকে গ্রহণ করতে পারে নি। ন্দুসমাজের আচার আচরণ থেকে মুক্ত হতে গিয়ে তাঁরা খ্রীষ্টধর্মের প্রার্থনা, সভা, আচার্যের ভাষণ, পাপচিন্তা ও অনুতাপের মাহাত্ম্য ইত্যাদি যে সব পদ্ধতি গ্রহণ করেছিলেন, সে সবের অন্তর্নিহিত পাশ্চাত্য অনুকরণের ভঙ্গী সাধাবণ মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হয় নি। সুতরাং ব্রাহ্মসমাজের আবেদন মূলতঃ উচ্চশিক্ষিত সমাজে ও শহরাঞ্চলেই আবদ্ধ ছিল। সমকালীন সংস্কারবাদীদের দৃষ্টিতে এ দেশের অধিকাংশ মানুষের ধর্মীয় বিশ্বাস ধ্যান ারণা ছিল একান্ত কুসংস্কারেরই নামান্তর।

বাংলার অখ্যাত নিভৃত পল্লী কামারপুকুর থেকে ভারতের চিরন্তন

ধর্মসংস্কৃতির বহুবিচিত্র রূপায়ণের প্রতীকরূপে শ্রীরামকৃষ্ণ যখন কলকাতার উপকণ্ঠে এসে সাধনা আরম্ভ করলেন, তখন থেকেই ধর্মসংস্কৃতির ক্ষেত্রে গ্রামীণ ও নাগরিক শ্রেণীভেদ লুপ্ত হয়ে ভারতীয় সাধনার ঐক্য নূতনভাবে প্রতিষ্ঠিত হল। পুঁথিপড়া পাণ্ডিত্যের স্থান নিল প্রত্যক্ষ উপলব্ধির নিশ্চিত অভিজ্ঞান।

ব্রাহ্মসমাজের দ্বিতীয় পর্বের নেতৃবৃন্দ—কেশবচন্দ্র, প্রতাপচন্দ্র, ত্রৈলোক্যনাথ, শিবনাথ, বিজয়কৃষ্ণ—একে একে শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনা ও সিদ্ধির পরিচয় লাভে উন্মুখ হয়ে তাঁর সঙ্গলাভের প্রয়াসী হলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায়, এক গাঁজাখোর আর এক গাঁজাখোরকে দেখলে আনন্দ পায়। হয়তো বা কোলাকুলিই করে।

ব্রাহ্মসমাজের ভক্তেরা আসবার অনেক আগে থেকেই যথার্থ অধ্যাত্মপিপাসু বহু সাধক শ্রীরামকৃষ্ণ-করুণায় অভিষিক্ত হয়েছেন, কিন্তু তাঁদের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের সম্বন্ধ অনেকটাই ব্যক্তিগত। সমসাময়িক শিক্ষিতসমাজের সঙ্ঘবদ্ধ আন্দোলনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের পরিচয় ও গভীর প্রীতিই উনিশ শতকের চিন্তাজগতে হিন্দুধর্মের জীবন্ত ঈশ্বরোপলব্ধিকে নবজাগ্রত ভারতবাসীর সাগ্রহ অভিনিবেশের বস্তু করে তুলেছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্তরঙ্গ শিষ্যমণ্ডলীর অনেকেই সাধকজীবনের সূচনায় ব্রাহ্মসমাজের ছায়াতলেই বিশুদ্ধ নৈতিক জীবন যাপনের প্রেরণা লাভ করেছিলেন। কিন্তু কেশবচন্দ্র, শিবনাথ বা বিজয়কৃষ্ণের তুলনায় শ্রীরামকৃষ্ণের অধ্যাত্ম উপলব্ধির বিশালতা ও বৈচিত্র্য, সর্বোপরি ধর্মজীবনসংগঠনে শ্রীরামকৃষ্ণের অতুলনীয় আচার্যশক্তি নরেন, রাখাল, শরৎ, শশী, প্রমুখ তরুণ কিশোরদের মন সম্পূর্ণ জয় করে তাঁদের চিরদিনের মতো আপন করে নিয়েছিলেন।

ব্রাহ্মসমাজের প্রভাবশালী অনেকেই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এই ক্রমবর্দ্ধমান প্রভাব বিশেষ সুনজরে দেখেন নি। যে ব্রাহ্ম ভক্তদের

নিয়ে ভগবৎ নামকীর্ত্তনে শ্রীরামকৃষ্ণ মাতোয়ারা হয়ে যেতেন, তাঁদেরই একদল শ্রীরামকৃষ্ণ ব্রাহ্মমন্দিরে এলে আলো নিভিয়ে দিয়েছিলেন। এইভাবেই নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে ব্রাহ্ম সমাজের বিচ্ছেদের সূচনা।

রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' উপন্যাসে পরেশবাবু ও পানুবাবু—এই দুই শ্রেণীর ব্রাহ্ম আমরা দেখতে পেয়েছি। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের সামাজিক বিদ্রোহ যে ক্রমে বিচ্ছিন্ন সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীরচনার দিকে ঝুঁকেছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। কেশবচন্দ্রের সময় থেকেই এ বিচ্ছেদের সূচনা এবং সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের ব্রাহ্মগণ আরো স্বাতন্ত্র্যবুদ্ধির ফলে হিন্দু সমাজের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ। শ্রীরামকৃষ্ণের উদার অসাম্প্রদায়িকতা স্বভাবতই ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে একটু আতঙ্কজনক হয়ে উঠেছিল। পরবর্তীকালে ব্রাহ্মনেতারা শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের দানকে যথাসম্ভব লঘু করে দেখার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু বৌদ্ধধর্মের বিশাল বিদ্রোহ যেমন অনায়াসে হিন্দু সংস্কৃতি আত্মসাৎ করে নিয়েছিল, তার চেয়ে অনেক সময় কম আয়াসে ব্রাহ্মসমাজের ধর্মসংস্কার-প্রচেষ্টার আপাতস্বাতন্ত্র্য হিন্দুসংস্কৃতির কক্ষে বিলীন হয়ে গেছে। বলা বাহুল্য, শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের আবির্ভাবই তার প্রধান কারণ।

ভারতের গণসংস্কৃতি শ্রীরামকৃষ্ণকে আত্মীয়রূপে বরণ করে নিয়ে পুঁথিপড়া পাণ্ডিত্য এবং বিদেশীর মূল্যমানে গঠিত সংস্কারপ্রিয়তাকে অস্বীকার করেছিল; সেই সঙ্গে একথা প্রমাণ করেছিল যে, জাতির অন্তর থেকে সংস্কার প্রচেষ্টা দেখা না দিলে কেবলমাত্র উপরতলা থেকে চাপিয়ে দেওয়া কোন সংস্কারই শেষ পর্যন্ত সফল হয় না। তবু রামমোহন থেকে শিবনাথ শাস্ত্রী অবধি ব্রাহ্মসমাজের নেতৃবৃন্দের সংস্কার-প্রচেষ্টার মহামূল্য অস্বীকার করার উপায় নেই।

আসলে সংস্কারকামীদের আন্তরিক প্রচেষ্টা ভারতের গণসংস্কৃতির সমর্থন পায় নি বলেই উনিশ শতকের নবজাগরণ দ্বিধাবিভক্ত হয়ে

পড়েছিল। এইখানেই উনিশ শতকের সাধনার সবচেয়ে বড়ো ত্রুটি। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ এই দিক থেকে ভারতবর্ষের মূল সমস্যাটি উপলব্ধির চেষ্টা করেছেন। অধ্যাত্মপ্রত্যয়ের দিক থেকে দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, অদ্বৈত—এই সাধনপরম্পরায় ভারতীয় সাধনার সব ক'টি স্তরকে স্বীকৃতি দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ হিন্দুধর্মের সনাতনত্বকে সুপ্রতিষ্ঠিত করলেন। জাতির মানস-ইতিহাস এক অখণ্ড চেতনায় বিধৃত হয়ে সুসমঞ্জস রূপ নিল। অপরপক্ষে বেদান্তের আলোকে বিশ্বের সব ধর্মমতের মূলগত ঐক্য উপলব্ধি করে বিবেকানন্দ এক বিশ্বমানবধর্মের উদ্বোধন করলেন। ভারতের 'ধর্ম' বিশেষ দেশ ও কালের গণ্ডীতে আবদ্ধ হয়ে রইল না—শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণীর আলোকে তা সব দেশের সব মানুষের স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করে নিয়েই পরম ঐক্যের বন্ধনে মানবজাতিকে আবদ্ধ করল।

'জীবে দয়া নয়, শিব জ্ঞানে জীব সেবা' —এই কথাটুকু শ্রীরামকৃষ্ণ-দর্শনের মূল সূত্র। পরবর্তীকালে বিবেকানন্দের 'কর্মে পরিণত বেদান্তে'র এইটিই মূলভিত্তি। সমকালীন সাক্ষী স্বামী সারদানন্দজীর বিবরণ অনুসারে উক্তিটির উপলক্ষ্য এই—১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের কোন এক দিন দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ঘরটিতে নরেন্দ্রাদি ভক্তসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর অনুপম কথামৃত পরিবেশন করে চলেছেন। কথা প্রসঙ্গে বৈষ্ণবধর্মের কথা উঠল। ঐ মতের সারমর্ম সকলকে বুঝিয়ে দিয়ে তিনি বললেন, "তিনটি বিষয় পালন করতে ঐ মতে উপদেশ দেয়—নামে রুচি, জীবে দয়া, বৈষ্ণবসেবন। যে নাম সেই ঈশ্বর—নাম-নামী অভেদ জেনে সর্বদা অনুরাগের সঙ্গে ভগবানের নাম করবে; ভক্ত ও ভগবান, কৃষ্ণ ও বৈষ্ণব অভেদ জেনে সর্বদা সাধু ভক্তদের শ্রদ্ধা, পূজা ও বন্দনা করবে; এবং কৃষ্ণেরই জগৎ সংসার একথা হৃদয়ে ধারণা করে সর্বজীবে দয়া—" একথা বলতে বলতে শ্রীরামকৃষ্ণ সমাধিস্থ হয়ে গেলেন।

কিছুক্ষণ পরে অর্দ্ধ বাহ্যদশায় বলতে লাগলেন, "জীবে দয়া—জীবে দয়া? দূর শালা। কীটানুকীট তুই জীবকে দয়া করবি? দয়া করবার তুই কে? না, না, জীবে দয়া নয়—শিব জ্ঞানে জীবের সেবা।" [লীলাপ্রসঙ্গ : দিব্যভাব ও নরেন্দ্রনাথ]

এই 'জীব সেবা'—মন্ত্রটি নরেন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গীর আমূল পরিবর্তনে কী অসাধারণ প্রভাব বিস্তার করেছিল, বর্তমান 'রামকৃষ্ণ মিশন' তার অন্যতম প্রমাণ। মানুষের অন্তর্নিহিত ব্রহ্মের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ জাগ্রত হলে বৈরাগ্য কেবলমাত্র বিমুখতার নামান্তর না হয়ে প্রেম ও কল্যাণ বোধের দ্বারা কেমন করে জগৎ সংসারকেই সাধনার উপাদানে পরিণত করতে পারে, অথচ অনাসক্তির মূল সত্যটি বজায় রেখেই মানব-প্রেমকে সত্যোপলব্ধির সোপান করে তোলে—শ্রীরামকৃষ্ণের 'শিব জ্ঞানে জীবসেবা' মন্ত্রটি সংহত আকারে বিবেকানন্দজীবনের বিরাট সম্ভাবনার উদ্বোধন ক'রে—সে কথাই প্রমাণ করে গেল।

•আধুনিককালে মানবপ্রেম, মানবস্বীকৃতি বা মানবিকবাদ (Humanism) কথাটি বুদ্ধিজীবী সমাজের বামে ও দক্ষিণে সর্বত্র সমান আগ্রহের বস্তু। মানবপ্রীতির আধুনিক ধারণাটি উনিশ শতকের "Positivism" বা ধ্রুববাদের অনুরাগীরাই বাংলাসাহিত্যে সবচেয়ে বেশী সঞ্চারিত করেন। স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র ধ্রুববাদ ও ভগবদ্গীতার সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেছেন। পরবর্তীকালে রবীন্দ্র-সাহিত্যে মানবিকতার গভীরতম বিস্তার। একদিক থেকে উপনিষদ ও বাউল গান এবং অন্যদিকে ভিক্টোরীয়যুগের পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রভাব ও পরিক্রমার ফলে নিখিলমানবের প্রতি গভীর আত্মীয়তা-বোধ রবীন্দ্র-সাহিত্যে মানবিকবাদের পটভূমি রচনা করেছে।

বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ—দু'জনের চিন্তাধারাতেই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য আদর্শের একটি সামঞ্জস্য প্রচেষ্টা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বাংলা সাহিত্যে এই দুই প্রতিভার সন্ধিক্ষণে বাংলার মননভূমিতে দেখা

দিয়েছে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শিবজ্ঞানে জীবসেবার আদর্শ। এ আদর্শ সম্পূর্ণ প্রতীচ্য প্রভাবমুক্ত।

বাস্তবিকপক্ষে য়ুরোপীয় সেবাধর্ম যেমন খ্রীষ্টধর্মের সঙ্গে সম্পৃক্ত, ভারতীয় সেবাধর্মের ভাবও তেমনি হিন্দু ও বৌদ্ধ সাধনার সঙ্গেই সংযুক্ত। তবে গ্রীক মানবিকতার অন্তঃশীল প্রভাব য়ুরোপে যেমন ধর্ম ও জীবনকে বিভক্ত করতে পেরেছে, ভারতবর্ষে সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে ততটা পারেনি। নিছক মানবিকতা (Humanism) বলে কোন জিনিষ এতকাল ভারতে ছিল না। আধুনিক মানবিকতার সবচেয়ে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বিদ্যাসাগর। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের মানবিকতা মানুষের ব্রহ্মসত্তা ও দেহময় সত্তা—এ দুয়েরই সামঞ্জস্য সাধন করে আরো পূর্ণাঙ্গ এবং ভারতীয় সংস্কৃতির ঐতিহ্যবাহী। এদিক থেকে স্মরণীয় যে, উনিশ ও বিশ শতকের আরো দু'জন শ্রেষ্ঠ মানবপ্রেমিক বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের মানবিকতাবোধও অধ্যাত্ম পটভূমিতে বিধৃত। তবু, বিবেকানন্দের জীবনে ও চিন্তাধারায় মানবিকতা ও আধ্যাত্মিকতার যে সুষ্ঠু সমন্বয় আমরা লক্ষ্য করি ভারতীয় মানবিকতবাদের তাই শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত।

স্বভাবতঃই প্রশ্ন উঠতে পারে যে, মানবিকতা ও বৈরাগ্যধর্মের মধ্যে কোন আপোষরফা হতে পারে কি? "সন্ন্যাস" শব্দটি উচ্চারণ করলেই অনেক আধুনিকেরা "জীবনবিমুখ" "মধ্যযুগীয়" ইত্যাদি বিশেষণ দিয়ে তাঁদের 'সন্ন্যাস' সম্বন্ধে বিতৃষ্ণার পরিচয় দিয়ে থাকেন। ভারতবর্ষে (বা পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও) সন্ন্যাসের যা আদর্শ অর্থাৎ আত্মজ্ঞান বা ঈশ্বর লাভের জন্য সর্বস্বত্যাগ—তাকে জীবনবিমুখতা না বলে জীবনজিজ্ঞাসার চরম পরিণতি বলাই ঠিক। কারণ, সত্যের অন্বেষণে যাত্রা করেই মানুষ ক্রমে বহিরঙ্গ জীবন থেকে অন্তরের অন্তরতম দেশে এসে পৌছায়। আর কে না জানে, সত্য সন্ধানের শেষ যাত্রায় আমরা সবাই নিঃসঙ্গ। পরম সত্যকে কোন

সমষ্টিগত পন্থায় লাভ করা যায় না, একের সাধনাই বহুকে পথ দেখায়।

তবু, 'সন্ন্যাস' শব্দটির প্রতি আমাদের ভীতি সহজে যাবার নয়। শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে "শিবজ্ঞানে জীবসেবা"র আদর্শ লাভ করার আগে নরেন্দ্রনাথের মনেও যে এ সংশয় ছিল তার প্রমাণ মেলে নরেন্দ্রনাথের নিজের কথায়—"অদ্বৈতজ্ঞান লাভ করতে হলে সংসার ও লোকসঙ্গ সর্বতোভাবে বর্জন করে বনে যেতে হবে এবং ভক্তি ভালোবাসা প্রভৃতি কোমল ভাবকে হৃদয় থেকে উপড়ে চিরকালের মতো দূরে ফেলে দিতে হবে—একথাই এতকাল শুনে এসেছি। ফলে ঐভাবে অদ্বৈতজ্ঞান লাভ করতে গিয়ে জগৎ-সংসার ও তার মধ্যেকার প্রত্যেক ব্যক্তিকে ধর্ম-পথের অন্তরায় জেনে তাদের উপর ঘৃণা দেখা দিয়ে সাধকের ভুলপথে যাবার বিশেষ সম্ভাবনা। কিন্তু ঠাকুর আজ ভাবাবেগে যা বললেন, তাতে বোঝা গেল—বনের বেদান্তকে ঘরে আনা যায়, সংসারের কাজে অবলম্বন করা যায়। মানুষ যা করছে, সে সবই করুক, তাতে ক্ষতি নেই, কেবল প্রাণের সঙ্গে একথা সর্বাগ্রে বিশ্বাস ও ধারণা করলেই হল—ঈশ্বরই জীব ও জগৎরূপে তার সামনে প্রকাশিত। সংসারের সব লোককে যদি সে ঐভাবে শিবজ্ঞান করতে পারে, তাহলে নিজেকে বড় ভেবে তাদের প্রতি রাগ, দ্বেষ, দম্ভ বা দয়া করার অবসর তার কোথায় থাকবে? ঐভাবে শিবজ্ঞানে জীবসেবা করতে করতে চিত্ত শুদ্ধ হয়ে খুব অল্প সময়ের মধ্যে সে নিজেকেও চিরানন্দময় ঈশ্বরের অংশ এবং শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্তস্বভাব বলে ধারণা করতে পারবে।"

[লীলাপ্রসঙ্গ : দিব্যভাব ও নরেন্দ্রনাথ]

শুধু জ্ঞানযোগের পন্থায় নয়, ভক্তি, কর্ম ও রাজযোগ সম্বন্ধেও স্বামীজীর দৃষ্টিভঙ্গী ওই 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'র আলোকে রূপান্তরিত হয়েছিল। বিশেষতঃ কর্মযোগের ক্ষেত্রে এই জীবসেবার আদর্শ প্রয়োগের ফলেই রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সন্ন্যাসীবৃন্দের সৃষ্টি। কিন্তু

সন্ন্যাসীর কর্মযোগও একমাত্র ব্রহ্ম বা ঈশ্বর লাভের উদ্দেশ্য বলেই রাজনীতির জটিলতার সঙ্গে ধর্মের জগাখিচুড়ী তৈরীতে স্বামীজী রাজী ছিলেন না। সেদিক থেকে নিয়ত পরিবর্তনশীল রাজনীতির উত্থান পতনের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত না করেই রামকৃষ্ণ মিশন তাঁদের আদর্শ বজায় রেখেছেন। কোন দেশের ইতিহাসেই রাজনীতি ও আধ্যাত্মিকতার সংমিশ্রণের প্রচেষ্টা কল্যাণকর হয় নি। কিন্তু রাজনৈতিক কর্মাদর্শের সঙ্গে কর্মযোগের কোন বিরোধ নেই। অদ্বৈত বেদান্তের আদর্শে প্রতিষ্ঠিত থেকে সাম্রাজ্য চালনাও সম্ভব—স্বামীজীর মতানুসারে আরো ভালো করেই সম্ভব। কারণ, নিরাসক্ত কর্মযোগীই যথার্থ রাজনীতিজ্ঞ হতে পারেন। ব্যক্তি বা দলের কল্যাণের চেয়ে সমগ্র জাতির বা বিশ্বের কল্যাণ তাঁর কাছে তখনই বড়ো হয়ে উঠতে পারে। স্বদেশী যুগের পর বিবেকানন্দের অদ্বৈত বেদান্তের আদর্শ রাজনৈতিক প্রেরণার বিষয় হয়ে উঠেছিল সুভাষচন্দ্রের জীবনে ও রচনাবলীতে। অবশ্য, গান্ধীজীও তাঁর জীবনে বিবেকানন্দের দেশাত্মবোধের প্রেরণার কথা স্বীকার করেছেন। তবে, রাজনৈতিক চিন্তার ক্ষেত্রে শ্রীঅরবিন্দ প্রমুখ বিপ্লবীদের পরে সুভাষচন্দ্রকেই বিবেকানন্দের যথার্থ উত্তরাধিকারী বলা চলে। সর্বস্বত্যাগের আদর্শের সঙ্গে জ্বলন্ত দেশপ্রেম মিলে বিবেকানন্দকে যে অনন্য মহিমা দান করেছে, ভবিষ্যৎ ভারতের পুনর্গঠনের পক্ষে তার উপযোগিতা অপরিসীম।

এই প্রসঙ্গে সাম্প্রতিককালে পুনরালোচিত রবীন্দ্রনাথের একটি পত্রাংশ বিশেষ উল্লেখযোগ্য—"চরকা কাটো—একথার মধ্যে কোন মহৎ অনুশাসন নেই—এই জন্যে এ কথায় পূর্ণভাবে মনুষ্যত্বের উদ্বোধন ঘটায় না। আধুনিক কালে ভারতবর্ষে বিবেকানন্দই একটি মহৎ বাণী প্রচার করেছিলেন, সেটি কোন আচারগত নয়। তিনি দেশের সকলকে ডেকে বলেছিলেন, তোমাদের সকলের মধ্যেই ব্রহ্মের শক্তি,

দরিদ্রের মধ্যে দেবতা তোমাদের সেবা চান্। এই কথাটি যুবকদের চিত্তকে সমগ্রভাবে জাগিয়েছে। তাই এই বাণীর ফল দেশের সেবায় আজ বিচিত্রভাবে বিচিত্র ত্যাগে ফলেচে। তাঁর বাণী মানুষকে যখনি সম্মান দিয়েছে তখনি শক্তি দিয়েছে। সেই শক্তির পথ কেবল এক-ঝোঁকা নয়, তা কোন দৈহিক প্রক্রিয়ার পুনরাবৃত্তির মধ্যে পর্যবসিত নয়, তা মানুষের প্রাণমনকে বিচিত্রভাবে প্রাণবান করেচে। বাংলাদেশের যুবকদের মধ্যে যেসব দুঃসাহসিক অধ্যবসায়ের পরিচয় পাই তার মূলে আছে বিবেকানন্দের সেই বাণী যা মানুষের আত্মাকে ডেকেছে, আঙ্গুলকে নয়। ভয় হয় পাছে আচারের সংকীর্ণ অনুশাসন সেই সংবাদবোধিত তেজকে চাপা দিয়ে ম্লান করে দেয়—কঠিন তপস্যার পক্ষ থেকে যান্ত্রিক আচারের পথে দেশের মনকে ভ্রষ্ট করে।"

[৯ই এপ্রিল, ১৯২৮ তারিখে লেখা]

গান্ধীজীর চরকা-আন্দোলন প্রসঙ্গে একথা বিশেষ ভাবে বলা হলেও ভারতের নবজাগরণে বিবেকানন্দের প্রভাবের যথার্থ মূল্যায়ন হিসাবেই উদ্ধৃত অংশটুকু স্মরণীয়। রবীন্দ্রসাহিত্যে বিবেকানন্দ প্রসঙ্গের স্বল্পতা নিয়ে যাঁরা সমালোচনা করেন, তাঁদের পক্ষে এই ছোট আলোচনাটি বহু মূল্যবান বলেই বিবেচিত হবে।

তাছাড়া, জনশ্রুতি অনুসারে জানাই, রবীন্দ্রনাথ নাকি একটি বড় প্রবন্ধ স্বামিজী-সম্বন্ধে লিখেছিলেন। যে কোন কারণেই হোক লেখাটি আজ অবধি ছাপা হয় নি। এ প্রসঙ্গে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ যদি ভালোভাবে অনুসন্ধান করেন, তাহলে দেশবাসীর কাছে তাঁরা কৃতজ্ঞতাভাজন হবেন। সব জনশ্রুতিই সত্য নয়, কিন্তু এই জনশ্রুতিটির সত্যতায় বিশ্বাসের কারণ আছে। রবীন্দ্রনাথের 'বিবেকানন্দ'-সম্বন্ধে পূর্ণাঙ্গ প্রবন্ধটির অস্তিত্ব সম্বন্ধে যদি কেউ কোন আলোকপাত করতে পারেন, আমরা আনন্দিত হব। আপাতত এ ব্যাপারে আমাদের বক্তব্য আর বিশদ করব না।

বিবেকানন্দের চিন্তাজগতে অদ্বৈতানুভূতিসঞ্জাত যে মানবপ্রেমের উন্মেষ ঘটেছিল, তার ফলেই তিনি একাধারে মানবপ্রেমিক ও মায়ামুক্ত সন্ন্যাসী হয়ে উঠতে পেরেছেন। কিন্তু স্বামীজীর মানবপ্রেমের অর্থ মানুষের অন্নবস্ত্রের সমস্যা থেকে আরম্ভ করে তার অধ্যাত্মসম্ভাবনা অবধি সমগ্র মনুষ্যত্বের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ। কেবলমাত্র ভোগসাম্যকেই তিনি মানবপ্রেমের সীমা বলে মনে করেন নি। যুক্তি ও বুদ্ধির মহিমা স্বীকার করেও শ্রীরামকৃষ্ণ-সান্নিধ্যে থেকে তিনি বুঝেছিলেন, নুনের পুতুলের দ্বারা সমুদ্রের পরিমাপ অসম্ভব। সেই অনন্ত সমুদ্রে মিশে যাওয়াতেই আমাদের অন্তরসত্তার পরম সার্থকতা। অমৃতের সন্তানদের অমৃতের অধিকার ফিরিয়ে দেওয়াই ছিল রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের লক্ষ্য।

তীর্থযাত্রার পথে দেওঘর বৈদ্যনাথধামে এসে গ্রামবাসী মানুষের দারিদ্র্যদর্শনে ব্যথিতহৃদয় শ্রীরামকৃষ্ণ মথুরামোহনকে বলেছিলেন, এদের একমাথা করে তেল, একখানি করে ধুতি দাও, আর পেট ভরে একদিন খাওয়াও। মথুরামোহনের ইতস্ততঃ ভাব দেখে তিনি সেই দরিদ্রদের মধ্যেই গিয়ে বসে রইলেন, যতক্ষণ না মথুরামোহন সেই গরীবদুঃখীদের সেবায় রাজী হন। তীর্থধর্মের চেয়ে দরিদ্রদের সেবা তখন তাঁর হৃদয়ে বড়ো হয়ে উঠেছিল। কিন্তু শম্ভুচরণ মল্লিককে এই শ্রীরামকৃষ্ণই বলেছিলেন, 'যদি ঈশ্বর এসে দেখা দেন, তবে কি তাঁর কাছে হাসপাতাল, ডিস্পেন্সারী এসব চাইবে?' *

* মনে কর ঈশ্বর তোমার সামনে এলেন; এসে বললেন, তুমি বর লও। তাহলে কি তুমি বলবে, আমায় কতকগুলো হাঁসপাতাল, ডিস্পেন্সারী করে দাও; না বলবে, হে ভগবান, তোমার পাদপদ্মে যেন শুদ্ধা ভক্তি হয়, আর যেন তোমাকে আমি সর্বদা দেখতে পাই। হাঁসপাতাল, ডিস্পেন্সারী এ সব অনিত্য বস্তু। ঈশ্বরই বস্তু আর সব অবস্তু।... তাঁকে লাভ হলে তাঁর

তার কারণ, শুদ্ধচিত্ত না হয়ে যথার্থ কর্মযোগের অনুষ্ঠান অসম্ভব। নিষ্কামব্রতের নাম করে নাম যশ অর্থ পদমর্যাদার মোহ যে মানুষকে কতখানি আচ্ছন্ন করে তার উদাহরণ আজকের ভারতবর্ষে যত্র তত্র। নিরাসক্ত শুদ্ধচিত্তের কল্যাণব্রতই যথার্থ সাফল্যলাভ করে। তাই শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে আগে ভগবান লাভ, তারপর জগতের কল্যাণ। কার কল্যাণ এবং কী ধরণের কল্যাণ—এ সম্বন্ধে স্বচ্ছদৃষ্টির অভাবেই জগতে এত মতবাদের উদ্ভব ও বিলয়। বিবেকানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের এই 'জীবসেবা'র সূত্র ধরে নিঃস্বার্থ সেবার ক্রমাগত প্রচেষ্টাকেই সাধনা বলে নির্দেশ করলেন এবং এই সেবাকেই বর্তমানযুগের শ্রেষ্ঠধর্মরূপে ভারতবাসীর সামনে উপস্থিত করলেন।

এক্ষেত্রে সিদ্ধ সাধকের কর্ম ও প্রবর্তক সাধকের কর্মের পার্থক্য যে অনেকখানি সেকথা স্মরণীয়। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের মানবকল্যাণ-ব্রতের সঙ্গে বাম বা দক্ষিণপন্থী সমাজসেবীদের কোন তুলনা চলে না। তবে, সমাজসেবীরা নিজেদের সামর্থ্যানুযায়ী ওই পরমকল্যাণের অভিমুখে যাত্রা করেছেন—এও কম কথা নয়। তাঁরা যে পরিমাণে নিরাসক্ত, সেই পরিমাণে তাঁদের সাধনার সার্থকতা।

প্রতিটি জাতির যেমন স্বাতন্ত্র্য আছে, প্রত্যেক ব্যক্তিরও তেমনি অনন্ত বৈচিত্র্য। সেই এক একটি মানুষের সম্ভাবনা ও প্রয়োজন অনুযায়ী তাকে বিকশিত করে তোলার মতো যোগ্য গুরু পৃথিবীতে ক'জন মেলে? কৃষ্ণ, বুদ্ধ, যীশু, মহম্মদ, শঙ্কর, চৈতন্য, রামকৃষ্ণের মতো লোকশিক্ষকদের আবির্ভাব অবলম্বনে তাই এক একটি যুগের সৃষ্টি হয়। তাঁদের জীবন ও বাণীর মধ্য দিয়ে

ইচ্ছায় অনেক হাঁসপাতাল ডিস্পেন্সারী হতে পারে।...কর্ম আদিকাণ্ড। কর্ম জীবনের উদ্দেশ্য নয়।...ঈশ্বরলাভই জীবনের উদ্দেশ্য। [কথামৃতঃ ১ম ভাগ ১০ম খণ্ড : ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ]

আমরা নিজেদেরই আরো গভীরভাবে উপলব্ধি করতে শিখি। মানবমনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণের ও মহাসত্যে উত্তরণের যে প্রতিভা এঁদের মধ্যে দেখা যায়, তারই ফলে মানুষ ভগবৎকল্প বা অবতারপুরুষ বলে মনে করে। অন্তরের আলো এমনি এক একটি মানবদেহের বাতায়নপথে বিশ্বহৃদয়কে স্পর্শ করে। সেই পথেই বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ অবতার।

জীবনশিল্পী শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে স্বামীজির একটি মন্তব্য এক্ষেত্রে প্রণিধেয়—"মনের বাইরের জড়শক্তিগুলিকে কোন উপায়ে আয়ত্ত ক'রে কোন একটা অদ্ভুত ব্যাপার দেখান বড় বেশী কথা নয়—কিন্তু এই যে পাগলা বামুন লোকের মনগুলোকে কাদার তালের মতো হাতে নিয়ে ভাঙ্গত, পিটত, গড়ত, স্পর্শমাত্রেই নূতন ছাঁচে ফেলে নূতন ভাবে পূর্ণ করত, এর চেয়ে বড়ো আশ্চর্য ব্যাপার (miracle) আমি আর কিছুই দেখি না।"* বাস্তবিক, শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্যমণ্ডলীর যে কোন একজনের জীবনেতিহাসই এই আশ্চর্য ব্যাপারের সাক্ষী, সবচেয়ে বড় সাক্ষী বিবেকানন্দ নিজে।

নরেন্দ্রনাথের প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণের সমস্ত ভালবাসার কথা মনে রেখেও ভবিষ্যৎ বিশ্বনেতৃত্বের উপযুক্তভাবে প্রিয়শিষ্যকে গড়ে তোলার জন্য তাঁর শাসন ও সতর্কতার কথা ভুলে গেলে চলবে না। উত্তর-জীবনে সন্ন্যাসী হবেন বলে শিষ্যদের মধ্যে কয়েকজনকে তিনি বেছেই নিয়েছিলেন। গুরু তোতাপুরীর কাছে আনুষ্ঠানিক সন্ন্যাস গ্রহণ করলেও শ্রীরামকৃষ্ণ বাইরে গেরুয়া পরতেন না। কিন্তু বাইরের গৃহীবৎ আচরণ সত্ত্বেও তিনি অন্তরে অন্তরে অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসী—তা না হলে তোতাপুরীর কাছে বেদান্তসাধনার কোন অর্থ থাকে না। বুদ্ধ, শঙ্কর, চৈতন্যের কঠোর বৈরাগ্য ও অসঙ্গ

* লীলাপ্রসঙ্গ : 'দিব্যভাব ও নরেন্দ্রনাথ।

সাধনার তিনি উত্তরাধিকারী এবং তাঁদেরই মতো মানবমুক্তির ব্রত উদ্‌যাপক।

অথচ পূর্বগামীদের মতো বহিঃসন্ন্যাসে নয়—তারো উর্ধ্বে সংসারের পরিমণ্ডলেও সদা ব্রহ্মতন্ময় থেকে যথার্থ সন্ন্যাসের আদর্শ স্থাপয়িতা। বৈরাগ্য যে তাঁকে সংসারের খুঁটিনাটি কর্তব্যবিমুখ করে নি, তাঁর অপূর্ব দাম্পত্যজীবনই তার সবচেয়ে বড়ো প্রমাণ। তবু ভগবানলাভের জন্য অথবা ব্রহ্মোপলব্ধির জন্য সর্বস্বত্যাগী গৈরিকধারী সন্ন্যাসীর দলও তিনিই সৃষ্টি করে গেছেন। কাশীপুরের উদ্যানবাটিতে তাঁর নির্দেশে বুড়োগোপাল (পরে স্বামী অদ্বৈতানন্দ) শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবী সন্ন্যাসী সন্তানদের গৈরিকবাস উপহার দিয়েছিলেন। সবচেয়ে আশ্চর্য, শ্রীরামকৃষ্ণের ইচ্ছায় ভক্তশ্রেষ্ঠ গিরিশচন্দ্রকেও একখানি গৈরিকবস্ত্র দেওয়া হয়েছিল। গিরিশচন্দ্র অবশ্য পরবর্তীকালে সারদাদেবীর কাছে সন্ন্যাসের অনুমতি প্রার্থনা করে বিফল হয়েছিলেন। কিন্তু এই পরম ভক্তের হৃদয় যে অনুরাগের রঙে রাঙা হয়ে উঠেছিল, তাতে সন্দেহ নেই।

সংসারের মধ্যে থেকেই সন্ন্যাসের যে চরম আদর্শ গিরিশগুরু শ্রীরামকৃষ্ণ দেখিয়ে গেছেন, জগতের ইতিহাসে তার তুলনা মেলে কই? তবু, নবযুগের নরসন্ন্যাসের তিনি প্রবর্তক। কাজলের ঘরে থেকে তাঁর মতো নিষ্কলঙ্ক হওয়া সম্ভব নয় সকলের পক্ষে। 'জনক রাজা' পৃথিবীর ইতিহাসে এক আধজন। তাই সত্য-সন্ধানে সন্ন্যাসের একান্ত প্রয়োজন। শ্রীরামকৃষ্ণ সংসার ও সন্ন্যাস—এ দুয়েরই উর্ধ্বে —অথচ এ দুয়েরই পরম আদর্শ।

শঙ্করের প্রজ্ঞা, বুদ্ধের হৃদয় ও চৈতন্যের প্রেম—শ্রীরামকৃষ্ণ-মানসে এ তিনের একত্র সম্মেলন প্রত্যক্ষ করেছেন বিবেকানন্দ। শ্রীরামকৃষ্ণ-সাধনার এই অপূর্ব সামঞ্জস্যের সার্থক উত্তরাধিকারীও স্বয়ং বিবেকানন্দ। বেদান্তের অদ্বৈতোপলব্ধিকে এমন হৃদয়ধর্মে রূপান্তরিত

করতে পেরেছেন বলেই সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ নিখিলমানবের নিকটতম আত্মীয়। তাই প্রেমিক বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে "বহুরূপে সম্মুখে তোমার।"

সর্বভূতে ঈশ্বরদর্শনের এই পরম সিদ্ধির বলে বিবেকানন্দ যে ব্রহ্ম-বিহার করেছিলেন তার মূল কেন্দ্রটি কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ—তাঁর "গুরু", "আচার্য", "জীবনের আদর্শ", "ইষ্ট", এবং "প্রাণের দেবতা।"

বিবেকানন্দের শ্রীরামকৃষ্ণ-উপলব্ধির দুটি প্রান্ত—একদিকে, তিনি গুরু, ইষ্ট, অবতার—অন্যদিকে বেদান্তের নির্বিকল্প সমাধির পারে ব্রহ্মস্বরূপ। "গাই গীত শুনাতে তোমায়" কবিতাটিতে স্বামীজী তাঁর শ্রীরামকৃষ্ণ-উপলব্ধির এই দ্বৈত থেকে অদ্বৈত যাত্রার রূপান্তর পর্বটি ফুটিয়ে তুলেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের অবতারসত্তা সম্বন্ধে শুধু নরেন্দ্রনাথ নয়, অন্যান্য গুরু-ভাইদের মনেও সংশয় ও বিশ্বাসের ছায়া-রৌদ্র খেলা চলতো। ফলে, নরেন্দ্রনাথের মতোই তাঁরাও গুরুকে নানাভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে নিতেন। স্বামী সারদানন্দজীর সাক্ষ্য অনুযায়ী—"ঠাকুর প্রতিবারই কিন্তু সে সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া যেন ব্যঙ্গ করিয়া আমাদের বলিতেন, "এখনও অবিশ্বাস! বিশ্বাস কর্—পাকা ক'রে ধর্—যে রাম যে কৃষ্ণ হয়েছিল, সেই ইদানীং (নিজের শরীরটি দেখাইয়া) এ খোলটার ভিতর—তবে এবার গুপ্তভাবে আসা! যেমন রাজার ছদ্মবেশে নিজরাজ্য পরিদর্শন! যেমনি জানাজানি কানাকানি হয় অমনি সে সেখান থেকে সরে পড়ে—সেই রকম।"

[শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ]

শেষশয্যায় শয়ান শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রনাথের মৌন সংশয়ের উত্তরে যা বলেছিলেন, পরবর্তী জীবনে স্বামীজী সে কথা এইভাবে তাঁর শিষ্য শরৎচন্দ্র চক্রবর্তীকে জানিয়েছিলেন—"তিনি যখন কাশীপুরের বাগানে—যখন শরীর যায় যায় তখন আমি তাঁর বিছানার পাশে

একদিন মনে মনে ভাবছি, এই সময় যদি বলতে পার 'আমি ভগবান' তবে বিশ্বাস করব, 'তুমি সত্য সত্যই ভগবান।' তখন শরীর যাবার দুইদিন মাত্র বাকী। ঠাকুর তখন হঠাৎ আমার দিকে চেয়ে বললেন, 'যে রাম, যে কৃষ্ণ,—সেই ইদানীং এ শরীরে রামকৃষ্ণ—তোর বেদান্তের দিক দিয়ে নয়।' আমি শুনে অবাক হয়ে রইলুম।"

[স্বামি-শিষ্য-সংবাদ : উত্তরকাণ্ড : ৭ম বল্লী]

'বেদান্তের দিক দিয়ে নয়'—এই কথাটির মধ্যে অদ্বৈতবাদী চিন্তাধারার চরম কথা আভাসে প্রকাশিত। লীলার বিচারে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ দুই দেহ হলেও নিত্যের দিক থেকে তাঁরা এক অভেদসত্তা।

লীলাময় শ্রীরামকৃষ্ণকে বিবেকানন্দ তাঁর প্রণাম জানিয়েছেন নানা-ভাবে। সংস্কৃত, বাংলা ও ইংরেজী কবিতায়, গানে, বক্তৃতা-প্রবন্ধ-আলাপচারীতে এবং পত্রাবলীতে তাঁর শ্রীরামকৃষ্ণময় সত্তার নানা প্রকাশ থেকে কিছু উদাহরণ পাঠকদের উপহার দিই—

(ক) 'যে রাম যে কৃষ্ণ সেই ইদানীং রামকৃষ্ণ'—কথাটির সংস্কৃত স্তবরূপ—

আচণ্ডালাপ্রতিহতরয়ো যস্য প্রেমপ্রবাহঃ
লোকাতীতোঽপ্যহহ ন জহৌ লোককল্যাণমার্গম্।
ত্রৈলোক্যেঽপ্যপ্রতিম মহিমা জানকীপ্রাণবন্ধঃ
ভক্ত্যা জ্ঞানং বৃতবরবপু সীতয়া যো হি রামঃ॥
স্তব্ধীকৃত্য প্রলয়কলিতং বাহবোত্থং মহান্তং
হিত্বা রাত্রিং প্রকৃতিসহজামন্ধতামিস্রমিশ্রাম্।
গীতং শান্তং মধুরমপি যঃ সিংহনাদং জগর্জ
সোঽয়ং জাতঃ প্রথিতপুরুষো রামকৃষ্ণস্ত্বিদানীম্॥

আচণ্ডাল সর্বজনের প্রতি অপ্রতিহত বেগে প্রবাহিত যাঁর প্রেমধারা, স্বয়ং অলৌকিক-স্বভাব হয়েও যিনি লোককল্যাণের পথ কখনো ত্যাগ করেন নি, স্বর্গ মর্ত্য পাতাল—এই তিন লোকেই যাঁর মহিমার তুলনা

নেই, যিনি ভক্তির সঙ্গে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানের কল্যাণমূর্তি ধারণ করেছিলেন, যিনি সীতার প্রাণ স্বরূপ ;

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময় যে প্রলয়তুল্য হুঙ্কার উঠেছিল, তাকে স্তব্ধ করে এবং (অর্জুনের) ঘোর তামসিকতারূপ অজ্ঞানরজনীকে দূর করে মধুর শান্ত গীতা যিনি সিংহনাদে শুনিয়েছিলেন—সেই প্রখ্যাত পুরুষই ইদানীং রামকৃষ্ণরূপে জাত।

(খ) নবগোপাল ঘোষের বাড়ীতে শ্রীরামকৃষ্ণ প্রতিচ্ছবি প্রতিষ্ঠা-কালে রচিত তাঁর প্রণামমন্ত্র—

স্থাপকায় চ ধর্মস্য সর্বধর্মস্বরূপিণে
অবতারবরিষ্ঠায় রামকৃষ্ণায় তে নমঃ ॥

(গ) প্রভু তুমি, প্রাণ সখা তুমি মোর।
কভু দেখি আমি তুমি, তুমি আমি।
বাণী তুমি, বীণাপাণি কণ্ঠে মোর…

[গাই গীত শুনাতে তোমায়]

(ঘ) তুমি আছ মায়ের গানে
যা শুনে
কোলের শিশু ঘুমিয়ে পড়ে মায়ের কোলে,
তুমি আছ শিশুর হাসিতে ও খেলায়,
দাঁড়িয়ে থাকো তাদের মাঝে আলো ক'রে।
পবিত্রহৃদয় বন্ধুরা যখন মিলিত হয়
তাদেরও মাঝে দাঁড়িয়ে থাকো তুমি।
সুধা ঢেলে দাও তুমি মায়ের চুমোয়,
সুর দাও শিশুর মা মা ডাকে।
প্রাচীন ঋষির তুমি ভগবান,
সকল মতের তুমি চিরন্তন উৎস,
বেদ বাইবেল আর কোরাণ গাইছে

তোমারি নাম উচ্চকণ্ঠে—সমস্বরে।
আছ, আছ, তুমি আছ,
ধাবমান জীবনে তুমি আত্মার আত্মা,
ওঁ তৎ সৎ ওঁ—আমার ঈশ্বর তুমি,
প্রিয় আমার, আমি তোমার, আমি তোমারি।

(ঙ) "এই মহামানব ছিলেন ত্যাগের সাকার বিগ্রহ। আমাদের দেশে সন্ন্যাসীদের সমস্ত ধন, ঐশ্বর্য মানসম্ভ্রম ত্যাগ করতে হয়। আমার গুরুদেব এই আদর্শ অক্ষরে অক্ষরে কাজে পরিণত করেছিলেন। কাঞ্চন তিনি স্পর্শও করতেন না। কাঞ্চন ত্যাগের আদর্শ তাঁর স্নায়ুগুলীর উপর এতটা প্রভাব বিস্তার করেছিল যে, ঘুমন্ত অবস্থাতেও তাঁর শরীরে কোন ধাতুদ্রব্য ছোঁয়ালে তাঁর মাংসপেশী সঙ্কুচিত হয়ে যেত এবং তাঁর শরীরই যেন ঐ ধাতুদ্রব্য ছুঁতে অস্বীকার করত। এমন অনেকে ছিল, যাদের কাছ থেকে তিনি কিছু গ্রহণ করলে তারা কৃতার্থ হয়ে যেত, যারা সানন্দে তাঁর জন্য হাজার হাজার টাকা খরচ করতে রাজী ছিল, তবু তিনি এইসব লোকের কাছ থেকে দূরে সরে থাকতেন। কামকাঞ্চন জয়ের পরিপূর্ণ আদর্শ ছিলেন তিনি; কামকাঞ্চনের বিন্দুমাত্র প্রভাব তাঁর মধ্যে ছিল না। বর্তমান শতাব্দীতে এমন একজন মানুষের একান্ত প্রয়োজন ছিল। আজকাল লোকে যে সব জিনিসকে 'প্রয়োজনীয়' মনে করে—আর এই 'প্রয়োজনে'র মাত্রা যখন অতিরিক্ত বেড়ে চলেছে, এমন সময়েই এই ত্যাগের দরকার ছিল। বর্তমানে এমন একজন লোকের

চিকাগো বক্তৃতার আগে ৩০শে আগষ্ট, ১৮৯৩ তারিখে লিখিত অধ্যাপক রাইটকে লেখার চিঠির সঙ্গে প্রেরিত কবিতার শেষ অংশ। অনুবাদক: শঙ্করীপ্রসাদ বসু। দ্রষ্টব্য: Swami Vivekananda In America: New Discoveries: Marie Lousie Burke.

প্রয়োজন, যিনি জগতের অধিবাসীদের কাছে প্রমাণ করতে পারেন যে, এখনও এমন মানুষ আছেন, যিনি সংসারের ধনরত্ন মানযশের বিন্দুমাত্র প্রত্যাশী নন।" [মদীয় আচার্যদেব]

(চ) বঞ্চন কামকাঞ্চন ; অতিনিন্দিত ইন্দ্রিয় রাগ।
ত্যাগীশ্বর, হে নরবর, দেহ পদে অনুরাগ॥
নির্ভয়, গতসংশয়, দৃঢ়নিশ্চয় মানসবান।
নিষ্কারণ-ভকত-শরণ, ত্যজি জাতিকুলমান॥
সম্পদ তব শ্রীপদ ভব গোষ্পদ বারি যথায়।
প্রেমার্পণ, সমদরশন, জগজন দুখ যায়॥
নমো নমো প্রভু বাক্যমনাতীত
মনোবচনৈকাধার,
জ্যোতির জ্যোতি উজল হৃদিকন্দর
তুমি তমভঞ্জন হার॥

[শ্রীরামকৃষ্ণ আরাত্রিক]

(ছ) "যতই যা হোক, জো, আমি এখন সেই আগেকার বালক বই আর কেউ নই, যে দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটীর তলায় রামকৃষ্ণের অপূর্ব বাণী অবাক হয়ে শুনত আর বিভোর হয়ে যেত। ঐ বালক ভাবটাই হচ্ছে আমার আসল প্রকৃতি—আর কাজকর্ম, পরোপকার ইত্যাদি যা কিছু করা গেছে, তা ঐ প্রকৃতিরই উপরে কিছুকালের জন্য আরোপিত একটা উপাধি মাত্র। আহা, আবার তাঁর সেই মধুর বাণী শুনতে পাচ্ছি—সেই চিরপরিচিত কণ্ঠস্বর! যাতে আমার প্রাণের ভিতরটা পর্যন্ত কণ্টকিত ক'রে তুলছে! বন্ধন সব খসে যাচ্ছে, মানুষের মায়া উড়ে যাচ্ছে, কাজকর্ম বিস্বাদ বোধ হচ্ছে। জীবনের প্রতি আকর্ষণও কোথায় সরে দাঁড়িয়েছে। রয়েছে কেবল তার স্থলে প্রভুর সেই মধুর গম্ভীর আহ্বান!—যাই, প্রভু, যাই! ঐ

তিনি বলছেন, 'মৃতের সৎকার মৃতেরা করুক,' তুই আমার পিছু পিছু চলে আয়।'—যাই, প্রভু, যাই!"

[শ্রীমতি জোসেফাইন ম্যাক্লিয়ডকে লেখা পত্রাংশ, ৮ই এপ্রিল, ১৯০০]

উক্তিনিচয়ের মধ্যে স্বামীজীর প্রণাম-মন্ত্রটি উল্লেখযোগ্য। তাঁর দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ ধর্মসংস্থাপক। 'ভাববার কথা'র 'হিন্দুধর্ম ও শ্রীরামকৃষ্ণ' প্রবন্ধটিতে স্বামীজী শ্রীরামকৃষ্ণের এই ধর্ম-সংস্থাপনকারী স্বরূপের ব্যাখ্যা করেছেন—"...কালবশে সদাচারভ্রষ্ট, বৈরাগ্যবিহীন, একমাত্র লোকাচারনিষ্ঠ ও ক্ষীণবুদ্ধি আর্যসন্তান এই সকল ভাববিশেষের বিশেষ শিক্ষার জন্য আপাত প্রতিযোগীর ন্যায় অবস্থিত ও অল্পবুদ্ধি মানবের স্থূল ও বহুবিস্তৃত ভাষায় স্থূলভাবে বৈদান্তিক সূক্ষ্মতত্ত্বের প্রচারকারী পুরাণাদি তন্ত্রেরও মর্মগ্রহণে অসমর্থ হইয়া, অনন্তভাবসমষ্টি অখণ্ড সনাতনধর্মকে বহুখণ্ডে বিভক্ত করিয়া, সাম্প্রদায়িক ঈর্ষা ও ক্রোধ প্রজ্বলিত করিয়া তন্মধ্যে পরস্পরকে আহুতি দিবার জন্য সতত চেষ্টিত থাকিয়া যখন এই ধর্মভূমি ভারতবর্ষকে প্রায় নরকভূমিতে পরিণত করিয়াছেন—তখন আর্যজাতির প্রকৃত ধর্ম কি এবং সতত বিবদমান আপাত-প্রতীয়মান বহুধা-বিভক্ত, সর্বথা-প্রতিযোগী, আচারসঙ্কুল সম্প্রদায়ে আচ্ছন্ন স্বদেশীর ভ্রান্তিকর ও বিদেশীর ঘৃণাস্পদ হিন্দুধর্ম নামক যুগ-যুগান্তর ব্যাপী বিখণ্ডিত ও দেশকালযোগে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ধর্মখণ্ডসমষ্টির মধ্যে যথার্থ একতা কোথায়—এবং কালবশে নষ্ট এই সনাতনধর্মের সার্বলৌকিক, সার্বকালিক, ও সার্বদৈশিক স্বরূপ স্বীয় জীবনে নিহিত করিয়া, লোকসমক্ষে সনাতন ধর্মের জীবন্ত উদাহরণস্বরূপ আপনাকে প্রদর্শন করিতে লোকহিতের জন্য শ্রীভগবান রামকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছেন।"

[বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃ৫]

শ্রীরামকৃষ্ণ-আবির্ভাবের সার্থকতা তাই বিশেষ কোন সম্প্রদায়-স্থাপনে নয়, বরং ধর্মচর্চার নিজস্ব সার্থকতা কী সেকথা যারা ভুলে

যেতে বসেছিল, তাদের প্রবুদ্ধ করা উপলক্ষ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ জগতের কাছে ভারতের চিরন্তন সাধনার বাণীকে আবার নূতন করে প্রতিষ্ঠিত করলেন। সেইসঙ্গে একথাও বলা যায়, সমগ্র বিশ্বের যে যেখানে অন্তর দিয়ে ভগবানকে ডেকেছে, তারই সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ-বাণীর মিল। এই অর্থেই তিনি সর্বধর্মস্বরূপ।

কিন্তু প্রশ্ন ওঠে 'অবতারবরিষ্ঠ' কথাটি নিয়ে। 'মদ্‌গুরু শ্রীজগদ্‌গুরু' —একথা প্রত্যেকের কাছেই সত্য। তাই বলে বিবেকানন্দ যখন নিজের গুরুকে 'অবতারবরিষ্ঠ' বলেন, তখন ভক্তির আতিশয্য বা গোঁড়ামি বলে কারু মনে হতে পারে। এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে, পূর্ব পূর্ব অবতারের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যগুলির একটি সমন্বিতরূপ —জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম ও যোগের সমন্বয় শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে অনুভব করেছিলেন বলেই স্বামীজী তাঁকে 'অবতারবরিষ্ঠ' বলেছেন। অন্যদিক থেকে বলা যায়, শ্রীরামকৃষ্ণ সাধনায় পূর্বগামী সব সাধনার ধারা এসে মিলেছে—এদিক থেকেও 'অবতারবরিষ্ঠ' বিশেষণটি গ্রহণীয়।

বলা বাহুল্য, অবতারত্বে যাঁরা স্বীকার করেন না, তাঁদের পক্ষে এ বিষয়ে মাথাঘামানো নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু সাধনা ও সিদ্ধির ব্যাপকতা ও গভীরতা এবং সাধনলব্ধ জ্ঞানের পরমসুন্দর প্রকাশে শ্রীরামকৃষ্ণ যে জগতের সাধকগোষ্ঠীর ইতিহাসে শ্রেষ্ঠতমদের অন্যতম —একথা তাঁরাও স্বীকার করবেন।

শ্রীরামকৃষ্ণমহিমার অনন্য প্রমাণ বিবেকানন্দ স্বয়ং। যে বিপুল জীবনতরঙ্গ শ্রীরামকৃষ্ণচরণ স্পর্শ করে সমগ্র ভারতবর্ষ ও পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়েছিল, তার প্রতিটি অণুপরমাণু শ্রীরামকৃষ্ণময়। অথচ, বিবেকানন্দও শ্রীরামকৃষ্ণমহিমার একটি দিক মাত্র। দেবী সারদামণি, স্বামী ব্রহ্মানন্দ, নাট্যকার গিরিশচন্দ্র—এমন মহাজীবন থেকে আরম্ভ করে কত শত জীবনদীপ শ্রীরামকৃষ্ণ আমাদের মানসবিশ্বে

চির উজ্জ্বল শিখায় প্রজ্জ্বলিত রেখে গেছেন, তার সীমাসংখ্যা নেই। আধুনিক সমালোচকদের কেউ কেউ মনে করেন, ম্যাক্সমূলার ও রমঁ্যা রলঁ্যাকে অনেক বলে কয়ে রামকৃষ্ণমহিমা গাওয়ানো হয়েছিল। তাঁদের স্বাভাবিক বুদ্ধিতে এ কথাটা আসে না যে, লোকের অনুরোধে পড়ে অমন শ্রদ্ধা ও অনুভূতিদীপ্ত জীবনী কখনো লেখা যায় না। তাছাড়া, ম্যাক্সমূলার ও রমঁ্যা রলঁ্যা-র জীবনীরচনার ইতিহাস এমন কিছু অতীতের ব্যাপার নয়, চেষ্টা করলেই তা জানা যায়। সে চেষ্টা করলেই দেখা যাবে যে ভারতাত্মার স্বরূপ আবিষ্কার করতে গিয়েই এ দুই মহামনীষী রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। ভারতবর্ষের আরো অনেক কিছু নিয়ে এঁরা আলোচনা করেছেন—কিন্তু সেগুলি কাদের আবেদন নিবেদনে?

শ্রীরামকৃষ্ণ-আরাত্রিক থেকে যে অংশটুকু উদ্ধৃতি করেছি, তাতে সংহত বিশেষণের মালায় শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবন ও আদর্শের প্রতি ভক্ত বিবেকানন্দের অপরিসীম শ্রদ্ধানিবেদনের সঙ্গে লক্ষণীয়, শেষ অবধি স্বামীজী শ্রীরামকৃষ্ণকে 'বাক্যমনাতীত' বলেছেন। শিষ্যদের কাছে সাধন অবস্থায় বর্ণনা করতে গিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ শেষ অবধি কথায় সব প্রকাশ করতে পারতেন না। 'কণ্ঠ' অবধি এসেই মন সমাধিতে লীন হয়ে যেত। শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের কাছে এই 'অবাঙমনসোগোচরম্' মহাসত্যের প্রতীক। কালী থেকে ব্রহ্ম অবধি যেমন শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনপরম্পরা—বিবেকানন্দের কাছে তেমনি রামকৃষ্ণ থেকে ব্রহ্মানুভূতি—ব্যক্তি থেকে নির্বিশেষ সত্যে উত্তরণ। আর এ দু'জনের মাঝখানে অমৃতসেতু—'মহাশক্তি কালী মৃত্যুরূপা—মাতৃভাবে তাঁরি আগমন।'

'গাই গীত শুনাতে তোমায়' কবিতাটি বিবেকানন্দের অন্তর্লোকে শ্রীরামকৃষ্ণ-তাৎপর্যের অভিনব কাব্যরূপ। অখণ্ড কবিতা হিসাবে এতে তত্ত্বের গুরুভার কাব্যের সহজধর্মকে আচ্ছন্ন করেছে—কিন্তু

রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের অদ্বয়সত্তার উপলব্ধির জন্য এ কবিতাটি বিশেষভাবে অভিনিবেশযোগ্য।

বিশ্বনাথ দত্ত ও ভুবনেশ্বরীর 'বিলে' দক্ষিণেশ্বরে এসে নবজন্ম লাভ করলেন শ্রীরামকৃষ্ণ-স্পর্শে। দক্ষিণেশ্বরের সেই কথামৃতময় দিনগুলি তাঁর সারাজীবনের সম্বল ও প্রেরণা। শ্রীরামকৃষ্ণের অপার স্নেহরসে অভিষিক্ত বালক নরেন্দ্রনাথ। তাঁর সেই বালক সত্তাটি চিরদিন জেগেছিল বিশ্ববিজয়ীর সত্তার অন্তরালে।

[শ্রীমতী ম্যাকলিয়ডকে লেখা পত্রাংশ স্মরণীয়]

প্রথম সাক্ষাতের দিনটিতে গানের ভিতর দিয়ে দুজনের পরিচয়। তারপর জীবনে কত গান গাওয়া হল। বিবেকানন্দের সব গান সব বাণী—সে তো "তোমাকে"ই শোনাবার জন্য। বিবেকানন্দের সমস্ত জীবনের সার্থকতা ওই একটি চরণে—"গাই গীত শুনাতে তোমায়।"

গাই গীত শুনাতে তোমায়,
ভাল মন্দ নাহি গণি,
নাহি গণি লোকনিন্দাযশকথা।
দাস তোমা দোঁহাকার,
সশক্তিক নমি তব পদে।
আছ তুমি পিছে দাঁড়াইয়ে,
তাই ফিরে দেখি তব হাসিমুখ।
ফিরে ফিরে গাই, কারে না ডরাই,
জন্ম মৃত্যু মোর পদতলে!
দাস তব জনমে জনমে দয়ানিধে!
তব গতি নাহি জানি—
মম গতি—তাহাও না জানি।
কেবা চায় জানিবারে?

ভুক্তি মুক্তি ভক্তি আদি যত,
জপ-তপ-সাধন-ভজন,
আজ্ঞা তব দিয়েছি তাড়ায়ে ;
আছে মাত্র জানাজানি আশ,
তাও প্রভু কর পার।

গৈরিশ ছন্দের আকারে এ কবিতা আসলে স্বামীজীর আত্মগত চিন্তার প্রকাশ। ব্যক্তি শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর জীবনদেবতা। শুধু শ্রীরামকৃষ্ণ নয়, সারদামণিও সেই সঙ্গে—তাই 'সশক্তিক নমি তব পদে।'

নিখিলবিশ্বের সত্য তাঁর অন্তরে শ্রীরামকৃষ্ণরূপে আবির্ভূত। আবার শ্রীরামকৃষ্ণই তাঁকে ব্যক্তিগত মুক্তির আদর্শে আবদ্ধ থাকতে দেন নি—সমগ্র মানবজাতির সেবায় তাঁর সাধনফল অর্পণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। তবু তো পরম সত্যের উদ্দেশে বিবেকের অন্বেষণ জেগে থাকে অন্তরে, সেই জানার আকাঙ্ক্ষা থেকে উত্তরণই আজ নরেন্দ্রনাথের প্রার্থনা। 'জানা'র জগতে যাত্রারম্ভ—'হওয়া'তে পরিপূর্ণতা। ভক্ত-ভগবানের দ্বৈত ও বিশিষ্টাদ্বৈত ভূমি থেকে 'অদ্বৈতে' উত্তরণ—এই স্তরপরম্পরা 'গাই গীত শুনাতে তোমায়' কবিতায় ধীরে ধীরে ফুটে উঠেছে।

তারই মধ্যে একদিন বিচ্ছেদের ক্ষণিক আভাস ভক্ত ভগবানের চিরন্তন সম্বন্ধকে শতগুণে সমুজ্জ্বল করে তুলেছিল—পওহারীবাবার সেই কাহিনীও এ কবিতায় ছায়াপাত করেছে।

"পুত্র তব, অন্য কে সহিবে প্রগল্‌ভতা ?" তখনই আবার প্রাণের গভীরে তাঁকে মনে হয়েছে 'প্রাণসখা', 'বাণী', 'বীণাপাণি কণ্ঠে মোর।' ভক্ত-ভগবানের মিলনসেতু পার হয়ে ভেসে এসেছে অদ্বৈতোপলব্ধির অনাহত ধ্বনি—

'আমি আদি কবি,
মম শক্তি বিকাশ রচনা

জড় জীব আদি যত
আমি করি খেলা শক্তিরূপা মম মায়া সনে
একা আমি হই বহু দেখিতে আপন রূপ।'

বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে হিন্দুধর্মের দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য আলোচনাপ্রসঙ্গে স্বামীজীর একটি মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য—"তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, বুদ্ধ কি আত্মাকে অসত্য (Unreal) এবং বহুকে সত্য (Real) বলে প্রচার করতেন; আর হিন্দুরা কি বহুকে অসত্য ও এককে সত্য বলে মনে করেন?" স্বামীজী বললেন, "হ্যাঁ, আর এই সঙ্গে রামকৃষ্ণপরমহংস ও আমি এই যোগ করেছি যে, বহু এবং এক বিভিন্ন সময়ে ও বিভিন্ন স্তরে একই মনের দ্বারা উপলব্ধ সেই এক সত্য।"

বিভিন্ন সময়ে ও স্তরে একই মন ক্রমোন্নতির ধাপে ধাপে ক্ষুদ্র সত্য থেকে মহান ও মহত্তর সত্যে কেমন করে উত্তীর্ণ হয় তার একটু আভাস আমরা 'গাই গীত শুনাতে তোমায়' কবিতাটিতে পাই। ব্যক্তি শ্রীরামকৃষ্ণ ক্রমে বিশ্বাত্মায় পরিণত হয়ে দ্বৈত বিশিষ্টাদ্বৈত অদ্বৈতের যোগসূত্র স্থাপন করেছেন—বিবেকানন্দ-দর্শন তারই পরিণত ফল।

অদ্বৈত-আশ্রম কর্তৃক ইংরেজীতে প্রকাশিত বিবেকানন্দ-রচনাবলীর প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় ভগিনী নিবেদিতা বিশ্ব-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিবেকানন্দের নিজস্ব দানের বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে লিখেছেন—"একথা অবিস্মরণীয় যে, স্বামী বিবেকানন্দই সর্ব বস্তুতে একাত্মবোধসহ অদ্বৈতবাদের সর্বোচ্চ মহিমা ঘোষণা করে তার সঙ্গে এই তত্ত্বটিও যোগ করেন যে, হিন্দুধর্মের দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও অদ্বৈত একই বিকাশের তিনটি পর্যায় মাত্র—অদ্বৈতই এর লক্ষ্যস্থল।
…এই উপলব্ধিই আমাদের গুরুদেবের জীবনে পরম তাৎপর্য আরোপ করেছে। কারণ, এক্ষেত্রে তিনি শুধু প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের নয়, অতীত

ও ভবিষ্যতের মিলনতীর্থে পরিণত। বহু ও এক যদি সত্যই এক সত্তা হয়ে থাকে, তবে শুধু সব ধরণের সাধনাই নয়, সব ধরণের কাজ, সব প্রচেষ্টা ও সৃষ্টিই উপলব্ধির বিভিন্ন পন্থা।

এর পর থেকে লৌকিক ও আধ্যাত্মিকের মধ্যে কোন পার্থক্যই রইল না। পরিশ্রমই প্রার্থনা। জয়ই ত্যাগ। জীবনই ধর্ম। গ্রহণ ও আসক্তি বর্জন ও ত্যাগের মতোই কঠোর দায়িত্ব।

এই উপলব্ধিই বিবেকানন্দকে কর্মযোগের মহান প্রচারকে পরিণত করেছে—যে কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তি-বিরহিত নয়, বরং জ্ঞান ও ভক্তির প্রকাশক। তাঁর কাছে সন্ন্যাসীর কুঠরী বা মন্দিরের দুয়ারের মতো কারখানা, পাঠকক্ষ, খেত-খামার প্রভৃতিও মানব ও ভগবানের মিলনক্ষেত্র হিসাবে সমান সত্য ও সার্থক পরিবেশ। মানুষের সেবায় ও ভগবানের উপাসনায়, বিশ্বাসে ও পুরুষাকারে, সততা ও আধ্যাত্মিকতায় তাঁর কাছে কোন পার্থক্য নেই। এক হিসাবে তাঁর সব কথাই এই মূল প্রত্যয়ের ভাষ্যমাত্র।”

ব্যক্তির সাধনাকে বিশ্বের মুক্তিতে পরিণত করার এ প্রেরণাও বিবেকানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের কাছেই পেয়েছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণে যা ধ্যান ও অনুভূতিতে নিবদ্ধ, বিবেকানন্দে তারই কর্মমুখর চলমান জীবনপ্রবাহ।

বিবেকানন্দ ভাগীরথীর উৎসগোমুখী হিমগিরি শ্রীরামকৃষ্ণ, যিনি অবতার, যিনি ব্যক্তিরূপে বিশিষ্ট; আর পরিণতির মহাসমুদ্র সেই শ্রীরামকৃষ্ণ, যিনি অনাদি অনন্ত কারণবারিধি, নির্বিশেষ ব্রহ্মস্বরূপ। ভক্তি ও জ্ঞান, কর্ম ও যোগ—এই পিতাপুত্র ও গুরুশিষ্যের হৃদয়সম্বন্ধে চিরকালের মতো ভারতাত্মার পটভূমিতে বিধৃত।

বিবেকানন্দের ধ্যানদৃষ্টিতে আগামী পনেরো শত বৎসর পৃথিবীতে এই ভাবধারার প্লাবন চলবে।

অপূর্ব গৃহী

গৃহী, না সন্ন্যাসী ?

কি ছিলেন তিনি ?

শ্রীরামকৃষ্ণসাধনাকে অবলম্বন ক'রে দেশে দেশান্তরে মঠ ও মিশন, আশ্রম, সোসাইটি, মন্দির, বেদান্ত-সেণ্টার, হাসপাতাল সেবা-প্রতিষ্ঠান, শিশুমঙ্গল মাতৃমঙ্গল—এমন কত শত প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে, উঠবে। এ সব কেন্দ্রই সাধারণতঃ সন্ন্যাসী বা চিরকুমারদের উদ্যোগে পরিচালিত। যাঁরা সংসারজীবনে স্ত্রী পুত্র কন্যা আত্মীয়-স্বজন নিয়ে থাকেন, তাঁরা এই সব সন্ন্যাসী সর্বত্যাগীদের সেবা ও সাধনায় যথাসম্ভব সাহায্য করেন। উনিশ শতকে ব্রাহ্মসমাজ মূলতঃ ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থদের প্রচেষ্টায়ই গড়ে উঠেছিল ; বিশ শতকে রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘ গৃহী ভক্তদের প্রেরণাকেন্দ্র হলেও প্রধানতঃ সন্ন্যাসীসঙ্ঘ রূপেই প্রতিষ্ঠিত।

এর ফলে রামকৃষ্ণসঙ্ঘের সেবাধর্ম কোন সমাজসংস্কারমূলক আন্দোলনে অগ্রসর হয় নি। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায় 'ঈশ্বর লাভই জীবনের উদ্দেশ্য'—এই মূলমন্ত্রে প্রতিষ্ঠিত সম্পূর্ণ অনাসক্ত ও সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর জীবনাদর্শকেই রামকৃষ্ণসঙ্ঘ একমাত্র বলে জেনেছেন। সন্ন্যাসধর্মে তাঁদের এই অনুরক্তি ও নিষ্ঠা আধুনিক বাঙালীর মনোজীবনে কিছু পরিমাণে প্রভাব বিস্তার করলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের জীবনাদর্শ বলতে কেবলমাত্র সন্ন্যাসের আদর্শই আমাদের মনে প্রাধান্য লাভ করে।

বলা বাহুল্য, শুধুমাত্র সন্ন্যাস-কেন্দ্রিক হলে জীবনে, সমাজে, জাতীয়তায় রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ আদর্শের পরিপূর্ণ স্বীকরণ সম্ভব নয়।

সমাজে আদর্শ গৃহী না থাকলে আদর্শ সন্ন্যাসী হওয়াও সম্ভব নয়। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়, সন্ন্যাসীর নানা ত্রুটিবিচ্যুতি সংসারী লোকেদের সমালোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। চৈতন্যদেবের ভাষায়, "সন্ন্যাসীর অল্প ছিদ্র সর্ব লোকে গায়।" তার কারণ, সাধারণ মানুষের জীবন থেকে যাঁরা স্বেচ্ছায় দূরে সরে গেছেন, তাঁদের সেই স্বাতন্ত্র্যই সকলের চোখে বড়ো হয়ে ওঠে। নিজেদের ত্রুটিবিচ্যুতির কথা মনে না রেখে, যাঁরা মহৎ আদর্শের অনুসন্ধানী তাঁদের ত্রুটিবিচ্যুতি অনুসন্ধানে নিজেদের অহমিকাতৃপ্তির সুযোগ বেশী। একথা স্বীকার্য যে সন্ন্যাসীর জীবনেই আদর্শ পালনের দায়িত্ব বেশী। লোকশিক্ষকের দায়িত্ব সন্ন্যাসীর জীবনে আপনা থেকেই এসে পড়ে। তবু, যে সমাজে সর্বত্র শোষণ, অনাচার ও নীতিহীনতা পরিব্যাপ্ত, সে সমাজে গুটিকয় সন্ন্যাসী সমাজের সর্ববিধ গ্লানিমোচনের ভার নেবেন—এমন আশাও বাতুলতা।

তাই মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ আদর্শ কেবল সন্ন্যাসীর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়, সংসারীর ক্ষেত্রেও সমান প্রযোজ্য। শ্রীরামকৃষ্ণের "ঈশ্বরলাভ"-আদর্শও সমগ্র মানবসমাজেরই আদর্শ। উপনিষদের ঋষিদের কাল থেকেই ভারতবর্ষের ধর্মজীবন গৃহজীবনকে কেন্দ্র ক' গড়ে উঠেছে। আমাদের শ্রেষ্ঠ মহাকাব্য দুটি মানবমঙ্গলেরই গৃহধর্মাশ্রিত কাহিনী। রাম এবং কৃষ্ণ—ভারতের সংসারী-সন্ন্যাসী-নির্বিশেষে অগণিত ভক্ত-প্রাণের আরাধ্য দেবতা। আপাতক্ষীত প্রবল অন্যায়ের সঙ্গে এ দুই অবতারকল্প মহামানবের সংগ্রাম-কাহিনীই ভারতবর্ষের ন্যায়-অন্যায়-বোধের মানদণ্ড।

সুতরাং সন্ন্যাসজীবনের আদর্শ সম্বন্ধে বিচারের আগে আমাদের সংসারজীবনের সার্থকতাও বিশেষভাবে আলোচনার যোগ্য। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় যাঁরা "মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই"—একথা ঘোষণা করেন, তাঁদের বাঁচবার আনন্দকে বিশ্লেষণ করার

প্রয়োজন আছে। কেমন করে বাঁচাকে সত্যিকার বাঁচা বলে—তাই বা আমরা ক'জনে জানি?

সাধারণতঃ মানবপ্রীতির যে আদর্শের কথা আমরা বলে থাকি, স্বার্থদ্বন্দ্বমুখর জগতে সে মানবপ্রীতি এক ভাবময় আদর্শমাত্র। ভালোবাসা ছাড়া জীবনের অর্থ থাকে না, এ যেমন সত্য, সত্যিকার ভালোবাসা জগতে একান্ত দুর্লভ—এও তেমনি সত্য। নিন্দুকের অপলাপ শুনে বিদ্যাসাগরের সেই কথা—"বোধ হয় তার কোন উপকার করেছিলাম"—এ মানবজাতির সাধারণ অভিজ্ঞতা। কমলাকান্তরূপী বঙ্কিম উপলব্ধি করেছিলেন—"মনুষ্যহৃদয়ে কেবল আত্মাদর আছে।" বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে মানবমনের নির্মম বাস্তবতা—

"হও জড়প্রায়, অতি নীচ, মুখে মধু, অন্তরে গরল—
সত্যহীন, স্বার্থপরায়ণ, তবে পাবে এ সংসারে স্থান।"

ব্যঙ্গ ও বেদনার মিশ্রণে এই নির্মম সত্যভাষণ একটু কঠোর হ'লেও অনস্বীকার্য।

ভারতবর্ষের কর্মজীবনের আদর্শ তাই নিরাসক্তি। নিরাসক্ত মানবপ্রীতিই যথার্থ মানবকল্যাণের উপাদান। ব্যক্তি বা দলগত কামনার পরিপূরণে যে মানবপ্রেম ক্ষণে ক্ষণে রূপান্তরিত হয়, তার দ্বারা স্থায়ী লোককল্যাণ সাধন অসম্ভব। তাই শ্রীরামকৃষ্ণের কথানুযায়ী, আগে ঈশ্বরচিন্তা বা লাভের দ্বারা মনের নিরাসক্ত অবস্থা আয়ত্ত করে তারপর সংসারে প্রবেশ। হাতে তেল মেখে কাঁঠাল ভাঙা। নইলে জড়িয়ে যায়।

সন্ন্যাস সকলের জন্য নয়। কিন্তু সংসারও সকলের জন্য নয়। একজন প্রশ্ন করেছিলেন, সবাই সন্ন্যাসী হওয়া কি ঈশ্বরের ইচ্ছা? তাহলে তিনি সংসারের সৃষ্টি করেছিলেন কেন? শ্রীরামকৃষ্ণও স্বীকার করলেন, সন্ন্যাস সকলের জন্য নয়। তার পরই দীপ্তকণ্ঠে বললেন, "আর তাঁর কি ইচ্ছা যে, সকলেই

শিয়ালকুকুরের মতো কামিনীকাঞ্চনে মুখ জুবড়ে থাকে? আর কি কিছু ইচ্ছা তাঁর নয়? কোনটা তাঁর ইচ্ছা, কোনটা অনিচ্ছা কি সব জেনেছ?”

আসলে ঈশ্বরের ইচ্ছাকে আমরা আমাদের সুবিধামতো ব্যাখ্যা করে নিই, মনোমত না হলে ঈশ্বরকেও বরবাদ করি। কারণ আমাদের “ঈশ্বর” তো অনেকটাই ছোটছেলেমেয়ের ‘মা কালীর দিব্যি’ দেওয়ার ঈশ্বর—শোনা কথা এবং মনগড়া আদর্শের ঈশ্বর।

ঠিক ঠিক ঈশ্বরপরায়ণতার উদাহরণ দিয়েছেন শ্রীরামকৃষ্ণ দুটি ছেলের উদাহরণে। মাঠের আলপথে বাপের সঙ্গে দুইছেলে চলেছে, একটি বাপের কোলে চেপে, আর একটি বাপের হাত ধরে। আকাশে উড়ে যাচ্ছে চিল। তাই দেখে আনন্দে হাততালি দিতে গিয়ে বড় ছেলেটি বাপের হাত যেই ছেড়ে দিয়েছে অমনি পড়ে গেল গড়িয়ে। আর ছোট ছেলে বাপের কোলে, বাপ তাকে ধরে আছেন, তাই তার কোন পড়ার ভয় নেই।

এ দুই ছেলের উপমায় শ্রীরামকৃষ্ণ শরণাগত ভক্তের সঠিক আদর্শটি আমাদের সামনে প্রত্যক্ষ তুলে ধরেছেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সংসারজীবনে ঈশ্বরের শরণাগতি বলমাত্র নিজের সুবিধাসুযোগের বেলায়, সামান্যতম স্বার্থে আঘাত লাগলেই ঈশ্বরের কথা ভুলে বিশ্বসংসারের উপর বিরক্তি দেখা দেয়। সেই পণ্ডিতের গল্পটি এক্ষেত্রে স্মরণীয়, যাঁর ভাগবতপাঠ শুনে গয়লানী নিশ্চিন্তমনে নদীর উপর দিয়ে হেঁটে গিয়েছিল, কিন্তু পণ্ডিত যখন কাছাকোছা সামলে নদীর উপর দিয়ে হাঁটতে গেল, তখন ডুবে গেল। সংসারে থেকে যার সত্যিকার নির্ভরতা হয়েছে ঈশ্বরেচ্ছা তার মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয় বৈকি! কিন্তু সে নির্ভরতা ক’জনের হয় সেটিই বিবেচ্য।

গিরিশচন্দ্রকে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন, সব ভার আমায় সমর্পণ

কর। এ অনেকটা "মামেকং শরণং ব্রজ"—জাতীয় কথা। সর্বস্বসমর্পণকারী গিরিশচন্দ্রও একদিন ব্যক্তিগত 'আমি'কে প্রাধান্য দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের সস্নেহ ভর্ৎসনা শুনেছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন, তাঁকে যখন আমমোক্তারী দিয়েছি, তখন আমার আর ভাবনা কি? জানতেন না যে, তখনই জীবনের সমস্ত কাজে কথায় চিন্তায় 'আমি'র বদলে "তুমি"—ভাবনার শুরু। 'অহং'-এর এই সম্পূর্ণ রূপান্তরই সব সাধনার শেষ লক্ষ্য। গিরিশচন্দ্র মদ খেতেন, শ্রীরামকৃষ্ণ কিন্তু বলতেন, "খাক না—খাক না—ক'দিন খাবে।" সুরাপান যে সুধাপানে পরিণত হয়েছিল, একথা আজ সবাই জানে। গিরিশচন্দ্র থিয়েটার ছাড়তে চেয়েছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ তাতে সম্মত হন নি। বলেছিলেন, "ওতে লোকশিক্ষা হবে।" থিয়েটারের নটনটী সকলের মধ্যে তিনি চৈতন্যময় সত্তাকে দেখতে পেয়েছিলেন, "সবই তিনি এক এক রূপে।" ফলে বাংলার রঙ্গালয়ে তিনি প্রতিষ্ঠা-বিগ্রহস্বরূপ। তিনি অনুভব করেছিলেন, "সমস্ত জগৎ এক চৈতন্যে জুড়ে রয়েছে।" তাই তাঁর মহাসাত্ত্বিক অন্তরে ব্রহ্মময় বলেই জগৎও সত্য হয়ে উঠেছিল। তিনি জীবকে দয়া করতে পারেন নি, সেবা করতে চেয়েছিলেন। গিরিশচন্দ্রের অধ্যাত্মরূপান্তর তাঁর সেই মানবসেবাব্রতেরই একটি দিক।

সেবা কথাটিকে আমরা তিনটি অর্থে নিতে পারি—(ক) সাময়িক প্রয়োজনে, রোগে, শোকে, দুর্ভিক্ষে, মহামারীতে সেবা; (খ) স্থায়ীভাবে অজ্ঞতার বিরুদ্ধে বিদ্যাবিস্তারের দ্বারা সেবা এবং (গ) আত্মিক শক্তির জাগরণের দ্বারা সেবা। শ্রীরামকৃষ্ণভাবধারাকে কেন্দ্র করে উনিশ শতকের শেষদিক থেকে এই ত্রিবিধ সেবার আদর্শ বিস্তৃত হয়েছে। এই তিনটি ধারাই মানবসংসার-অভিমুখী—ঈশ্বরকে মানুষের মধ্যেই উপলব্ধির প্রচেষ্টা।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, তিনিই সব হয়েছেন তবে মানুষে তাঁর

বিশেষ প্রকাশ। কারণ, মানুষই একমাত্র অনন্তের ধারণা করতে পারে। "মানুষ কি কম গা? ঈশ্বরচিন্তা করতে পারে, অনন্তকে চিন্তা করতে পারে, অন্য জীবজন্তু পারে না। অন্য জীবজন্তুর ভিতরে গাছপালার ভিতরে, আবার সর্বভূতে তিনি আছেন; কিন্তু মানুষে বেশী প্রকাশ।

অগ্নিতত্ত্ব সর্বভূতে আছে, সব জিনিষে আছে; কিন্তু কাষ্ঠে বেশী প্রকাশ।"

তাঁর নরেন্দ্রনাথ—'নররূপী নারায়ণ'কে তিনি মুক্তির চেয়ে ঢের বড়ো আদর্শ দেখালেন শিবজ্ঞানে জীবসেবায়। ব্যক্তির সাধনা বিশ্বের উদ্দেশে আত্মবিসর্জন করল—বহুরূপে ব্রহ্মোপলব্ধির দিব্যচেতনায় সে সাধনার পরিপূর্ণতা। জ্ঞানী তখন বিজ্ঞানীতে পরিণত। শুধু সত্যকে জানা নয়, জীবনের প্রতি কথায় ও কর্মে সে সত্যের রূপায়ণ—তাই 'কর্মে পরিণত বেদান্ত'। বিবেকানন্দ-প্রচারিত এই কর্মে পরিণত বেদান্ত শ্রীরামকৃষ্ণের মানবপ্রীতিরই অন্যতম অভিব্যক্তি।

ব্যক্তি রামকৃষ্ণের অন্তর্জীবনে স্নেহ প্রীতি প্রেমের স্বভাবনির্ঝর বয়ে চলেছে তাঁর সহজাত ভগবদ্ভক্তির মতো। সংসারের নিকটতম সম্বন্ধ—জননী চন্দ্রাদেবী ও পত্নী সারদাদেবীর সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের আজীবন সংযোগ গৃহধর্মের আদর্শের দিক থেকেই আমাদের স্মরণীয়। দক্ষিণেশ্বরের এই পাগল পূজারী কিন্তু তাঁর ব্যাকুল দিব্যোন্মাদ সত্ত্বেও মায়ের কথা খনো ভুলে থাকেন নি। বরং বলেছেন, যতদিন নিজের দেহের খোঁজ নিতে হয়, ততদিন মায়েরও খোঁজ নিতে হয়। বৃন্দাবনে পরমসাধিকা গঙ্গামায়ীর সস্নেহ আহ্বানে সেখানে থেকে যাওয়া সব ঠিক ঠাক। যেই মায়ের কথা মনে

পড়ল, অমনি ফিরে এলেন দক্ষিণেশ্বরে। মায়ের মনে দুঃখ দিয়ে তিনি বহিঃসন্ন্যাসও নিতে রাজী হন নি—তোতাপুরীও সেক্ষেত্রে অহেতুক পীড়াপীড়ি করেন নি। এমন সর্বত্যাগী হয়েও মাতৃহৃদয় সম্বন্ধে সদা সতর্ক এই সন্ন্যাসী আমাদের গৃহধর্ম পালনের শ্রেষ্ঠ আদর্শ স্থাপন করেছেন তাঁর আন্তরিক মাতৃ সেবায়।

চন্দ্রাদেবীর জীবনের শেষ দিনগুলি শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদামণির সশ্রদ্ধ যত্নে ও সেবায় আনন্দময় হয়ে উঠেছিল সন্দেহ নেই। পুত্রের বৈরাগ্য ও আধ্যাত্মিকতা ওই সরলা ভক্তিমতী জননীর অন্তরে ঈশ্বরীয় প্রেরণা বহুগুণে বাড়িয়ে তুলেছিল। উনিশ শতকের এই মা ও ছেলের কাহিনীর সঙ্গে ষোড়শ শতকের আর এক মা ও ছেলের কাহিনীও সহজেই মনে পড়ে। সেক্ষেত্রে বিধবা জননীর কনিষ্ঠ পুত্র জননী ও পত্নীর ঘনিষ্ঠ বন্ধন কাটিয়ে সন্ন্যাসের পথে যাত্রা করেছিলেন। সেই নিমাই পণ্ডিত কিন্তু মায়ের সঙ্গে সম্বন্ধ ত্যাগ করেন নি। নীলাচলে তিনি ছিলেন মায়েরই নির্দেশে—নীলাচল থেকে নবদ্বীপে মায়ে ছেলেতে সমাচার আদান প্রদান চলত। নিমাই-সন্ন্যাসের হাহাকারের চেয়ে মাতাপুত্রের এই হৃদয়বন্ধন অনেক বেশী সত্য।

জননী চন্দ্রামণির সঙ্গে তাঁর গদাইয়ের সম্বন্ধের চেয়ে আরো আশ্চর্য কাহিনী পত্নী সারদা দেবীর সঙ্গে সন্ন্যাসী শ্রীরামকৃষ্ণের ব্যবহার। বিয়ের চেষ্টা করছিলেন চন্দ্রাদেবী ছেলের মাথার অসুখ ভালো হবে ভেবে। ছেলে কিন্তু নিজেই বিয়ের কনে ঠিক করে নিলেন। বিয়ের আনন্দোৎসবে তিনিই সবচেয়ে উৎসাহী নায়ক। অথচ এ বিবাহে তাঁর মন ভগবৎ-সাধনা থেকে এক মুহূর্তও বিচ্যুত হল না। দক্ষিণেশ্বরে ফিরে আবার ডুবে গেলেন আপন সাধনায়।

সারদাদেবী যখন দক্ষিণেশ্বরে এলেন তখন মথুরামোহন নেই। অসুস্থা পত্নীকে দেখে প্রেমময় শ্রীরামকৃষ্ণ দুঃখ করলেন, "তুমি এত

দিনে এলে? আর কি আমার সেজবাবু আছে যে তোমার যত্ন হবে?" শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ন্যাসীসত্তা এখানে স্বামীর কর্তব্যে কোন বাধা দেয় নি। কামারপুকুরে বা দক্ষিণেশ্বরে—কোথাও শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর এই পত্নীর কল্যাণচিন্তায় উদাসীন ছিলেন না। বরং সল্‌তে পাকানো থেকে আরম্ভ করে 'যখন যেমন তখন তেমন' 'যাকে যেমন তাকে তেমন' ব্যবহারের সাংসারিক শিক্ষা অবধি সর্বদিক দিয়ে আদর্শ গৃহিনীরূপে তাঁকে গড়ে তুলেছেন। আবার মানব-জন্মের শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য সম্বন্ধে স্ত্রীকে সচেতন করে দিয়ে গৃহধর্মকেই ঈশ্বর-আরাধনায় পরিণত করেছিলেন।

দাম্পত্যজীবনে ভালোবাসার কাহিনী আমরা অনেক শুনে থাকি। সে সব কাহিনীর পাশাপাশি শ্রীরামকৃষ্ণের পত্নীপ্রেমের একটি দুটি কাহিনী আমরা তুলনামূলক ভাবে সাজাতে পারি।

দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরে খাবার দিতে এসেছেন সারদাদেবী। রাত্রির অন্ধকারে ভাবতন্ময় শ্রীরামকৃষ্ণ তেমন লক্ষ্য করেন নি। চলে যাবার সময় দরজায় শব্দ হতে ভাবলেন হয়তো ভাইঝি লক্ষ্মী এসেছিল, তাই বললেন, দোরটা ভেজিয়ে দিয়ে যাস। "হাঁ, দরজা ভেজিয়ে রাখলুম"—বলে সারদাদেবী চলে যাচ্ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ চমকে উঠে বললেন, "আহা তুমি, আমি ভেবেছিলুম লক্ষ্মী বুঝি। কিছু মনে করো না।" রাত শেষে ভোরে উঠে নহবতে গিয়েছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। সারদাদেবীকে বলছেন, "দেখ গো সারা রাত আমার ঘুম হয় নি, ভেবে ভেবে—কেন এমন রূঢ় বাক্য বলে ফেললুম।"[১]

দাম্পত্য প্রেমের এমন অতন্দ্র উদাহরণ আমাদের নিত্য পরিচয়ের সংসারে ক'টি মেলে?

শুধু অনুরাগের অলঙ্কারে নয়, সোনার অলঙ্কারেও আপন পত্নীকে সাজিয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। সমকালীন সাক্ষীর দৃষ্টিতে—"মা সে সময় নবতে সীতাঠাকুরুণের মতো থাকতেন। পরণে কস্তাপেড়ে

চওড়া লাল শাড়ী, সিঁথেয় সিঁদুর, কালো ভরাট মাথার চুল প্রায় হাঁটু পর্যন্ত গিয়ে ঠেকেছে, গলায় সোনার কণ্ঠীহার, নাকে মস্ত বড় নথ, কানে মাকড়ি, হাতে চুড়ি।"

[যোগীন মায়ের স্মৃতি কথা থেকে][2]

সীতাঠাকরুণের উপমাটি মায়ের জীবনে বিশেষ স্মরণীয়। পঞ্চবটীতে সীতার দিব্যদর্শনের সময় তাঁর হাতে ডায়মণ্ডকাটা বালা দেখেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ, পরবর্তীকালে অনুরূপ বালা গড়িয়ে দিয়েছিলেন সারদাদেবীকে। তাছাড়া সোনার দু'ছড়া তাবিজ। এসব গয়নাগাঁটি হয়তো তাঁর পূজারীরূপে প্রাপ্য (সাত টাকা মাইনে পেতেন) টাকায় তৈরী। নিজে কখনো সই করে টাকা নিতেন না। কিন্তু আদর্শ গৃহীর কর্তব্য পালন করে গেছেন পত্নীকে 'অলঙ্কারে সাজিয়ে। ঠাট্টা করে বলতেন, "ওরে, আমার সঙ্গে ওর এই সম্বন্ধ।' শুধু তাই নয়, নিজের অবর্তমানে সারদাদেবীর ভবিষ্যৎ অন্ন সংস্থানের জন্যও শ্রীরামকৃষ্ণ ছ'শো টাকার বন্দোবস্ত করে গিয়েছিলেন। কাঞ্চনের প্রতি তাঁর চরম নিরাসক্তি। কিন্তু পত্নীর প্রতি কর্তব্যে তিনি উদাসীন ন'ন।

কি ছিলেন তিনি? সন্ন্যাসী না গৃহী?

আসলে এই আদর্শ দম্পতি কোনদিনই অর্থমোহে আবদ্ধ হতে পারেন নি। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায় তাঁর দাম্পত্য জীবনের একটি ঘটনা—"মাড়োয়ারীভক্ত (লছমীনারায়ণ) যখন দশ হাজার টাকা দিতে চাইলে তখন আমার মাথায় যেন করাত বসিয়ে দিলে; মাকে বললুম, "মা, মা, এতদিন পরে আবার প্রলোভন দেখাতে এলি?" সেই সময় ওর মন বুঝবার জন্য ডাকিয়ে বললুম, "ওগো, এই টাকা দিতে চায়। আমি নিতে পারবো না বলায় তোমার নামে দিতে চাইছে। তুমি ওটা নাও না কেন? কি বল?" শুনেই ও বললে,

---

১, ২ শ্রীমা সারদাদেবী : স্বামী গম্ভীরানন্দ।

'তা কেমন করে হবে? টাকা নেওয়া হবে না। আমি নিলে ও টাকা তোমারই নেওয়া হবে; কারণ আমি রাখলে তোমার সেবা ও অন্যান্য আবশ্যকে খরচ না করে থাকতে পারব না; ফলে ওটা তোমারই নেওয়া হবে। তোমাকে লোকে শ্রদ্ধা ভক্তি করে তোমার ত্যাগের জন্য; কাজেই টাকা কিছুতেই নেওয়া হবে না।' ওর ঐ কথা শুনে আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচি।"[৩]

শ্রীরামকৃষ্ণের যোগ্য সহধর্মিনী সারদাদেবীর পরবর্তী জীবনকাহিনী গৃহজীবন ও অধ্যাত্মজীবনের অপূর্ব সমন্বয়কাহিনী। শ্রীরামকৃষ্ণ এই সহধর্মিনীর ভবিষ্যৎ অন্নবস্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে অধ্যাত্মনেতৃত্বের কথাও ভেবেছিলেন। তাঁর শূন্যস্থান পূরণ করবার জন্য তিনি নিজে সারদাদেবী ও নরেন্দ্রনাথ—এই দুজনকে মনোনীত করে গিয়েছিলেন। নরেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তাঁর মনোনয়ন সাধারণ দৃষ্টিতে সহজবোধ্য। কিন্তু সারদাদেবীকে যখন বলেছিলেন, "শুধু আমারই দায়? তোমারও দায়।" "দ্যাখ, কলকাতার লোকগুলো যেন অন্ধকারে পোকার মতো কিলবিল করছে। তুমি তাদের দেখো।" "এ (শ্রীরামকৃষ্ণ নিজে) আর কি করেছে? তোমাকে এর অনেক বেশী করতে হবে।"—তখন অজ্ঞাতসারে শ্রীরামকৃষ্ণযুগের বিকাশে সারদাদেবীর বিশিষ্ট ভূমিকা রচনা চলেছে। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দেহাবসানের পর বিশ্ববিজয়ী বিবেকানন্দকে জগৎ চিনেছে, আর বিবেকানন্দ দিনে দিনে উপলব্ধি করেছেন এই 'সৌম্যাৎ সৌম্যতরা' অবগুণ্ঠনময়ী শাশ্বত ভারতনারীর নীরব জীবনসাধনার অপরিমেয় অনুপ্রেরণা। আমেরিকা থেকে গুরুভাইকে চিঠি লিখছেন—"মায়ের কথা মনে পড়লে সময় সময় বলি, 'কো রামঃ?' দাদা, ওই যে বলছি, ওখানেই আমার গোঁড়ামি। রামকৃষ্ণ পরমহংস ঈশ্বর ছিলেন কি মানুষ ছিলেন—যা হয় বল দাদা; কিন্তু যার মায়ের উপর ভক্তি নেই, তাকে ধিক্কার দিও।"[৪]

---

৩ শ্রীমা সারদাদেবী: স্বামী গম্ভীরানন্দ। ৪ পত্রাবলী: স্বামী বিবেকানন্দ।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-আরাধিতা সারদাদেবীর সমগ্র জীবনটি মাতৃভাব-সাধনার অনন্য উদাহরণ। শ্রীরামকৃষ্ণ যে মাতৃভাবেরই উপাসক ছিলেন। সে কথা বাদ দিলেও, সাধারণ গ্রাম্য পল্লীর অশিক্ষিতা এক বধূ যে দিব্যপ্রেরণায় নিখিল নরনারীর মাতৃপদ গ্রহণ করেছিলেন, সে প্রেরণার অসাধারণ মানবিকতাও কি এই বিংশ শতাব্দীতে একান্ত দুর্লভ নয়? সর্ব জাতি, সর্ব বর্ণ, সর্ব দেশের নরনারীকে তিনি সন্তানভাবে গ্রহণের সাধনায় এমন অসাধরণ সিদ্ধিলাভ করেছিলেন যে, গর্ভজাত সন্তানের জননী না হয়েও সত্যিকার মায়ের স্নেহ, শঙ্কা, প্রীতি ও বাৎসল্যে এক অনুপম মাতৃচরিত্ররূপে জগতের চরিত-চিত্রশালায় চিরোজ্জ্বল অমরতা লাভ করেছেন।

সারদাচরিত্রের এই মাতৃমূর্তি—এও জীবনশিল্পী শ্রীরামকৃষ্ণের আর এক সৃষ্টি। সংসারজীবনের কুটনো কোটা, বাটনা বাটা, রান্নাবান্না, সন্তান মানুষ করা (অনাথা ভ্রাতুষ্পুত্রী রাধুর সঙ্গে তাঁর মাতৃসম্বন্ধ) ভাইয়েদের ঘর-গৃহস্থালীর বিবাদ ও অশান্তির মধ্যে গৃহকর্ত্রীর কর্তব্য-পালন—এই একান্ত সাধারণ পরিবেশের মধ্যে থেকেই শ্রীরামকৃষ্ণ-গতপ্রাণা সারদাদেবী আপন অন্তরে ধ্যানের আলোটি অনুক্ষণ জ্বালিয়ে রেখেছিলেন এবং শত সহস্র আলোকপিপাসুর অন্তরে সে আলোক সঞ্চার করেছেন।

কামিনীকাঞ্চনত্যাগী শ্রীরামকৃষ্ণ সহধর্মিনীর পবিত্র হৃদয় ও সরল ভক্তি, অথচ সহজ বুদ্ধিমত্তা সম্বন্ধে উচ্চধারণা পোষণ করতেন। তার ফলে স্বামী-স্ত্রীর দেহসম্বন্ধ মুছে গিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদার দাম্পত্যজীবনের একান্ত অন্তরঙ্গ পরিণতি বিশ্বময় মানবসন্তানের উদ্দেশ্যে নির্মল মাতৃস্নেহধারায় উৎসারিত।

শ্রীরামকৃষ্ণ টাকা বা ধাতুদ্রব্য ছুঁতে পারতেন না—কাঞ্চনত্যাগ তাঁর জীবনে এত স্বাভাবিক হয়ে এসেছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ-সহধর্মিনী সারদাদেবী কিন্তু টাকা কপালে ছুঁয়ে বাক্সয় রাখতেন—টাকা লক্ষ্মীর

আশীর্বাদ বলে জানতেন। ধনসম্পদে সম্পূর্ণ আসক্তিহীনা এই সংসারকর্ত্রী গৃহজীবনের সাধনায় অর্থের প্রতি উপযুক্ত সম্মান দিয়েছেন, তবু অর্থকে পরমার্থের আসনে বসান নি। তাঁর জয়রামবাটীর সংসারে ভক্তমণ্ডলীর শ্রদ্ধার দানে যখন প্রচুর অর্থসমাগম হয়েছে, তখনও ব্যক্তিগত সুখেচ্ছায় একটি কপর্দকও ব্যয়িত হয় নি। তাঁর সংসার ছিল শ্রীরামকৃষ্ণ-আদর্শে অনুপ্রাণিত সন্ন্যাসী ও গৃহী সন্তানদের সংসার। টাকা পয়সা আসত যেত, তার খুঁটিনাটি হিসাবের প্রতি সারদাদেবী সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন। অথচ সংসারের তেল, নুন থেকে আরম্ভ করে তরকারির খোসা, উচ্ছিষ্ট অন্ন—কোনটির অপচয় না হয় সেদিকে এই আদর্শ গৃহিনীর সজাগ দৃষ্টি ছিল। তাঁর সংসারই ছিল ভগবৎ-সাধনার অবলম্বন।

আদর্শ গৃহধর্মের এ শিক্ষাও শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের দ্বারা অনুপ্রাণিত। অনুক্ষণ ভাবতন্ময় শ্রীরামকৃষ্ণের দক্ষিণেশ্বরের ছোট্ট ঘরটিতে কোন জিনিষ কখনো অগোছালো থাকত না। অন্ধকারে হাত দিয়েও তিনি যেখানে যা রেখেছেন অনায়াসে খুঁজে পেতেন। কোথাও যেতে আসতে হলে সেবকদের হয়তো কখনো পানের বটুয়া বা গামছা নিতে ভুল হয়েছে, তাঁর কখনো সে ভুল হত না। কোন গৃহের অতিথি হয়ে গৃহকর্তাকে বিড়ম্বনায় ফেলা সম্বন্ধে তিনি এত বিবেচক ছিলেন যে তাঁর অনুরাগীদের অভিমান উপেক্ষা করেও গৃহকর্তার অনবধানতাজনিত অবহেলা তিনি অনায়াসে ক্ষমা করতেন। ঘরকন্না, গৃহস্থালীর কাজ যাতে নিখুঁত হয়, সে সম্বন্ধে তাঁর সতর্ক দৃষ্টির অন্যতম উদাহরণ মেলে কামারপুকুরের একটি ঘটনায়। ঘরেতে পাঁচফোড়ন নেই বলে তাঁর ভ্রাতৃবধূ পাঁচফোড়ন ছাড়াই কাজ চালানোর কথা বলছেন শুনে শ্রীরামকৃষ্ণ ডেকে বললেন, "সে কি গো! পাঁচফোড়ন নেই তো এক পয়সার আনিয়ে নাও না। যাতে যা লাগে, তা বাদ দিলে হবে না।"[৫]

৫ শ্রীমা সারদা দেবী : স্বামী গম্ভীরানন্দ।

সন্ন্যাসী না গৃহী ? কি ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ ?

সন্ন্যাসগুরু তোতাপুরী শ্রীরামকৃষ্ণ যে বিবাহিত একথা জেনে বলেছিলেন, "স্ত্রী কাছে থাকলেও যার ত্যাগ, বৈরাগ্য, বিবেক, বিজ্ঞান সর্বতোভাবে অক্ষুণ্ণ থাকে, সেই লোকই ব্রহ্মে যথার্থ প্রতিষ্ঠিত। স্ত্রী ও পুরুষ উভয়কেই যিনি সমানভাবে আত্মা বলে সর্বক্ষণ দেখতে পারেন ও সেইরকম ব্যবহার করতে পারেন, তাঁরই যথার্থ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়েছে। স্ত্রী-পুরুষ ভেদ সম্পন্ন আর সবাই সাধক হলেও ব্রহ্ম বিজ্ঞান থেকে অনেক দূরে রয়েছে।" [লীলাপ্রসঙ্গ]

শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদার নিষ্কাম দাম্পত্যজীবন সেই ব্রহ্ম বিজ্ঞানের জ্বলন্ত আদর্শ। সে কালের ব্রাহ্মনেতাদের কেউ কেউ এই দেহসম্বন্ধহীন দাম্পত্যজীবনের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণকে 'নিষ্ঠুর' বলেছেন। যদি বিবাহিত জীবনের সাধারণ স্তর থেকে দেখা যায়, তবে এ মন্তব্য কিছুমাত্র আশ্চর্য নয়। কিন্তু যে ব্রহ্মানুভূতিতে স্ত্রী পুরুষ ভেদ জ্ঞানের অবসানে আত্মার ঐক্য প্রতিষ্ঠিত, তার পক্ষে দেহধর্মী দাম্পত্যজীবন অবান্তর অপ্রয়োজনীয়। ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের এই সর্বোচ্চ আদর্শ শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনেই পূর্ণ বিকশিত। তবে আত্মীয় সম্পর্কে অগ্রজ হলধারীকে একবার শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর জীবনাদর্শ সম্বন্ধে যে কথা বলেছিলেন, ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ সম্বন্ধে বোধ হয় সেইটিই তাঁর প্রধান বক্তব্য।

দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুরবাড়ীতে সমাগত কাঙ্গালীদের নারায়ণজ্ঞানে দেখে তাদের ভোজনের পর শ্রীরামকৃষ্ণ তাদের উচ্ছিষ্ট প্রসাদ-রূপে গ্রহণ করেছিলেন। জাতিধর্মে একনিষ্ঠ হলধারী সে দৃশ্যে অতিমাত্রায় ক্রুদ্ধ হয়ে বলেছিলেন, "তোর ছেলেমেয়েদের কেমন করে বিয়ে হয় তা দেখব।" শ্রীরামকৃষ্ণ অমনি উত্তর দিলেন, "তবে রে শালা, শাস্ত্র ব্যাখ্যা করবার সময় তুই না বলিস, জগৎ মিথ্যা। সর্বভূতে ব্রহ্মদৃষ্টি করতে হয় ? তুই বুঝি ভাবিস, আমি তোর মতো

জগৎ মিথ্যা বলবো, অথচ ছেলেমেয়ের বাপ হব! ধিক তোর শাস্ত্রজ্ঞানে!"[৬]

স্বভাবতঃই প্রশ্ন উঠতে পারে, তাহলে শ্রীরামকৃষ্ণ আদৌ বিয়ে করেছিলেন কেন? যে ব্রহ্মোপলব্ধিতে ব্যবহারিক জগৎ মায়ামাত্র, সে ব্রহ্মোপলব্ধির ক্ষেত্রে বিবাহের প্রশ্নই তো ওঠে না!

এ প্রশ্নের উত্তরে শ্রীরামকৃষ্ণজীবনের কয়েকটি মূলবক্তব্য নিয়ে আলোচনা প্রয়োজন। সাধারণতঃ গৃহী বা সন্ন্যাসী বলে আমরা জীবনযাপনের যে ভেদরেখা টেনে থাকি, তাতে বিবাহপূর্ব বা বিবাহোত্তর সাংসারিক সম্পর্কছেদই বড়ো হয়ে দেখা দেয়। কিন্তু এই সম্পর্কছেদ মনকে অনাসক্ত করার প্রয়োজনে। নিরাসক্ত মনের কাছে এই সম্পর্কও ভগবৎপ্রেরণার অন্যতম পন্থা হয়ে উঠতে পারে। বৈষ্ণবসাধনার বাৎসল্যভাবে আপন ভ্রাতুষ্পুত্রকে গোপালরূপে উপাসনা করে শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্ত জনৈকা মহিলা ভগবানলাভ করেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণও আপন পত্নীকে সাক্ষাৎ জগন্মাতারূপে আরাধনা করে মাতৃভাবে সাধনার চরম ফল অর্জন করেছিলেন। সুফী সাধকেরা ঈশ্বরকে মাশূক্বা (প্রেমময়ী নায়িকা) রূপে অনুধ্যান করে থাকেন। ভারতবর্ষের তন্ত্রসাধনায় বীরভাবের উপাসনায় দেহসম্ভোগের দ্বারা অভীষ্ট শক্তির প্রসন্নতা অর্জন—শাস্ত্রীয় সাধনার অঙ্গ। সর্বত্যাগী শ্রীরামকৃষ্ণ আপন সহধর্মিণীর মধ্যে তাঁর ইষ্টদেবীকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তাই সাংসারিক পতি-পত্নী সম্বন্ধের স্থূল দেহসম্ভোগ অতিক্রম করে ভক্ত ভগবানের হৃদয়সম্বন্ধে এঁদের দাম্পত্য-জীবন এক অপূর্ব আদর্শ নিয়ে আমাদের সামনে উপস্থিত।

৬। "যাঁরা ঈশ্বর দর্শন করেছেন, তাঁদের দ্বারা আর ছেলেমেয়ের জন্মদেওয়া সৃষ্টির কাজ হয় না। ধান পুঁতলে গাছ হয়, কিন্তু ধান গাছ সিদ্ধ করে পুঁতলে আর গাছ হয় না।" [কথামৃত : ৩য়]

শ্রীরামকৃষ্ণ কামিনীত্যাগী—যতক্ষণ কাম থেকে কামিনীর চিন্তা ততক্ষণই তিনি কামিনীত্যাগী। কিন্তু যে মা দক্ষিণেশ্বরের নহবতের উপর তলায় তাঁর গর্ভধারিণীরূপে ছিলেন, যে মা তাঁর পত্নীরূপে পদসেবা করতেন, আর যে মা মন্দিরে ভবতারিণীরূপে বিরাজিতা—এই তিন মাতৃমূর্তিই যাঁর কাছে এক ছিল তাঁর কাছে সংসারের সব কামিনীই জননীরূপা। কামজ সম্বন্ধস্থাপন তাঁর পক্ষে আর সম্ভব নয়।

বিংশ শতাব্দীতে আমরা যখন কামের সর্বময় শক্তিকে স্বীকার করে নিয়েছি—তখন আমাদের কাছে কামের চেয়ে বড়ো কোন সত্য নিতান্তই কাল্পনিক মনে হওয়া আশ্চর্য নয়। কিন্তু কাম জীবনের একটি অংশ মাত্র, জীবনের বিচিত্র ক্ষণসত্যের অন্যতম উপকরণ। এর শক্তিকে অস্বীকার না করেই বলা যায় শিল্পে, সঙ্গীতে, সাহিত্যে সর্বত্র এই শক্তির রূপান্তরই পৃথিবীর সব কলাবিদ্যার লক্ষ্য। সাহিত্য শিল্পের ক্ষেত্রে কামের প্রেরণা কত সূক্ষ্ম সৌন্দর্যে আমাদের ইন্দ্রিয়াতীত ভাবলোকে আহ্বান করে। আবার অধ্যাত্মসাধনার ক্ষেত্রে এই কামের নিরুদ্ধ আবেগ পরমসত্য সন্ধানে নিয়োজিত হয়ে মৃন্ময় মানবদেহকে চিন্ময় সত্যের দিশারাতে পরিণত করে।

আসলে অর্থ বা কামকে আমরা এ যুগে অতিমাত্রায় প্রাধান্য দিয়েছি বলেই নিষ্কাম ত্যাগের আদর্শ আমাদের একেবারে অবাস্তব বলে মনে হয়। অথচ ভেবে দেখতে গেলে সংসার তাঁদেরই তত শ্রদ্ধা করে যাঁদের অন্তরে এই অর্থ ও কামের প্রভাব যত অল্প।

শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর জীবনে ওই 'কামিনীকাঞ্চন' দ্বন্দ্ব সমাসটির সঙ্গে কোনরকম আপোষরফা করতে রাজী ছিলেন না। কারণ তাঁর কাজ প্রত্যক্ষ ঈশ্বরকে নিয়ে—আসক্তির সামান্যকণাটুকু পর্যন্ত যে ঈশ্বরের একান্ত অন্তরায়। আবার সাধনার সর্বোচ্চস্তরে এসে জগতের সব

আনন্দই তিনি পরমানন্দের প্রকাশরূপে দেখেছেন। বারবণিতাও তখন মায়েরই আর এক মূর্তি। সবই ঈশ্বর। সবই জল। তবু কোন জল পূজোয় লাগে। কোন জলে পা ধোয়া যায়, কোন জলে কেবল ময়লাই ফেলা যায়। তেমনি ঈশ্বর সর্বরূপে প্রকাশিত। কিন্তু সব নামরূপের ঊর্ধ্বে যিনি, তাঁকে যে লাভ করেছে, তার মন আর আসক্তিবন্ধনে ধরা দেয় না। যে নাম যশ রূপ অর্থ জগতে সকলেরই কাম্য, ঈশ্বরানুরাগীর কাছে তাই সর্বপ্রযত্নে পরিহারযোগ্য।

বলা বাহুল্য, শ্রীরামকৃষ্ণের বিবাহ তাঁর নিজস্ব আদর্শবাদেরই অন্যতম প্রকাশ। গৃহত্যাগী হলে শ্রীরামকৃষ্ণজীবন বুদ্ধ বা চৈতন্যের মতোই অন্যতম ত্যাগের উদাহরণ হতো। কিন্তু গৃহে অধিষ্ঠিত শ্রীরামকৃষ্ণ সংসারী হয়েও সাংসারিকতা বর্জন করে সহ-ধর্মিনীকে তাঁর সাধনার সমান অংশ দিয়ে গেলেন। ভগবানলাভ যে সন্ন্যাসীরই কর্তব্য তা নয়, সংসারীরও সেই একই উদ্দেশ্য। সে উদ্দেশ্যের পথে যে দম্পতি মিলিত হয়েছেন, দেহের প্রশ্ন তুচ্ছ হয়ে তাঁদের কাছে তখন সাধনার সত্যই বড়ো হয়ে দেখা দেয়। পৃথিবীর ইতিহাসে ভগবানলাভের জন্য সংসার বা সহধর্মিনী-বর্জনের অনেক উদাহরণ মেলে, কিন্তু সংসার ও সহধামনীকেই ঈ লাভের উপায়-স্বরূপে রূপান্তরিত করে নিষ্কাম দাম্পত্যজীবনযাপনের অপূর্ব উদাহরণ মেলে সারদা-রামকৃষ্ণের জাবনেতিহাসে।

স্বাভাবিক মাতৃত্বের আকাঙ্ক্ষা সারদাদেবীরও ছিল। কিন্তু সে আকাঙ্ক্ষাকেও শ্রীরামকৃষ্ণ বিশ্বময় সন্তানদের প্রতি অপার ভালোবসায় রূপান্তরিত ক'রে বাংলাদেশে 'মা' নামটির নূতন ব্যঞ্জনা এনে দিলেন। নরেন, রাখাল, যোগীন, শরৎ, নিবেদিতা, ক্রিশ্চন প্রভতির মতো পুত্র কন্যার জননীরূপে সারদাদেবী য অতুলগৌরবের অধিকারিণী হয়েছিলেন সেকথা স্মরণ রেখেও বলা যায় তিনি ছিলেন, 'সতের মা, অসতেরও মা।' শ্রীরামকৃষ্ণদেব তবু বিশেষভাবে পরীক্ষা করে তবে

আধ্যাত্মিক উত্তারাধিকার দিয়ে গেছেন, সারদাদেবী কিন্তু 'মা' ব'লে যে এসে দাঁড়িয়েছে তাকে কখনো ফেরাতে পারেন নি।

একহিসাবে বলা যায়, মাতৃভাবের পরমবিকাশই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিবাহের সবচেয়ে বড়ো পরিণতি। আরবের এক সূফীসাধক অনুভব করেছিলেন—সুরা, সাকী, পেয়ালা—সবই সেই এক সত্যের প্রকাশ। যে মাকে শ্রীরামকৃষ্ণ পাষাণমূর্তির মধ্যে উদ্বোধিত করেছিলেন, সেই মাতৃভাবেরই প্রত্যক্ষ প্রকাশ ঘটিয়েছেন সারদাদেবীর মাতৃচেতনায়। সারদাদেবীর এই জননীমূর্তিই শ্রীরামকৃষ্ণ-সাধনার পরম বিকাশ।

দাম্পত্যজীবন কেবল স্বামীর আদর্শের উপরেই নির্ভর করে না, স্ত্রীর অন্তরেও সেই আদর্শের যোগ্য মনন ও সাধনের প্রয়োজন। শ্রীরামকৃষ্ণ এদিক থেকে চিরকৃতজ্ঞ ছিলেন সারদাদেবীর কাছে। তিনি বলতেন, "ও যদি এত ভাল না হত, আত্মহারা হয়ে তখন আমাকে আক্রমণ করত, তাহলে সংযমের বাঁধ ভেঙ্গে দেহবুদ্ধি আসত কি না কে বলতে পারে?"

সারদাদেবী প্রথমবারে দক্ষিণেশ্বরে আসবার পর এই অপূর্ব দম্পতির সংলাপ স্মরণীয়—

"কি গো তুমি কি আমায় সংসারপথে টেনে নিতে এসেছ?"

"না আমি তোমাকে সংসারপথে কেন টানতে যাব? তোমার ইষ্টপথেই সাহায্য করতে এসেছি।" পরবর্তী জীবনে স্বামী ও স্ত্রী পরস্পরকে ইষ্টরূপেই অনুভব করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের ষোড়শী পূজা এবং সারদাদেবীর আজীবন রামকৃষ্ণতন্ময়তা পতিপত্নীসম্বন্ধের চিন্ময়রূপান্তরের সাক্ষ্য।

*

অধ্যাত্মসাধনার পরামর্শ থেকে আরম্ভ করে প্রতিদিনের পরিচিত সংসারেও শ্রীরামকৃষ্ণ-আদর্শ আমাদের কত সহায়ক হতে পারে তার দু'চারটি উদাহরণ এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। যেমন ধরা যাক সেই

ব্রহ্মচারী ও সাপের গল্প[৭] যাতে অহিংসা ও নির্বুদ্ধিতার সূক্ষ্ম পার্থক্যটি আশ্চর্যভাবে ফুটিয়ে তুলতেন রামকৃষ্ণদেব। বলতেন, "লোকের সঙ্গে বাস করতে গেলেই দুষ্টলোকের হাত থেকে আপনাকে রক্ষা করবার জন্য একটু তমোগুণ দেখান দরকার। কিন্তু সে অনিষ্ট করবে বলে, উল্টে তার অনিষ্ট করা উচিত নয়।"

"দুষ্টু লোকের কাছে ফোঁস করতে হয়। ভয় দেখাতে হয়, পাছে অনিষ্ট করে, তাদের গায়ে বিষ ঢালতে নেই, উল্টে অনিষ্ট করতে নেই।"

বাস্তবিক ভালোমানুষির অর্থ যে নির্বুদ্ধিতা নয়, একথা ভুলে গিয়েই আমরা সামাজিক ও জাতিগত দিক থেকে জীবনসংগ্রামে অনেক পরিমাণে পিছু হটে এসেছি। আবার অন্যায়ের প্রতিকার যে আর একটা অন্যায়ের দ্বারা হয় না সে প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের এ কথাটুকুও চিন্তনীয়—"উল্টে অনিষ্ট করতে নেই।"

হাতীনারায়ণ ও মাহুতনারায়ণের[৮] গল্পটিও জীবনের ক্ষেত্রে সজাগ বিচারবুদ্ধিপ্রয়োগের আশ্চর্য উদাহরণ। সর্বজীবের প্রতি ভালোবাসা ও প্রীতির সঙ্গে সদসৎবিচারের বিবেকশক্তি কতখানি প্রয়োজনীয়, সরল ভক্তের কাহিনীতে সেই কথাটি পরিস্ফুট। 'ঈশ্বর সর্বভূতে আছেন। তবে ভালো লোকের সঙ্গে মাখামাখি চলে; মন্দ লোকের কাছ থেকে তফাৎ থাকতে হয়।"

ওই গল্পটির গুরুদেব যেমন বলেছিলেন, "বাবা হাতীনারায়ণ আসছিলেন বটে, তা সত্য; কিন্তু বাবা মাহুতনারায়ণ তো তোমায় বারণ করেছিলেন। যদি সবই নারায়ণ তবে তার কথা বিশ্বাস করলে না কেন?"

বাসনাবদ্ধ সংসারীদের উপমায় সেই মেছুনীর গল্পটি স্মরণীয়।

৭, ৮ শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত [১ম ভাগ—১ম খণ্ড, ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ।]

মালিনী সইয়ের ফুলবাগানে তার ঘুম আসছিল না। শেষটায় মাথার কাছে মাছের ঝুড়ি রেখে তাতে জলের ঝাপটা দিলে। ভুরভুর করে মাছের গন্ধ বেরুতে লাগলো—তখন ঘুমিয়ে কী তৃপ্তি।

কপট সাধুতার উদাহরণ সবচেয়ে চমৎকার ফুটেছে স্যাকরার গল্পটিতে।[৯] দোকানে খদ্দেরদের দেখে তারা এক একজন ভগবানের এক এক নাম করত, "কেশব কেশব" "গোপাল, গোপাল" "হরি হরি" "হর হর।"

"কিন্তু কথা কি জান? খরিদ্দার আসবার পর যে বলেছিল, 'কেশব! কেশব!" তার মানে এই, এরা সব কে?…যে বললে, 'গোপাল! গোপাল! তার মানে এই এরা দেখছি গোরুর পাল, গোরুর পাল। যে বললে, 'হরি! হরি।' তার মানে এই, যে কালে দেখছি গরুর পাল, সে স্থলে তবে হরি অর্থাৎ হরণ করি। আর যে বললে, 'হর! হর!' তার মানে এই যেকালে গরুর পাল সেকালে সর্বস্ব হরণ কর!" এই তারা পরমভক্ত সাধু!"

ধর্মের ভণ্ডামির মতো এই স্যাকরাদের উদাহরণ রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতির ক্ষেত্রেও কম প্রযোজ্য নয়। তথাকথিত সাম্যবাদী, সমাজতান্ত্রিক গণদরদী জননায়কদের মধ্যে বেশীর ভাগই "হরি হরি" "হর হর" দলের লোক। সুতরাং বাইরের বুলিতে নয়, বুলির অন্তর্নিহিত তাৎপর্যেই এঁদের স্বরূপ।

সংসারে ছোটখাট কাজেও বোকামি আর ভালোমানুষিকে শ্রীরামকৃষ্ণ কখনও একাকার করে ফেলেন নি। উত্তরকালে স্বামী যোগানন্দ, দক্ষিণেশ্বরের চৌধুরীবাড়ীর ছেলে যোগীন একবার

৯। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত (৫ম) পরিশিষ্ট শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীযুক্ত বঙ্কিম: ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

দোকানীর মিষ্টিকথায় ভুলে ফাটা কড়াই নিয়ে এসেছিলেন। রামকৃষ্ণদেব সে কথা শুনেই বললেন, "সে কি রে? জিনিসটা আনলি, তা দেখে আনলি নি? দোকানী ব্যবসা করতে বসেছে—সে তো আর ধর্ম করতে বসে নি? তার কথায় বিশ্বাস করে ঠকে এলি? ভক্ত হবি, তা বলে বোকা হবি? লোকে তোকে ঠকিয়ে নেবে? ঠিক ঠিক জিনিষ দিলে কিনা দেখে তবে দাম দিবি; ওজনে কম দিলে কি না তা দেখে নিবি; আবার যে সব জিনিষের ফাউ পাওয়া যায়, সে সব জিনিষ কিনতে গিয়ে ফাউটি পর্যন্ত ছেড়ে আসবি নি।" [লীলা প্রসঙ্গ : গুরুভাব : দ্বিতীয়ার্ধ]

সহধর্মিণী সারদাদেবীকে তিনি শিখিয়েছিলেন—"গাড়ীতে বা নৌকায় যাবার সময় আগে উঠবে, আর নামবার সময় কোনও জিনিষটা নিতে ভুল হয়েছে কি না—দেখে শুনে সকলের শেষে নামবে।" তাঁর নিজের কখনো কোন জিনিষ ঠিক জায়গায় বা সঙ্গে নিয়ে যেতে ভুল হতো না। আমরা সাধারণতঃ একদিকে বেশী মন দিলে অন্য দিকে অপটু হয়ে পড়ি। কবি, শিল্পী, বৈজ্ঞানিক, অধ্যাপকদের অন্যমনস্কতা তো সুবিদিত। কিন্তু ভাবরাজ্যের রাজা শ্রীরামকৃষ্ণের সর্বময় সিদ্ধির অন্যতম পরিচয় ছিল তাঁর ব্যবহারিক নৈপুণ্যে।

বাংলা ব্যঞ্জনের তিন 'স'—শ, ষ, স-এর উদাহরণ দিয়ে তিনি বলতেন, সহ্যগুণের সমান গুণ নেই। সংসারে থাকতে হলে এই সহনশীলতার প্রয়োজনই সর্বাগ্রে। সহ্যগুণেরই আর এক নাম ভদ্রতা। আবার, অতিভদ্রতার পরিণামে কাপুরুষত্বও অসম্ভব নয়। যোগীন ও নিরঞ্জন—শ্রীরামকৃষ্ণের এই দুই অন্তরঙ্গ শিষ্য সম্বন্ধে তাঁর দু'রকম নির্দেশ এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

কলকাতা থেকে নৌকায় দক্ষিণেশ্বরে আসার পথে যোগীন একবার জনৈক সহযাত্রীর মুখে তাঁর গুরু ও ইষ্ট শ্রীরামকৃষ্ণের নিন্দা শুনেও নিজ ভদ্রস্বভাববশে প্রতিবাদ করেন নি। নিন্দাকারীর অজ্ঞতার

জন্য তাকে দোষী করতে পারেন নি। দক্ষিণেশ্বরে এসে গুরুর কাছে এ ঘটনা বলতেই শ্রীরামকৃষ্ণ স্পষ্ট বললেন—"আমার অযথা নিন্দা করল, আর তুই কি না তাই চুপ করে শুনে এলি। শাস্ত্রে কি আছে জানিস্? গুরুনিন্দাকারীর মাথা কেটে ফেলবে, নয়তো সেই জায়গা ছেড়ে চলে যাবে। তুই মিথ্যা রটনার একটা প্রতিবাদও করলি না?" সহনশীলতা যেখানে আত্মার পরাভব সেখানে আর গুণ নয়, ব্যক্তি বা জাতির পক্ষে সমান অপরাধ।

এমনি আর একদিন নৌকায় দক্ষিণেশ্বরে আসছিলেন নিরঞ্জন। বলিষ্ঠদেহ তেজস্বী নিরঞ্জনের রাগ একটু বেশী ছিল। স্বামীজীর পত্রাবলীতে নিরঞ্জনের লাঠিবাজির উল্লেখ আছে। সেদিনও নৌকার সহযাত্রীরা দক্ষিণেশ্বরের পরমহংসের অযথা নিন্দাবাদ করছিল। নিরঞ্জন সঙ্গে সঙ্গে তীব্র প্রতিবাদ জানালেন। সে প্রতিবাদে তারা কান দিল না দেখে বিশাল দেহ আন্দোলিত করে নৌকা ডুবিয়ে এর প্রতিশোধ নিতে উদ্যত হলেন। হতবুদ্ধি নৌকার যাত্রীরা সকলে মিলে কাকুতি মিনতি ও ক্ষমা প্রার্থনা করে সে যাত্রা উদ্ধার পান। শ্রীরামকৃষ্ণদেব সে কথা শুনে নিরঞ্জনকে তিরস্কার করলেন। বললেন, "সতের রাগ জলের দাগ। হীনবুদ্ধি লোকে কত কি অন্যায় কথা বলে, তা নিয়ে ঝগড়াঝাটি করতে গেলে ও নিয়েই জীবন কাটাতে হয়! তেমন তেমন জায়গায় ভাববি লোক না পোক, ওদের কথা উপেক্ষা করবি। রাগের বশে কি অন্যায় করতে যাচ্ছিলি বল দেখি। দাঁড়ি মাঝিরা তোর কি অপরাধ করেছিল যে সেই গরীবদের উপরেও অত্যাচার করতে গিয়েছিলি?"

[লীলাপ্রসঙ্গ: গুরুভাব: উত্তরার্ধ]

সহ্যশক্তির প্রসঙ্গেই "অহিংসার" কথা এসে পড়ে। জৈন, বৌদ্ধ, বৈষ্ণবপ্রভাবে এদেশে ব্যক্তিগত অধ্যাত্মসমুন্নতির ধর্ম অহিংসা জাতিগত আচার আচরণ নিয়ন্ত্রণ করতে গিয়ে কি বিভ্রাট ডেকে

এনেছে তা আমরা রাজনীতির ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষই দেখতে পাই। পঞ্চাশের মন্বন্তরের সময় ধনী মাড়োয়ারীর চাকর মানুষকে উপেক্ষা করে গোমাতাকে ঘিমাখা রুটি খাওয়াচ্ছে—এতো স্বচক্ষে দেখা ঘটনা। ভাড়াটে খাটিয়ায় ঘণ্টাপিছু ছারপোকাকে দিয়ে রক্ত খাওয়ানোর কাহিনী এ কলকাতা শহরেও একেবারে দুর্লভ নয়। তথাকথিত 'অহিংসার' এই সব আদর্শের পাশাপাশি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দু' একটি বাস্তববুদ্ধিসম্মত আচরণ স্মরণীয়।

দক্ষিণেশ্বরে তাঁর কাপড়চোপড়ের তোরঙ্গে আরশোলা বাসা বেঁধেছে দেখে তিনি যোগীনকে ডেকে বললেন, 'আরশোলাটাকে ধরে বাইরে নিয়ে গিয়ে মেরে ফেল।' বলা বাহুল্য, শান্তস্বভাব যোগীন আরশোলাটা শুধু বাইরেই ফেলে এলেন, দয়ার বশে আর মারলেন না। মারেন নি জানতে পেরে শ্রীরামকৃষ্ণ কিন্তু এই দয়াধর্মের প্রশংসা করলেন না। বললেন, "আমি তোকে মারতে বললাম, তুই কি না সেটা ছেড়ে দিলি। যেমনটি করতে বলব, ঠিক তেমনটি করবি, নইলে ভবিষ্যতে গুরুতর বিষয়েও নিজের মতে চলতে গিয়ে অনুশোচনায় ভুগবি।"

শ্রীরামকৃষ্ণ-অনুগামীদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠভক্ত বলরাম বসু ছিলেন পুরুষানুক্রমে নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব। ধ্যানজপের সময় মশার কামড় সহ্য করা ভালো না দু একটা মেরে ফেলা ভাল, এ নিয়ে তাঁর বৈষ্ণবহৃদয়ে স্বাভাবিক সংশয় জেগেছিল। সামাধানের জন্য একদিন দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে আসছেন। ঘরের দরজায় পা দিয়েই দেখলেন শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের বালিশ থেকে ছারপোকা বেছে বেছে মারছেন। কাছে এসে প্রণাম করতেই বললেন, 'বালিশটায় বড্ড ছারপোকা হয়েছে। দিনরাত কামড়ে কামড়ে অস্থির করছে, ঘুমেরও ব্যাঘাত।' জিজ্ঞাসু বলরামের প্রশ্নের ওইখানেই সমাধান।

সংসারে থাকা ও সংসারীর কর্তব্য সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিজস্ব ধারণা তাঁর কথামৃত-সংগ্রহ থেকে কিছু কিছু উদ্ধৃত করা যাক। মনে রাখতে হবে ঈশ্বরলাভের মানদণ্ডে তিনি সব কিছু বিচার করতেন। সে বিচারে যতক্ষণ ঈশ্বর লাভ হয় নি ততক্ষণ সংসার অনিত্য, আবার ঈশ্বরলাভ করলে সমস্ত সংসারই ঈশ্বরের প্রকাশ। শুধু জ্ঞানীর দৃষ্টিতে নয়, সংসার সম্বন্ধে তাঁর শেষ উপলব্ধি বিজ্ঞানীর অনুভবে, যে অনুভবের প্রেরণায় বিবেকানন্দ লিখেছিলেন—

'বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?'

প্রথম স্তরের সাধকের জন্য তাঁর উপদেশ—"পিঁপড়ের মতো সংসারে থাক, এই সংসারে নিত্য অনিত্য মিশিয়ে রয়েছে। বালিতে চিনিতে মিশান—পিঁপড়ে হয়ে চিনিটুকু নেবে।

জলে দুধে একসঙ্গে রয়েছে। চিদানন্দরস আর বিষয়ের রস। হংসের মতো দুধটুকু নিয়ে জলটি ত্যাগ করবে।

আর পানকৌটির মতো গায়ে জল লাগছে ঝেড়ে ফেলবে। আর পাঁকালমাছের মতো, পাঁকে থাকে কিন্তু গা দেখ পরিষ্কার, উজ্জ্বল।"[১০]

"ও দেশে দেখেছি, সব চিঁড়ে কোটে। একজন স্ত্রীলোক এক হাতে ঢেঁকির গড়ের ভেতর হাত দিয়ে নাড়ছে, আর একহাতে ছেলে কোলে নিয়ে মাই খাওয়াচ্ছে, ওর ভেতর আবার খদ্দের আসছে, তার সঙ্গে হিসাব করছে—'তোমার কাছে ওদিনের এত পাওনা আছে, আজকের এত দাম হ'ল।' এইরকম সে সব কাজ করছে বটে, কিন্তু তার মন সর্বক্ষণ ঢেঁকির মুষলের দিকে আছে; সে জানে যে ঢেঁকিটি হাতে পড়ে গেলে হাতটি জন্মের মতো যাবে।

১০ কথামৃত ১ম ভাগ—১১শ খণ্ড, ৫ম পরিচ্ছেদ।

তেমনি সংসারে থেকে সকল কাজ কর ; কিন্তু মন রেখো তাঁর প্রতি তাঁকে ছাড়লে সব অনর্থ ঘটবে।"[১১]

আবার দ্বিতীয় স্তরের জীবন্মুক্ত সংসারীদের সম্বন্ধে তাঁর উপদেশ—"রামপ্রসাদ বলেছিলেন, এ সংসার ধোঁকার টাটি। কিন্তু হরিপাদপদ্মে ভক্তি লাভ করতে পারলে, এই সংসারই আবার হয় "মজার কুটী।"[১২]

"লুকোচুরি খেলায় যেমন বুড়ি ছুঁলে চোর হয় না, সেই রকম ভগবানের পাদপদ্ম ছুঁলে আর সংসারে বদ্ধ হয় না। যে বুড়ি ছুঁয়েছে, তাকে আর চোর করবার যো নেই। সংসারে সেই রকম যিনি ঈশ্বরকে আশ্রয় করেছেন, তাঁকে আর কোন বিষয়ে আবদ্ধ করতে পারে না।"[১৩]

সংসারী ভক্তদের অন্তরে উৎসাহ উদ্দীপনা সঞ্চারের জন্য তিনি বলতেন—"সংসারের মধ্যে বাস করে যিনি সাধনা করতে পারেন, তিনিই ঠিক বীর সাধক। বীরপুরুষ যেমন মাথায় বোঝা নিয়ে আবার অন্য দিকে তাকাতে পারে, বীর সাধক তেমনি এ সংসারের বোঝা ঘাড়ে করে ভগবানের পানে চেয়ে থাকে।"

"তা সংসারে হবে না কেন? তবে কি জান, মন নিজের কাছে নাই। নিজের কাছে মন থাকলে তবে ত ভগবানকে দেবে। মন বন্ধক দিয়েছ; কামিনী-কাঞ্চনে বন্ধক! তাই সর্বদা সাধুসঙ্গ দরকার।"[১৪]

"তোমরা সংসারে আছ তা ভয় কি? রাম যখন সংসার ত্যাগ করবার কথা বললেন, দশরথ চিন্তিত হয়ে বশিষ্ঠের শরণাগত হলেন। বশিষ্ঠ রামকে বললেন, রাম, তুমি কেন সংসার ত্যাগ করবে? আমার সঙ্গে বিচার করো, ঈশ্বর ছাড়া কি সংসার? কি ত্যাগ করবে, কি বা

১১, ১২, ১৩, স্বামী ব্রহ্মানন্দ-সংকলিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-উপদেশ।

১৪ কথামৃত ৫ম ভাগ—পরিশিষ্ট (চ) ১ম পরিচ্ছেদ।

গ্রহণ করবে। তিনি ছাড়া কিছুই নাই। তিনি "ঈশ্বর মায়া জীব জগৎ' রূপে প্রতীয়মান হচ্ছেন।" [৫]

কিন্তু সেই ঈশ্বর-শরণাগতি ছাড়া সংসার করতে গেলেই ভ্রান্তির সম্ভাবনা। "জলে নৌকা থাকে ক্ষতি নেই, কিন্তু নৌকার ভেতর যেন জল না ঢোকে, তা হলে ডুবে যাবে। সাধক সংসারে থাকুক ক্ষতি নেই, কিন্তু সাধকের মনের ভেতর যেন সংসারভাব না থাকে।" "একজন সমস্ত দিন ধরে আখের ক্ষেতে জল ছেঁচে শেষে ক্ষেতে গিয়ে দেখলে যে এক ফোঁটা জলও ক্ষেতে যায় নি, দূরে কতকগুলো গর্ত ছিল, তা দিয়ে সমস্ত জল অন্য দিকে বেরিয়ে গেছে। সেইরকম যিনি বিষয়বাসনা, সাংসারিক মানসম্ভ্রম ইত্যাদির দিকে মন রেখে সাধনা করেন তিনি যদি সারাজীবন ঈশ্বর-উপাসনা করেন, শেষে দেখতে পাবেন যে ঐ সকল বাসনারূপ ছেঁদা দিয়ে তাঁর সমুদয় বেরিয়ে গেছে।"

সংসার ও ভগবান—দু'কূলই যাঁরা রক্ষা করতে যান, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই তাঁদের সংসারের নানা জটিল বাসনাসূত্রে আবদ্ধ হয়ে ভগবানের কথা ভুলে যেতে হয়। মনের দাঁড়িপাল্লা কখন অজ্ঞাতসারে সংসারের দিকে ঝুঁকে পড়ে, টের পাওয়া কঠিন হয়। নিষ্কাম কর্মের আদর্শে যাঁরা সন্ন্যাসব্রতী, তাঁদেরও কর্মসূত্রে ঈশ্বরবিস্মৃতি অসম্ভব নয়, তবে তাঁদের পক্ষে কর্মত্যাগ যত সহজ, সংসারীর পক্ষে তত কঠিন।

তুলনামূলকভাবে যাঁরা সন্ন্যাসীদের 'পলাতক' আখ্যা দিয়ে নিজেদের সংসার-প্রীতির মহিমায় আত্মমুগ্ধ তাঁদের উদ্দেশে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দু'একটি কথা বিশেষভাবে স্মরণীয়—"সংসারী লোকগুলো তিনজনের দাস। তাদের কি পদার্থ থাকে? মেগের দাস, টাকার দাস মনিবের

৫। কথামৃত (৫ম) ১১শ খণ্ড ৫ম পরিচ্ছেদ

দাস। একজনের নাম করবো না। আটশো টাকা মাইনে কিন্তু মেগের দাস, উঠতে বললে উঠে, বসতে বললে বসে!" [১৬]

কথাগুলির তীব্রতা মারাত্মক, কিন্তু অন্তর্নিহিত সত্য মর্মান্তিক। যথার্থ ত্যাগীর সঙ্গে সাধারণ সংসারীর তুলনা করে শ্রীরামকৃষ্ণের উপমা—"যাঁরা সর্বদা ঈশ্বরে মন দিতে পারে তারা মৌমাছির মতো কেবল ফুলে বসে, মধু পান করে। সংসারে কামিনীকাঞ্চনের ভিতরে যে আছে, তার ঈশ্বরে মন হতে পারে; আবার কখন কখন কামিনীকাঞ্চনেও মন হয়। যেমন সাধারণ মাছি সন্দেশেও বসে, আর পচা ঘায়েও বসে: বিষ্ঠাতেও বসে।" [১৭]

চিরন্তন ও ক্ষণিকের টানাপোড়েনে গড়া সংসারে দু'দিকেই মন পাওয়া স্বাভাবিক। কোন না কোন বাসনাকামনা আছে ব'লেই সংসার। "সংসারী লোকেদের বেশী এগোতে গেলে সংসার টংসার ফক্কা হয়ে যায়।" [১৮] অতদূর অগ্রসর হওয়া বেশীর ভাগ মানুষের পক্ষেই অসাধ্যসাধন ভেবেই উপযুক্ত গৃহীসাধককে শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলতেন—"সংসার একেবারে ত্যাগ করবার কি দরকার? আসক্তি গেলেই হলো। তবে সাধন চাই। ইন্দ্রিয়দের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়। কেল্লার ভিতর থেকে যুদ্ধ করাই আরও সুবিধা—কেল্লা থেকে অনেক সাহায্য পাওয়া যায়।"[১৯]

শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে সংসার-সংগ্রামের অর্থ ইন্দ্রিয়াসক্তির সঙ্গে যুদ্ধ। সে যুদ্ধে প্রতিমুহূর্তের প্রস্তুতি প্রয়োজন। বাইরের সহস্র শত্রু জয়ের চেয়ে নিজের মনকে জয় করা ঢের বেশী শক্ত জেনেই

১৬। কথামৃত (২য়) ১৯ শ খণ্ড ৬ষ্ঠ পবিচ্ছেদ।

১৭। কথামৃত (২য়) ৪র্থ খণ্ড ৩য় পরিচ্ছেদ।

১৮। কথামৃত (৪র্থ) ২য় খণ্ড ২য় পরিচ্ছেদ।

১৯। কথামৃত (৩য় ভাগ) ১০ম খণ্ড ২য় পরিচ্ছেদ।

মানুষ সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর উদ্দেশে প্রণাম করে। সংসারে থাকার অর্থ ধীরে ধীরে সংসারকে অতিক্রম করার প্রস্তুতি। সংসারী এবং সন্ন্যাসী—দু'জনেরই লক্ষ্য এক, পন্থা ভিন্ন। নিজের উদাহরণ দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, "সংসার ভোগের স্থান, এক একটি জিনিষ ভোগ ক'রে অমনি ত্যাগ করতে হয়। আমার সাধ ছিল সোনার গোট পরি। তা শেষে পাওয়াও গেল, সোনার গোট পরলুম; পরার পর কিন্তু তৎক্ষাণাৎ খুলতে হবে।"[২০]

সংসারের আসক্তি পূর্ণমাত্রায় রয়েছে, অথচ দায়িত্বপালনে অক্ষমতাজনিত যে বৈরাগ্য তাকে শ্রীরামকৃষ্ণ কখনো ক্ষমা করেন নি। কথামৃতের প্রথম ভাগে এমন একজনের উল্লেখ করে তিনি বলেছেন, "প্রতাপের ভাই এসেছিল। এখানে কয়দিন ছিল। কাজ কর্ম্ম নাই। বলে, আমি এখানে থাকব। শুনলাম, মাগ ছেলে সব শ্বশুরবাড়ীতে রেখেছে। অনেকগুলি ছেলেপিলে। আমি বকলুম, দেখ দেখি ছেলেপিলে হয়েছে, তাদের কি আবার ওপাড়ার লোক এসে খাওয়াবে দাওয়াবে মানুষ করবে? লজ্জা করে না যে, মাগছেলেদের আর একজন খাওয়াচ্ছে, আর তাদের শ্বশুরবাড়ী ফেলে রেখেছে। অনেক বকলুম, আর কর্ম্ম কাজ খুঁজে নিতে বললুম। তবে এখান থেকে যেতে চায়"

এই দায়িত্বজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে সংসারীর যৌনজীবন সম্বন্ধেও শ্রীরামকৃষ্ণ আদর্শস্থাপন করতে চেয়েছেন। অনিয়ন্ত্রিত দেহসম্ভোগের ফলে অসংখ্য সন্তানলাভের তিনি বিরোধী ছিলেন। একটি দুটি ছেলে-মেয়ে হলে স্বামীস্ত্রীতে ভাইবোনের মতো থাকবে এবং ঈশ্বরচিন্তা করবে এই ছিল তাঁর সংসারজীবনের আদর্শ। বাস্তবিক, বিবাহিতজীবনে পরিপূর্ণ সংযমের আদর্শস্থাপনই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সংসারী হওয়ার কারণ।

২০। কথামৃত (১ম ভাগ)

সাধনা ও সিদ্ধির তুঙ্গশিখরে আরোহণ করেও মানবদেহের বাসনাকামনা রোগ শোক আশা আকাঙ্ক্ষাকে শ্রীরামকৃষ্ণ একেবারে তুচ্ছ করেন নি। মানবজীবনের পরম উদ্দেশ্যের কথা মনে রেখেও ভক্ত শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ('বসুমতী'র প্রতিষ্ঠাতা)-কে তিনি আশীর্বাদ করেছিলেন যাতে ওঁর 'ছোট দরজাটি বড় হয়' অর্থাৎ আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যলাভ ঘটে। যার আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য আছে, তার অনেক পরিমাণে স্বাধীনতাকে তিনি অস্বীকার করেন নি, কিন্তু অর্থকেই জীবনসত্যের মাপকাঠি মনে না করে পরমসত্যের প্রেরণায় অর্থের আসক্তি থেকে মুক্ত হওয়াই যে শ্রেয়সাধনা এইটিই তাঁর জীবনে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। সংসারে কামের শক্তি যে কত প্রবল তা তিনি নিজের জীবনেও অনুভব করেছিলেন। সাধনাবস্থার প্রথম দিকে একবার সাধনপথের এই প্রবলতম বাধার সম্মুখীন হওয়ার কথা তিনি বলেছেন—"কাম চলে যাওয়া কি সহজ ব্যাপার! আমারই ছয়মাস পরে বুক কি করে এসেছিল! তখন গাছতলায় পড়ে কাঁদতে লাগলাম। বললাম, মা! যদি তা হয়, তাহ'লে গলায় ছুরি দিব!"[২১]
যুবক ভক্তদের তিনি বলতেন, কামক্রোধের মোড় ফিরিয়ে দাও। বৈষ্ণবসাধকদের মতো ছয় রিপুর মোড় ফেরানোর সাধনা শেখাতেন —"আত্মার সহিত রমণ করা, এই কামনা। যারা ঈশ্বরের পথে বাধা দেয় তাদের উপর ক্রোধ। তাঁকে পাবার লোভ। 'আমার-আমার' যদি করতে হয়—তবে তাঁকে লয়ে। যেমন—আমার কৃষ্ণ, আমার রাম। যদি অহঙ্কার করতে হয় তো বিভীষণের মতো—"আমি রামকে প্রণাম করেছি, এ মাথা আর কারু কাছে অবনত করবো না।"[২২]
"...কি জানিস্ (তোদের) এখন যৌবনের বন্যা এসেছে! তাই বাঁধ

২১। কথামৃত (৩য়) ১৩শ খণ্ড ২য় পরিচ্ছেদ।

২২। কথামৃত (৪র্থ) ৪র্থ খণ্ড ১ম পরিচ্ছেদ।

দিতে পাচ্ছিস্ না। বান যখন আসে তখন কি আর বাঁধ-টাঁধ মানে? বাঁধ উছলে ভেঙ্গে জল ছুটতে থাকে। লোকের ধানক্ষেতের উপর এক বাঁশ সমান জল দাঁড়িয়ে যায়! তবে বলে—কলিতে মনের পাপ, পাপ নয়। আর মনে এক আধবার কখন কুভাব এসে পড়ে তো—'কেন এল' বসে বসে তাই ভাবতে থাকবি কেন? ওগুলো কখন কখন শরীরের ধর্মে আসে যায়—শৌচ পেচ্ছাপের চেষ্টার মত মনে করবি। শৌচ-পেচ্ছাপের চেষ্টা হয়েছিল বলে কি মাথায় হাত দিয়ে ভাবতে বসে? সেইরকম ওই ভাবগুলোকে অতি সামান্য, তুচ্ছ হেয় জ্ঞান করে মনে আনবি না। আর তাঁর নিকটে খুব প্রার্থনা করবি, হরিনাম করবি ও তাঁর কথাই ভাববি। ও ভাবগুলো এল কি গেল—সেদিকে নজর দিবি না এর পর ওগুলো ক্রমে ক্রমে বাঁধ মানবে।"[২৩]

আসক্তির মোড় ফেরানোর একটি সুন্দর উদাহরণ মেলে মণি মল্লিকের আত্মীয়ার কাহিনীটিতে। এই বিধবা মহিলা নিজের ছোট্ট ভাইপোকে লালন পালন করতেন, ঈশ্বরচিন্তার সময় সেই ভাইপোটির কথাই বিশেষভাবে মনে জাগত। শ্রীরামকৃষ্ণ সব শুনে বললেন, "বেশ তো, তার জন্য যা কিছু করবে, তাকে খাওয়ান পরান ইত্যাদি সব, গোপাল ভেবে করো। যেন গোপালরূপী ভগবান তার ভিতরে রয়েছেন, তুমি তাকেই খাওয়াচ্চ পরাচ্চ, সেবা করচ—এই রকম ভাব নিয়ে করো। মানুষের করচি ভাববি কেন গো? যেমন ভাব তেমন লাভ।" শ্রীরামকৃষ্ণের কথায় ভক্তিমতী মহিলা তাঁর সাধনপন্থার নির্দেশ পেয়ে অতি অল্প সময়ের মধ্যে গোপনভাবে অনেকদূর অগ্রসর হয়েছিলেন।

এমনিভাবে সংসারের নানাস্তরের মানুষের অন্তরের সঙ্গে মিশে গিয়ে

২৩। লীলাপ্রসঙ্গ [গুরুভাব পূর্বার্দ্ধ, ১ম অধ্যায়]

তাদের মনের ধারাটি ঈশ্বরাভিমুখী করে দেওয়ার এক সহজাত ক্ষমতা ছিল শ্রীরামকৃষ্ণের। সাধারণ অর্থে সংসার তিনি করেন নি। কিন্তু বহুদর্শী অভিজ্ঞতার সঙ্গে সাধনলব্ধ অন্তর্দৃষ্টির যোগে মানবমনের অন্তরতম অনুভূতি তাঁর কাছে স্পষ্ট প্রত্যক্ষ হয়ে উঠত। সংসার থেকে একটু দূরে ছিলেন বলেই সংসারের যথার্থ স্বরূপ তাঁর কাছে ধরা দিয়েছিল।

জীবনের গভীরতম শোকের মুহূর্ত তাঁর জীবনেও এসেছে। মৃত্যুর বিচ্ছেদ-বেদনার সামনে দাঁড়িয়ে এই জীবন্মুক্ত সাধক আত্মার দেহান্তর প্রত্যক্ষ করতে করতে আনন্দে অধীর হয়ে উঠেছেন, আবার সংসারের সমভূমিতে ফিরে এসে সেই তীব্র বিচ্ছেদ জ্বালা মর্মে মর্মে অনুভব করে নিখিল মানবের ব্যথায় ব্যথী হয়ে উঠেছেন। প্রিয় ভ্রাতুষ্পুত্র অক্ষয়ের মৃত্যুর কথা স্মরণ করে পরবর্তীকালে তিনি বলেছিলেন—"অক্ষয় মোলো, তখন কিছু হ'ল না। কেমন করে মানুষ মরে, বেশ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলুম। দেখলুম—যেন খাপের ভেতর তলোয়ারখানা ছিল, সেটাকে খাপ থেকে বার করে নিলে; তলোয়ারের কিছু হলো না—যেমন তেমনি থাকলো, খাপটা পড়ে রইল! দেখে খুব হাসলুম, গান করলুম, নাচলুম! তার শরীরটাকে তো পুড়িয়ে ঝুড়িয়ে এল! তার পরদিন ঐখানে দাঁড়িয়ে আছি আর দেখছি কি, যেন প্রাণের ভিতরটায় গামছা যেমন নিঙড়ায় তেমনি নেংড়াচ্ছে, অক্ষয়ের জন্য প্রাণটা এমনি কচ্চে! ভাবলুম, মা, এখানে পোঁদের কাপড়ের সঙ্গেই সম্বন্ধ নেই, তা ভাইপোর সঙ্গে তো কতই ছিল। এখানেই যখন এরকম হচ্চে, গৃহীদের শোকে কি না হয়।—তাই দেখাচ্চিস বটে!"

পুত্রশোকাতুর মণিমল্লিককে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে উপরের কথাগুলি বলেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। তবু এই শোকের গভীরতা স্বীকার করে নিলেও শোকের সঙ্গে সংগ্রামই তাঁর বাণী। মহাকাল মৃত্যুর সঙ্গে

সংগ্রামের বীররসমণ্ডিত দাশরথির গানটিও তিনি সেদিন মণিমল্লিককে শুনিয়েছিলেন—

জীব সাজ সমরে।
ঐ দেখ রণবেশে কাল প্রবেশে তোর ঘরে॥

দুঃখ বিপদের অগ্নিপরীক্ষার মুখোমুখি হয়েই তো অধ্যাত্ম জীবনের সার্থকতা আরো বেশী করে উপলব্ধি করা যায়। ঈশ্বর পরায়ণ আর নিরীশ্বর সংসারীর পার্থক্য তখনই ধরা পড়ে। মণিমল্লিকের পুত্রশোক উপলক্ষ্য করেই শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন, "তবে কি জান? যারা তাঁকে ধরে থাকে তারা এই বিষম শোকেও একেবারে তলিয়ে যায় না। একটু নাড়াচাড়া খেয়েই সামলে যায়। চুনোপুঁটির মত আধারগুলো একেবারে অস্থির হয়ে ওঠে বা তলিয়ে যায়। দেখনি? গঙ্গায় ষ্টিমারগুলো গেলে জেলেডিঙ্গিগুলো কি করে? মনে হয় যেন একেবারে গেল—আর সামলাতে পারলে না। কোনখানা বা উল্টেই গেল। আর বড় বড় হাজারমুণে কিস্তিগুলো দু'চার বার টাল মাটাল হয়েই যেমন তেমনি স্থির হলো। দু'চার বার নাড়াচাড়া কিন্তু খেতেই হবে।"

ঠিক ঠিক ঈশ্বরপরায়ণ ব্যক্তির সমগ্র জীবন থেকে ভগবৎসত্যের জ্যোতি বিচ্ছুরিত হয়। তার পা কখনো বেচালে পড়ে না। শ্রীরামকৃষ্ণের সংসার সেই ঈশ্বরপরায়ণতার সাধনা। সংসারীদের একজন হয়েই তিনি দক্ষিণেশ্বরে এসেছিলেন। পূর্বপুরুষদের ধারা অনুসারে ভক্তি পরায়ণ গৃহস্থ হবেন—এই তাঁর ধারণা ছিল। সন্ন্যাসী হবেন—একথা আগে থেকেই ভাবেন নি। কিন্তু মাতৃপদে সমর্পিতপ্রাণ এই সাধকের সমগ্র জীবনধারা প্রচলিত সংসার ও প্রচলিত সন্ন্যাস—এ দুয়েরই পরম আদর্শের সম্মেলনে এক অপূর্ব গৃহী ও অপূর্ব সন্ন্যাসীর সৃষ্টি করলো—পৃথিবীর ইতিহাসে অতুলনীয় সে জীবন—গৃহী ও সন্ন্যাসী দু'দলেরই সমান আদর্শ। নাগ মহাশয় ও স্বামী বিবেকানন্দে এ দুই আদর্শের দুই চূড়ান্ত নিদর্শন।

অপূর্ব সন্ন্যাসী

শ্রীরামকৃষ্ণ-মানসপুত্র স্বামী ব্রহ্মানন্দ সম্বন্ধে একটি গল্প শুনেছি। সন তারিখের হিসাব দেওয়া যাবে না। কিন্তু গল্পটিতে ভারতবর্ষের ধর্মচিন্তার যে বিচিত্র ও বিশিষ্ট প্রকাশ রয়েছে, সেইটি লক্ষণীয়।

বেলুড়মঠে পাদচারণারত স্বামী ব্রহ্মানন্দকে দেখে দু'জন মঠ-দর্শনার্থী ভক্ত গৃহস্থ তাঁকে নমস্কার করলেন। ব্রহ্মানন্দ প্রশ্ন করলেন, আপনারা আমায় প্রণাম করলেন কেন? উত্তরে তাঁরা বললেন, "আপনি সন্ন্যাসী. ভগবানের জন্য সংসার ত্যাগ করেছেন, আপনাকে প্রণাম করবো না?" ব্রহ্মানন্দ অমনি করজোড়ে তাঁদের নমস্কার করে বললেন, "আর আপনারা সংসারের জন্য সেই ভগবানকে ত্যাগ করেছেন, আপনাদের প্রণাম।"

সন্ন্যাস এবং সংসার—এ নিয়ে বুদ্ধিজীবী মহলে লড়াইয়ের অন্ত নেই। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সন্ন্যাস একটি বাতিল সংস্কার। সংসারপ্রীতি তথা মানবপ্রেম আজকের দিনের মননশীল সমাজে সবচেয়ে শ্রদ্ধার বস্তু। উনিশ শতকের কোম্‌ত্‌ থেকে বিশ শতকে জাঁ পল সার্তর অবধি মানবিকতাবাদী দার্শনিক ও চিন্তানায়কেরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ঈশ্বর বা অধ্যাত্মচিন্তাকে অনাবশ্যক ভেবে বাতিল করেছেন এবং তার জায়গায় নিজেদের মনোমত দর্শন বা বিজ্ঞানের কোন চিন্তাসূত্রকে মানবভাগ্যবিধাতার সম্মান দিতে চেয়েছেন। বলা বাহুল্য, মুষ্টিমেয় শিক্ষিতসমাজে এঁদের সাময়িক প্রাধান্য ঘটলেও ঈশ্বরচেতনার পরিবর্তে কোন স্থায়ী অধ্যাত্ম সম্পদ এঁরা মানবচিত্তে এখনো সঞ্চার করতে পারেন নি। পরিবর্তনশীল বস্তুবিশ্বে শাশ্বত সত্যের সন্ধানী মাত্রেই কেবলমাত্র মতবাদে আস্থাহীন, তাঁরা প্রত্যক্ষ জীবন চান।

আর সেই—জীবনের জ্যোতির্ময় পবিত্রতা যখন নিমেষে অন্তরের সব সংশয় ও কালিমা দূর করে আমাদের অভয় সত্তায় প্রতিষ্ঠিত করে, তখন মতবাদের বিতর্ক কেবল বুদ্ধির ব্যায়াম বলে মনে হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণের কথানুসারে 'আম খেতে এসেছ, আম খেয়ে যাও। কত ডাল কত পাতা অত হিসাবে দরকার কি?'

কিন্তু হিসাব যারা করে, তারা আমের কথা ভুলতে রাজী, সংখ্যাতত্ত্বই তাদের কাছে বড়ো সত্য। তারা নমস্কারের যোগ্য সন্দেহ নেই। আর, তারাই জগৎ সংসারের বেশীর ভাগ মানুষ। তাদের কাছে ক্বচিৎ কখনো জীবনের পরম সার্থকতার প্রশ্ন উদ্ভাসিত হতে পারে। কিন্তু সে প্রশ্নের মীমাংসার দিকে তাদের দৃষ্টি থাকে না, থাকলে সহজ জীবন যাপন অসম্ভব হয়ে ওঠে।

অথচ, একটি কথা আমাদের প্রতিদিনের সংসারেই স্পষ্ট প্রমাণিত। আমাদের কোন বিদ্যা বা সিদ্ধিই অনেক পরিমাণ আত্মত্যাগ ছাড়া অসম্ভব। যিনি ছবি আঁকেন, বাঁশী বাজান, কবিতা লেখেন বা গবেষণারত—তাঁদের প্রত্যেকের সার্থকতা কত দীর্ঘ অনুশীলন এবং সেই অনুশীলনের জন্য আর সব আপাত সুখ বিসর্জনের ফল—সেকথা সহজেই অনুমেয়। কিছু ছেড়েছি বলেই আমরা সংসারে কিছু পেয়েছি। যা হাতের মুঠোয় আসে তাই গ্রহণ করতে গেলে কোনটাই আমাদের নিজস্ব হতো না।

বিবেকানন্দের উদাহরণ অনুসারে ভাবা যায়, পর পর সাজান কয়টি বই রয়েছে। সব শেষের বইটিকে নিতে হলে আগের বইগুলি সরাতে হবে। একটিকে না সরালে আর একটিকে পাওয়া যাবে কেমন করে?

শ্রীরামকৃষ্ণের উপমায় বনের মধ্যে রাম আগে, সীতা মাঝখানে, পিছনে লক্ষ্মণ চলেছেন। সীতা যখন মাঝে মাঝে সরে যান, তখনই লক্ষ্মণ রামচন্দ্রকে দেখতে পান।

পরম সত্যকে যদি আমরা চাই, তবে মন থেকে চরম ত্যাগের প্রয়োজন। সেই চরম ত্যাগেরই আর এক নাম সন্ন্যাস।

সাধারণতঃ সংসারত্যাগকে পলায়নীমনোবৃত্তির লক্ষণ বলাই আজকালকার বুদ্ধিজীবীদের ফ্যাশন। আসলে কী থেকে কে পলায়ন করছে, সেদিকটি আমরা ভেবে দেখি না। যদি সত্যের মুখোমুখি হবার জন্য দেশপ্রেমিকের আত্মাহুতি, বৈজ্ঞানিকের মৃত্যুবরণ, বা শিল্পীর অনন্যসাধনা কোন অপরাধ না হয়ে থাকে, তাহ'লে, ভগবান-লাভের জন্য সংসার-বাসনা ত্যাগেও কোন লজ্জার কারণ নেই। বরং এই সর্বস্বত্যাগের দ্বারাই মানুষ যে কোন ইন্দ্রিয় বা বস্তুর দাস নয়, প্রভু—সেই মহৎ সত্যের উন্মোচন ঘটে। মানবজীবনের সঙ্গে প্রকৃতির নিগূঢ় ঐক্য যতখানি সত্য, তার চেয়ে বড়ো সত্য মানুষই প্রকৃতিকে অতিক্রম করতে পারে।

উদাহরণস্বরূপ বলা চলে, পশুসমাজে 'বিবাহ' কোন নির্দিষ্ট নিয়মাবদ্ধ নয়। মানবসমাজেই ইন্দ্রিয়াসক্তিকে বিবাহের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করে একটি কল্যাণময় রূপ দেবার চেষ্টা হয়েছে। আবার মানুষই সম্পূর্ণ ইন্দ্রিয়প্রভাবমুক্ত হয়ে এই পার্থিব দেহমনকে অবলম্বন করেই শাশ্বত সত্য ও আনন্দের অধিকারী হয়ে ওঠে। বুদ্ধ বা খ্রীষ্টের জীবন এই মানবাত্মারই পরিপূর্ণ প্রকাশ প্রচেষ্টা।

বাইরের এই সংসারসত্যের অন্তরালে চিরন্তনের অনুসন্ধানের অধিকারী যে মানুষ—তার জীবনের সার্থকতা দেশ, কাল, সমাজ বা জাতির মধ্যে আবদ্ধ নয়। লোকশ্রেয় যে কি—তা কেবল সমাজসেবী, বৈজ্ঞানিক বা রাজনীতিবিদেরাই নির্দিষ্ট করে দিতে পারেন না। মানবজীবনের অনন্ত জটিলতায় প্রবেশ করে যাঁরা আমাদের বেদনার মূল উৎসের সন্ধান পেয়েছেন, একমাত্র তাঁরাই যথার্থ লোকশ্রেয়-সাধনের অধিকারী। এদিক থেকে বিচার করলে বুদ্ধ, খ্রীষ্ট, শঙ্কর, শ্রীচৈতন্য বা শ্রীরামকৃষ্ণ—এঁরা মানবজাতির যে সর্বাঙ্গীন কল্যাণসাধন

করেছেন, তার তুলনা তথাকথিত ‘জীবনপ্রেমিক’ বুদ্ধিজীবিদের মধ্যে মেলে না। এঁদের সন্ন্যাস কেবলমাত্র সংসারবিমুখতা নয়, বরং মানবমঙ্গলের গভীরতম প্রেরণাই এঁদের বৈরাগ্যের মূলে।

বুদ্ধজীবন সম্বন্ধে ভগবানে বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী সকলেই শ্রদ্ধা ও আগ্রহ পোষণ করেন। তার মূল কারণ বোধ করি এই যে, বুদ্ধদেব ভগবান আছেন কি নেই এই নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে জগতে দুঃখ আছে এবং দুঃখমোচনের প্রয়োজন আছে এই তত্ত্বটির উপরেই বেশি করে জোর দিয়েছেন। বিবেকানন্দ বলতেন, “বুদ্ধদেব আমার ইষ্ট, আমার ঈশ্বর। তাঁহার ঈশ্বরবাদ নাই—তিনি নিজে ঈশ্বর, আমি বিশ্বাস করি।”[১] বুদ্ধভক্তির উজ্জ্বলতম উদাহরণ এই উদ্ধৃতিটি বিবেকানন্দ তথা উনিশ শতকের বুদ্ধিজীবীসমাজে বুদ্ধপ্রভাবের অন্যতম সুন্দর সাক্ষ্য।

কিন্তু স্বামীজীর বুদ্ধভক্তি কেবলমাত্র বুদ্ধের অতুলনীয় করুণার জন্যই নয়। যে ধর্ম বেদ-বেদান্তে আবদ্ধ ছিল, সেই ধর্মকেই সর্বসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্যই তিনি বুদ্ধদেবকে ভারতীয় চিন্তাধারার অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষা বলে প্রণাম করেছেন। তাঁর মতে “উপনিষদের উপর বুদ্ধের ধর্ম উঠেছে, তার উপর শঙ্করবাদ।”[২]

স্বামীজীর দৃষ্টিতে জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ মানব বুদ্ধ। বুদ্ধহৃদয় তাঁকে যতখানি মুগ্ধ করেছে এমন এক শ্রীরামকৃষ্ণ ছাড়া আর কেউ নয়। তবু, বুদ্ধমনীষার দিকটিও আমাদের বিচার্য। বস্তুতঃ বুদ্ধধর্ম মূলতঃ মননের ধর্ম, জ্ঞানযোগের বিষয়। তাঁর নির্বাণতত্ত্ব বেদান্তের মোক্ষতত্ত্বের মতোই দুরূহ মননেরই অধিগম্য। অথচ মানবকল্যাণে তাঁর আত্মদানের জন্য বিশ্ববাসীর যে শ্রদ্ধা তিনি অর্জন করেছেন, সন্ন্যাস ছাড়া তা সম্ভব হতো কি ?

১। স্বামীজীর বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : পত্রাবলী পৃঃ ৩১৩

২। তদেব।

ভারতীয় চতুরাশ্রমের আদর্শে সন্ন্যাসের উল্লেখ থাকলেও গৃহজীবনই আমাদের ধর্মসাধনার মূলকেন্দ্র। সন্ন্যাস জীবনের শেষপ্রান্তের কথা। ভগবান বুদ্ধই আমাদের ধর্মচেতনাকে গৃহের অঙ্গন থেকে সন্ন্যাসের অনন্ত আকাশে মুক্তি দিয়েছেন। অথচ তাঁর মতো মানবপ্রেমিক ইতিহাসে ক'জন মেলে?

বুদ্ধ থেকে বিবেকানন্দ অবধি ভারতের ধর্মেতিহাসের মহামানবেরা সকলেই সন্ন্যাসী। পরমসত্যলাভের অন্য কোন আপোষপন্থা আর ভারতে গৃহীত হওয়া সম্ভব হয় নি। অথচ তপোবনের ঋষিরা অনেকেই সংসারজীবনকেই সাধনক্ষেত্রে রূপান্তরিত করে শ্রেষ্ঠ অধ্যাত্ম অনুভূতির প্রমাণ রেখে গেছেন। ভারতীয় চেতনায় সন্ন্যাসের অবিসম্বাদিত প্রাধান্যের কারণ যে বুদ্ধজীবন, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

বুদ্ধপ্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন—"বুদ্ধ কি জান? বোধস্বরূপকে চিন্তা করে করে—তাই হওয়া—বোধস্বরূপ হওয়া।"[৩]

বুদ্ধদেবের "নাস্তিক্য"-সম্বন্ধে তাঁর মত—"নাস্তিক কেন? নাস্তিক নয়, মুখে বলতে পারে নাই।" "নাস্তিক কেন হতে যাবে! যেখানে স্বরূপকে বোধ হয়, সেখানে অস্তি নাস্তির মধ্যের অবস্থা।"[৪]

"...তিনি দশাবতারের ভিতর একজন অবতার। ব্রহ্ম অচল, অটল, নিষ্ক্রিয় বোধস্বরূপ। বুদ্ধি যখন এই বোধস্বরূপে লয় হয় তখন ব্রহ্ম-জ্ঞান হয়, তখন মানুষ বুদ্ধ হয়ে যায়।"[৫]

বুদ্ধজীবনের এই অধ্যাত্ম উপলব্ধির সত্যটি মনে না রেখে অনেকেই বুদ্ধদেবের নিরীশ্বরতার সঙ্গে আধুনিক সংশয়কে একাকার করে দেখেন। তার ফলে ড্রয়িংরুমের উপকরণ হিসাবে বুদ্ধমূর্তি যতটা

৩, ৪ কথামৃত: তৃতীয়

৫ কথামৃত: পঞ্চম।

সমাদৃত হয়েছে, বুদ্ধজীবনচর্যা তার শতাংশও সম্ভব হয় নি। পরিপূর্ণ বৈরাগ্য ছাড়া বুদ্ধজীবনের মর্মার্থ উপলব্ধি সম্ভব নয়। তবু যাঁরা অতটা বৈরাগ্যের অধিকারী নন, তাঁদের পক্ষে বুদ্ধদেবের চরম ত্যাগের আদর্শটি ভুলে গেলে চলবে না।

সন্ন্যাসের প্রথম উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই "আত্মোপলব্ধি।" জগৎজাল ছিন্ন করে যে কেশরী স্বয়ং মুক্ত হয়েছে সেই অন্যকে মুক্ত করতে পারে। কিন্তু তার চেয়েও বড় আদর্শ সেই অন্যকে মুক্ত করার সঙ্কল্প। "আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ"—আপন মুক্তির জন্য এবং জগতের কল্যাণের জন্য সন্ন্যাসী হলেও বুদ্ধ, খ্রীষ্ট, শঙ্কর, শ্রীচৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ প্রমুখ সন্ন্যাসীদের জীবনধারণই জগৎকল্যাণের জন্য। বলা বাহুল্য, রোগ শোক দুঃখ দারিদ্র্য থেকে মানুষকে মুক্ত করা এই জগৎকল্যাণের প্রধান উদ্দেশ্য নয়। জগতের হিত বলতে এখানে সর্বমানবের আত্মোপলব্ধির আবরণ অপসারিত করাই বোঝায়, যদিও পার্থিব দুঃখমোচনের সঙ্গে তার বিরোধ নেই। চৈতন্যদেবের আচণ্ডালে প্রেমবিতরণ আমাদের মুগ্ধ করে, নিমাই-সন্ন্যাসের বেদনা আজও বাঙালীচিত্তের করুণরস উদ্দীপনে অদ্বিতীয়। কিন্তু সে সন্ন্যাসের সর্বস্বত্যাগী নির্মমতার প্রয়োজন ছিল বৃহত্তর কল্যাণের উদ্দেশ্য। শ্রীচৈতন্যাদি অবতার পুরুষের জীবনকে শ্রীরামকৃষ্ণ আগে ফল তার পর ফুলের উদাহরণ হিসাবে দেখেছেন। এঁরা আগে ঈশ্বর লাভ করেছেন, তারপর সংসার ত্যাগ করেছেন লোক শিক্ষার জন্য।

সন্ন্যাসীর এই লোক শিক্ষকের ভূমিকার কথা মনে রেখেই শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন—"সাধু সন্ন্যাসী নিজের মঙ্গলের জন্য কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ করবে। আবার নির্লিপ্ত হলেও, লোকশিক্ষার জন্য কাছে কামিনী-কাঞ্চন রাখবে না। ন্যাসী—সন্ন্যাসী—জগদ্‌গুরু! তাকে দেখে তবে তো লোকের চৈতন্য হবে।"

শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের নানান্ মিলের মধ্যে অন্যতম মিল পুরী সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীর কাছে দীক্ষা গ্রহণে। মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য ঈশ্বরপুরী থেকে আরম্ভ করে শ্রীরামকৃষ্ণ-গুরু তোতাপুরী অবধি গুরু পরম্পরায় বাংলাদেশের সন্ন্যাসসাধনার ধারাবাহিকতা লক্ষণীয়। কিন্তু চৈতন্যদেবের বিষ্ণুপ্রিয়ার মতো শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সারদামণিকে সন্ন্যাসের অনুরোধে স্বামী থেকে একান্ত দূরে বাস করতে হয় নি। ব্রহ্মজ্ঞ শ্রীরামকৃষ্ণ পত্নীর একান্ত সান্নিধ্যে থেকেও মুহূর্তের জন্য ব্রহ্মপ্রতিষ্ঠাবিচ্যুত হন নি। বরং সংসারের গণ্ডীর মধ্যে থেকেই বহিঃসন্ন্যাসের চিহ্ন ধারণ না করেও যথার্থ সন্ন্যাসে প্রতিষ্ঠিত থাকার আদর্শ তাঁর জীবনে পরিস্ফুট। বিষ্ণুপ্রিয়ার বিরহতপস্যার প্রতিরূপ রয়েছে সারদাদেবীর সুদীর্ঘ বৈধব্য জীবনে। অনুক্ষণ শ্রীরামকৃষ্ণ-চিন্তায় সে বিরহ ইষ্টতন্ময়তায় ভরপূর।

তবু, তোতাপুরীর কাছে আনুষ্ঠানিক সন্ন্যাস শ্রীরামকৃষ্ণ গ্রহণ করেছিলেন। মায়ের হৃদয়ে ব্যথা দেন নি এবং সহধর্মিনীকে যথার্থই ধর্মের অংশভাগিনী করে আপন সাধনার উত্তরাধিকার দিয়েছেন, এসব কথাই সত্য হলেও তাঁর পূর্ণ অনাসক্ত চিত্ত কখনো কামিনী-কাঞ্চন সম্ভোগের সঙ্গে ঈশ্বরলাভের আপোষ করে নি।

প্রশ্ন উঠতে পারে, সত্যোপলব্ধির জন্য বহিঃসন্ন্যাসের প্রয়োজন কি? আত্মজ্ঞান কি বিশেষ অনুষ্ঠান নির্ভর?

প্রসঙ্গতঃ ঊনবিংশ শতাব্দীর একটি ঘটনা স্মরণীয়। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার জন্য মনে মনে একজন সম্পাদক খুঁজছিলেন। ঈশ্বরগুপ্তের মারফৎ অক্ষয়কুমার দত্তের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। সম্পাদকরূপে অক্ষয় কুমারকে নিয়োগের দ্বারা বাংলা সাহিত্যের এক নূতন যুগের সূচনা হয়েছিল। কিন্তু এই সম্পাদক নিযুক্তিপ্রসঙ্গে দেবেন্দ্রনাথের মন্তব্য লক্ষ্য করার মতো—"...অক্ষয় কুমার দত্তের রচনা দেখিয়া আমি তাঁহাকে মনোনীত করিলাম। তাঁহার এই রচনাতে

গুণ ও দোষ দুইই প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম। গুণের কথা এই যে, তাঁহার রচনা অতিশয় হৃদয়গ্রাহী ও মধুর। আর দোষ এই যে, ইহাতে তিনি জটাজূটমণ্ডিত ভস্মাচ্ছাদিতদেহ তরুতলবাসী সন্ন্যাসীর প্রশংসা করিয়াছিলেন। কিন্তু চিহ্নধারী বহিঃসন্ন্যাস আমার মত-বিরুদ্ধ। আমি মনে করিলাম, যদি মতামতের জন্য নিজে সতর্ক থাকি, তাহা হইলে ইঁহার দ্বারা অবশ্যই পত্রিকা সম্পাদন করিতে পারিব।" [আত্মজীবনী]

দেবেন্দ্রনাথের এই মনোভঙ্গী মোটামুটিভাবে উনিশ-শতকের শিক্ষিত সমাজের প্রতিনিধিস্থানীয়। অবশ্য অক্ষয়কুমার পরবর্তীকালে "ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়" লিখলেও অধ্যাত্মজীবনের চেয়ে আধুনিক বিজ্ঞানই তাঁকে বেশী আকৃষ্ট করেছিল। সেদিক থেকে দেবেন্দ্রনাথ তাঁকে নিজের ইচ্ছামতো পরিচালনা করতে বিশেষ সক্ষম হন নি। তবু ব্রাহ্মসমাজের ভগবৎচিন্তা গৃহধর্মকেই প্রাধান্য দিয়েছে। আর ইয়োরোপীয় চিন্তাধারায় প্রভাবিত সেকালের ধর্মনিরপেক্ষ "হিন্দু" ছাত্রেরা অধিকাংশই যে সন্ন্যাসের চিন্তা আদৌ করতেন না—সেকথা সহজেই অনুমেয়।

তবু আশ্চর্যের কথা এই, ইয়ং বেঙ্গলের চিন্তাগুরু ডিরোজিওর একজন শিষ্য সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন, একথা শিবনাথশাস্ত্রীর "রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজে" রয়েছে। কৌতূহলী পাঠকবৃন্দের জন্য সেই সন্ন্যাসীর প্রসঙ্গটি এক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক মনে করে উদ্ধৃত করছি—"একবার বোম্বাই প্রদেশে গিয়া তথাকার প্রার্থনাসমাজের সুযোগ্য ও সম্মানিত সভ্য পরলোকগত নারায়ণ মহাদেব পরমানন্দ মহাশয়ের মুখে শুনিলাম যে, তাঁহাদের যৌবনকালে বোম্বাই সহরে এক অদ্ভুত সন্ন্যাসী দেখা দিয়াছিলেন। তাঁহার অবলম্বিত নামটি এখন বিস্মৃত হইয়াছি। তিনি ইংরাজী ভাষাতে সুশিক্ষিত ছিলেন। সন্ন্যাসী বোম্বাই হইতে গুজরাটের সমীপবর্তী কাটিওয়াড় প্রদেশে

গমন করিলেন। কিছুদিন পরে বোম্বাইয়ের প্রসিদ্ধ কোনও সংবাদপত্রে "midgovermment at Katiwad"—"কাটিওয়াড়ে অরাজকতা" নাম দিয়া পত্রসকল মুদ্রিত হইতে লাগিল। ঐ সকল পত্রে এমন বিজ্ঞতা, রাজনীতিজ্ঞতা ও লোকচরিত্রদর্শনক্ষমতার পরিচয় ছিল যে, কয়েকখানি পত্র মুদ্রিত হইতে না হইতে চতুর্দিকে সেই চর্চা উঠিয়া গেল। রাজপুরুষদিগের দৃষ্টিও সেদিকে আকৃষ্ট হইল। কাটিওয়াড়ের রাজা অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন কে এই সকল লিখিতেছে। ক্রমে সন্ন্যাসী ধরা পড়িলেন। সন্ন্যাসী কিছুই গোপন করিলেন না; রাজাকে বলিলেন,—"আপনার প্রজারা আমার নিকট আসিয়া কাঁদে, তাই তাহাদের দুঃখে দুঃখী হইয়া লিখিয়াছি। ইচ্ছা হয়, আপনি শাসনকার্যের উন্নতি করুন, নতুবা আপনার যেরূপ অভিরুচি হয় করুন।" রাজা সন্ন্যাসীকে কারাগারে নিক্ষেপ করিলেন। সন্ন্যাসী একবর্ষকাল কারাদণ্ড ভোগ করিলেন। এদিকে দেশময় প্রবল আন্দোলন চলিল। একবর্ষ পরে রাজা সন্ন্যাসীকে কারামুক্ত করিয়া তাঁহাকে প্রধানমন্ত্রীর পদ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। সন্ন্যাসী বলিলেন—"আমার রাজপদের লালসা নাই, থাকিলে সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করিব কেন? তবে মহারাজ যদি দেশে সুশাসন করিতে চান, সে বিষয়ে পরামর্শ দিতে পারি।" তদবধি সন্ন্যাসীর রাজত্ব আরম্ভ হইল। সন্ন্যাসী প্রথম পরামর্শ এই দিলেন যে, "পুরাতন উৎকোচগ্রাহী কর্মচারীদিগকে পদচ্যুত করিয়া তৎ তৎ পদে ইংরাজী শিক্ষিত ও ইংরাজ গভর্নমেণ্টের কার্যকলাপে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগকে নিযুক্ত করিতে হইবে।" তদনুসারে সন্ন্যাসী বোম্বাই সহরে আসিলেন, এবং একদল ইংরাজী শিক্ষিত কর্মচারী লইয়া গেলেন। নারায়ণদেব পরমানন্দ মহাশয় সেই সঙ্গে গিয়াছিলেন। তাঁহার মুখে শুনিয়াছি তাঁহারা প্রায় একবৎসর কাল সন্ন্যাসীর অধীনে থাকিয়া রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। তৎপরে পূর্বপদচ্যুত কর্ম-

চারীদিগের চক্রান্তে রাজার আবার মতিভ্রম হইল, এবং এই আদেশ প্রচার হইল যে, সন্ন্যাসীর দলকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে কাটিওয়াড় ছাড়িয়া যাইতে হইবে। তদনুসারে সন্ন্যাসীর সহিত তাঁহারা সকলে চলিয়া আসিলেন। তাঁহার মুখে শুনিয়াছি সন্ন্যাসী তাঁহাদের নিকট তাঁহার গুরু ডিরোজিওর নাম সর্বদা করিতেন এবং তাঁহার অশেষ প্রশংসা করিতেন। আমি কলিকাতায় ফিরিয়া রামতনু লাহিড়ী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম তাঁহাদের দলের মধ্যে কে সন্ন্যাসব্রত লইয়া দেশত্যাগী হইয়াছিলেন, তিনি বলিতে পারিলেন না।"[৬]

লোককল্যাণে সন্ন্যাসীর রাজগুরুর ভূমিকা গ্রহণ এদেশে নূতন কিছু নয়। শিবাজীগুরু রামদাস স্বামী থেকে এ যুগের ক্ষেত্রা, মহীশূর, রামনাদ প্রভৃতি সামন্তরাজ্যের রাজগুরু স্বামী বিবেকানন্দ অবধি অনেক উদাহরণই এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে। তবু স্বামীজীর আগেই ইংরেজীশিক্ষিত সেযুগের ইয়ং বেঙ্গলের একজন—বিশেষতঃ ডিরোজিওর শিষ্যদের অন্যতম—তিনি যে সন্ন্যাস গ্রহণ করে লোক কল্যাণে আত্মনিয়োগ করেছিলেন এ দৃষ্টান্ত আমাদের বিশেষভাবে স্মরণীয়। অবশ্য ডিরোজিও আস্তিক্য বা নাস্তিক্য কোনটির উপরেই নিশ্চিত আস্থা রাখতেন না এবং তাঁর শিষ্যদের অধিকাংশই ঈশ্বর-পরায়ণ ছিলেন। কিন্তু ভারতীয় অধ্যাত্মচেতনা এবং পাশ্চাত্য রাজনৈতিক শিক্ষার যে সুন্দর সম্মেলন তাঁর অনামা সন্ন্যাসী শিষ্যটির মধ্যে দেখতে পাই, তা ভারতীয় সন্ন্যাস আদর্শ সম্বন্ধে আমাদের শ্রদ্ধান্বিত করে।

ভারতের অধ্যাত্ম ইতিহাসে বৌদ্ধসঙ্ঘের পর থেকে ধর্মজীবন প্রধানতঃ সন্ন্যাসীদের কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে। উনিশ শতকে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাবের আগে ও পরে অনেক সাধুসন্ন্যাসী দেখা

৬। রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ, নিউ এজ সংস্করণ পৃঃ ৯৯-১০০।

দিয়েছেন। রাজা রামমোহনের গুরু হরিহরানন্দ স্বামী, কাশীর বিখ্যাত ত্রৈলঙ্গস্বামী, ভাস্করানন্দ, দয়ানন্দ, ভগবানদাসবাবাজী, পওহারীবাবা, গঙ্গামায়ী প্রভৃতির সাধনা ও সিদ্ধির কথা সুবিদিত। এঁদের মধ্যে ত্রৈলঙ্গস্বামীকে শ্রীরামকৃষ্ণ শিবতুল্য সম্মান দিয়ে গেছেন। বস্তুতঃ সাধু সঙ্গের প্রতি তাঁর আবাল্য অনুরাগ। কামার-পুকুরের পাশ দিয়ে সেকালে পায়ে হেঁটে পুরী যাবার রাস্তা ছিল। সে রাস্তার ধারে লাহাবাবুদের তৈরী ধর্মশালায় সাধু সন্ন্যাসীরা এসে মাঝে মাঝে থাকতেন। বালক গদাধর এই সাধুদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশে ছোট বেলা থেকেই আসল ও নকল সাধুদের চিনতে শিখেছিলেন। বড় হয়ে দক্ষিণেশ্বরে থাকবার সময়ও মন্দিরের অতিথি-শালায় ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের সাধু সন্ন্যাসীর নিত্য সমাগম তিনি দেখেছেন এবং তাঁদের সঙ্গে অনবরতঃ ধর্মপ্রসঙ্গই তাঁর শাস্ত্রজ্ঞানের অন্যতম কারণ। সাধারণ পণ্ডিতের মতো তিনি বই পড়া বিদ্যার অধিকারী ছিলেন না। (ভাগ্যে ছিলেন না!) তবে শুনেছিলেন অনেক, তার চেয়ে ঢের বেশী ছিল প্রত্যক্ষ উপলব্ধি।

রামলালাসেবক জটাধারী, সূফীসাধক গোবিন্দ, ব্রাহ্মণী যোগেশ্বরী, অদ্বৈতসিদ্ধ তোতাপুরী প্রভৃতি শ্রীরামকৃষ্ণগুরুবৃন্দ ছাড়াও আরো অনেক সাধুর জীবন ও সাধনার প্রেরণার ইতিহ ; 'কথামৃত' ও 'লীলাপ্রসঙ্গে' মেলে। সেই সাধুটির কথা স্মরণীয়, যাঁর কাছে শুধু একটি বই ছিল, সেই বইয়ের পাতায় পাতায় শুধু "ওঁ রামঃ" এই নামটি লেখা। আর সেই পিশাচবৎ আচরণ পরমহংস, যিনি কুকুরের কান ধরে এঁটোপাত থেকে খাচ্ছিলেন—শ্রীরামকৃষ্ণ প্রেরিত হৃদয়কে যিনি বলেছিলেন, 'এই নর্দমার জল আর গঙ্গার জল যেদিন এক মনে হবে, সেদিন হবে।'

শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত ও লীলাপ্রসঙ্গের নানা জায়গায় আরো অনেক সাধুসন্তের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সৌহার্দ্য ও সদালোচনার পরিচয়

মেলে। যথার্থ বৈরাগ্য দেখলে তিনি নিজে থেকে এগিয়ে আলাপ করতেন এবং সেই আলাপ প্রসঙ্গে সাধকের অন্তরের অধ্যাত্ম অনুরাগ প্রদীপ্ত করে তার একদেশদর্শিতা মোচনে সাহায্য করতেন।

একদিকে দক্ষিণেশ্বরে সমাগত ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের সাধু ও পণ্ডিতসমাজ আর একদিকে কলকাতার নবশিক্ষিত তরুণ বঙ্গ—এই দুইদলের সঙ্গেই শ্রীরামকৃষ্ণের অধ্যাত্মচর্চা চলত। সমকালীন ব্রাহ্মসমাজকে গার্হস্থ্য আদর্শে বিশ্বাসী ধর্মান্দোলন রূপে গণ্য করা চলে। স্বভাবতঃই ব্রাহ্মসমাজের ধর্মচেতনার বৈশিষ্ট্য শ্রীরামকৃষ্ণ ভালোভাবেই লক্ষ্য করেছিলেন। ঋষিদের কালের ব্রহ্মজ্ঞানী এবং ইদানীংকালের ব্রহ্মজ্ঞানী দুয়ের উদ্দেশ্যেই তিনি নমস্কার জানিয়েছেন। তবু সংসারজীবনে ভগবানলাভের আদর্শের চেয়ে পরমসত্যের জন্য সর্বস্বত্যাগের আদর্শের উপরেই তিনি জোর দিয়েছেন বেশী। "কেশব-চরিত"-লেখক ত্রৈলোক্যনাথ সান্যালকে ভগবানলাভ ও সংসারকামনার অসহযোগ বুঝাতে গিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন—"যারা 'সংসার ধর্ম' 'সংসারে ধর্ম' করছে তাবা একবার যদি ভগবানের আনন্দ পায় তাদের আর কিছু ভাল লাগে না, কাজের সব আঁট কমে যায়, ক্রমে যত আনন্দ বাড়ে কাজ আর করতে পাবে না,—কেবল সেই আনন্দ খুঁজে বেড়ায়। ভগবানের আনন্দের কাছে বিষয়ানন্দ আর রমণানন্দ।

৭। দেখলাম সাক্ষাৎ বিশ্বনাথ তাঁর শরীরটা আশ্রয় করে প্রকাশিত হয়ে রয়েছেন! তাঁর থাকায় কাশী উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। উঁচু জ্ঞানের অবস্থা। শরীরের কোন হুঁশই নেই,···তখন কথা কন না-মৌনী। ইশারায় জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'ঈশ্বর এক না অনেক?' তাতে ইশারা করে বুঝিয়ে দিলেন—'সমাধিস্থ হয়ে দেখলে এক; নইলে যতক্ষণ আমি, তুমি, জীব, জগৎ ইত্যাদি নানা জ্ঞান রয়েছে ততক্ষণ অনেক।' তাঁকে দেখিয়ে হৃদয়কে বলেছিলাম 'একেই ঠিক ঠিক পরমহংস অবস্থা বলে।' [লীলাপ্রসঙ্গ: গুরুভাব।]

একবার ভগবানের আনন্দের আস্বাদ পেলে সেই আনন্দের জন্য ছুটোছুটি করে বেড়ায়, তখন সংসার থাকে আর যায়।

চাতক তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে—সাত সমুদ্র যত নদী পুষ্করিণী সব ভরপূর। তবু সে জল খাবে না। ছাতি ফেটে যাচ্ছে তবু খাবে না। স্বাতী নক্ষত্রের বৃষ্টির জলের জন্য হাঁ করে আছে! 'বিনা স্বাতিকি জল সব ধূর!'

বলে দুদিক রাখবো। দু'আনার মদ খেয়ে মানুষ দুদিক রাখতে চায়, আর খুব মদ খেলে কি আর দুদিক রাখা যায়।

ঈশ্বরের আনন্দ পেলে আর কিছু ভাল লাগে না। তখন কামিনী-কাঞ্চনের কথা যেন বুকে বাজে। (কীর্ত্তনের সুরে) আন্ লোকের আন্ কথা, কিছু ভাল্ত লাগে না!"

ত্রৈলোক্য—সংসারে থাকতে গেলে টাকাও তো চাই, সঞ্চয় চাই। পাঁচটা দান ধ্যান—

শ্রীরামকৃষ্ণ—কি আগে টাকা সঞ্চয় করে তবে ঈশ্বর! আর দান ধ্যান দয়া কত! নিজের মেয়ের বিয়েতে হাজার হাজার টাকা খরচ—আর পাশের বাড়িতে খেতে পাচ্ছে না। তাদের দুটি চাল দিতে কষ্ট হয়—অনেক হিসাব করে দিতে হয়। খেতে পাচ্ছে না লোকে, তা আর কি হবে, ও শালারা মরুক আর বাঁচুক; —আমি আর আমার বাড়ির সকলে ভাল থাকলেই হলো। মুখে বলে সর্বজীবে দয়া!

ত্রৈলোক্য—সংসারে তো ভালো লোক আছে,—পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি, চৈতন্যদেবের ভক্ত। তিনি তো সংসারে ছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তার গলা পর্যন্ত মদ খাওয়া ছিল, যদি আর একটু খেত তাহলে আর সংসার করতে পারত না। [কথামৃত: ৩য়]

এই আলোচনাপ্রসঙ্গেই শেষ অবধি সংসারে থেকে ধর্ম হয় কি না এই প্রসঙ্গের উত্তরে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন—"হয়—কিন্তু জ্ঞান লাভ করে

থাকতে হয়,—ভগবানকে লাভ করে থাকতে হয়। তখন 'কলঙ্কসাগরে ভাসে, তবু কলঙ্ক না লাগে গায়।' তখন পাঁকাল মাছের মতো থাকতে পারে। ঈশ্বরলাভের পর যে সংসার সে বিদ্যার সংসার। কামিনীকাঞ্চন তাতে নাই, কেবল ভক্তি ভক্ত আর ভগবান।"

এর পর ভগবান লাভ করে সংসারজীবনযাপনের উদাহরণ রূপে শ্রীরামকৃষ্ণ নিজেকে উপস্থাপিত করেছেন—"আমারও মাগ আছে—ঘরে ঘটিবাটিও আছে, হরে প্যালাদের খাইয়ে দিই, আবার যখন হাবীর মা এরা আসে এদের জন্যও ভাবি।" তবু তাঁর সংসার যেমন সর্বত্র মাতৃশরণ ও স্মরণে পরিপূর্ণ, তেমন সংসারই তাঁর আদর্শ। সংসারে থেকে ভগবানলাভ হওয়া প্রায় অসম্ভব জেনেই 'সহস্রেষু' এক আধজন সন্ন্যাসের পথে অগ্রসর হন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলতেন, "কি জান, সংসার করলে মনের বাজে খরচ হয়ে পড়ে। এই বাজে খরচ হওয়ার দরুণ মনের যা ক্ষতি হয়,—সে ক্ষতি আবার পূরণ হয় যদি কেউ সন্ন্যাস করে। বাপ প্রথম জন্ম দেন; তার পরে দ্বিতীয় জন্ম উপনয়নের সময়। আর একবার জন্ম হয় সন্ন্যাসের সময়।"

[কথামৃত ২য়]

যীশুখ্রীষ্টের ভাষায়—'Except ye be born again ye cannot enter into the Kingdom of Heaven'. নবজন্ম না হলে স্বর্গরাজ্যে প্রবেশের অধিকার হয় না।

সংসারে প্রবেশ করে বিবাহাদির পরে সংসারত্যাগও প্রশংসনীয় সন্দেহ নেই। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের দৃষ্টিতে কৌমার-বৈরাগ্যই শ্রেষ্ঠ আদর্শ—"যাদের কৌমার বৈরাগ্য, যারা ছেলেবেলা থেকে ভগবানের জন্য ব্যাকুল হয়ে বেড়ায়, সংসারে ঢোকে না তারা একটি থাক আলাদা! তারা নৈকষ্যকুলীন।...যাদের ঠিক কৌমারবৈরাগ্য তাদের উঁচু ঘর; অতি শুদ্ধ ভাব। গায়ে দাগটি পর্যন্ত লাগে না।"

হোমাপাখীর সঙ্গে নরেন্দ্রনাথ, রাখাল প্রভৃতির তুলনা করে শ্রীরামকৃষ্ণ

সেই সহজাত বৈরাগ্যের আদর্শ সম্বন্ধে তাঁর শ্রোতৃমণ্ডলীকে বারম্বার সচেতন করতে চেয়েছেন। কৌমারবৈরাগ্যের আর এক জ্বলন্ত উদাহরণ তাঁর কাছে শুকদেব—জন্মের পরেই যিনি মুহূর্তের জন্যও সংসারপাশে আবদ্ধ হন নি। নরেন্দ্রনাথের মধ্যে শুকদেবের সেই মায়ারাহিত্য দেখে তিনি বিশেষভাবে তাঁকে পঞ্চদশী, অষ্টাবক্রসংহিতা প্রমুখ বৈরাগ্যোদ্দীপক শাস্ত্রপাঠে উদ্বুদ্ধ করতেন। শুধু তাই নয়, বেদান্তের 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'—এই বাণী উপলব্ধি করতে অক্ষম হাজরার কথায় তরুণ নরেন্দ্রনাথ যখন 'ঘটিটাও ঈশ্বর, বাটীটাও ঈশ্বর' বলে পরিহাস করছিলেন, তখন ব্রহ্মবিদ শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর দিব্যস্পর্শে অন্তরে সর্বময় ব্রহ্মোপলব্ধি সঞ্চার করেছিলেন। কাশীপুরে সেই ব্রহ্মোপলব্ধির নির্গুণস্তর অবধি উপলব্ধি করে নরেন্দ্রনাথ আনুষ্ঠানিক সন্ন্যাসের আগেই ব্রহ্মসত্যে উপনীত হয়েছেন। তবু আনুষ্ঠানিক সন্ন্যাস—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ভাষায় "চিহ্নধারী সন্ন্যাসের" প্রয়োজন। এমন কি শ্রীরামকৃষ্ণের ইচ্ছায় বুড়োগোপাল (পরে স্বামী অদ্বৈতানন্দ) নরেন্দ্রনাথ এবং ভবিষ্যতের অন্যান্য ত্যাগী শিষ্যদের গৈরিকবস্ত্র দান[৮] করেছিলেন। দক্ষিণেশ্বর থেকেই শ্রীরামকৃষ্ণ এই সব শিষ্যদের তিলে তিলে সর্বস্বত্যাগের দীক্ষা দিয়ে আসছিলেন, কাশীপুরে শ্রীরামকৃষ্ণের হাতেই ভবিষ্যৎ গৈরিকধারী সন্ন্যাসীসঙ্ঘের সূচনা।

নবযুগের এই অসাম্প্রদায়িক সন্ন্যাসীসম্প্রদায়ের প্রবর্তক শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং সন্ন্যাসী। সন্ন্যাস সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য—"যাদের দ্বারা তিনি (ঈশ্বর) লোকশিক্ষা দেবেন, তাদের সংসার ত্যাগ করা দরকার'

৮। এই ঘটনাটি আনুষ্ঠানিক সন্ন্যাস না হলেও শ্রীরামকৃষ্ণের অভিপ্রেত সন্ন্যাসের ইঙ্গিত। শ্রীরামকৃষ্ণের দেহাবসানের পর বরাহনগর মঠে বিবেকানন্দ প্রভৃতি আনুষ্ঠানিক সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন।

তা না হলে উপদেশ গ্রাহ্য হয় না। শুধু ভিতরে ত্যাগ হলে হবে না। বাহিরে ত্যাগও চাই, তবে লোকশিক্ষা হয়। তা না হলে লোকে মনে করে ইনি যদিও কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ করতে বলেছেন, ইনি নিজে ভিতরে ভিতরে ঐ সব ভোগ করেন।"

[কথামৃত ৪র্থ]

চৈতন্যদেবের সংসারত্যাগেরও এইটিই প্রধান কারণ। শ্রীরামকৃষ্ণ সেকথা স্মরণ করিয়ে বলছেন, "চৈতন্যদেব লোকশিক্ষার জন্য সংসার ত্যাগ করলেন। সাধু সন্ন্যাসী নিজের মঙ্গলের জন্য কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ করবে। আবার নির্লিপ্ত হলেও লোকশিক্ষার জন্য কাছে কামিনীকাঞ্চন রাখবে না। ন্যাসী—সন্ন্যাসী—জগদ্‌গুরু! তাকে দেখে তবে তো লোকের চৈতন্য হবে।"

সন্ন্যাসী মানববিবেকের প্রহরী। তার কাজ নিজে জেগে থাকা এবং অন্যকে সজাগ রাখা। তাই অনাসক্তির আদর্শে কিছুমাত্র আপোষ চলে না। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায়—'সন্ন্যাসীর পক্ষে কামিনী-কাঞ্চন—যেমন সুন্দরীর পক্ষে তার গায়ের বোটকা গন্ধ! ও গন্ধ থাকলে বৃথা সৌন্দর্য।

মাড়ওয়ারী আমার নামে টাকা লিখে দিতে চাইলে; মথুর জমি লিখে দিতে চাইলে—তা নিতে পারলাম না।

একজন বহুরূপী ত্যাগী সাধু সেজেছিল। বাবুরা তাকে এক তোড়া টাকা দিতে গেল। সে উঁহুঃ করে চলে গেল—টাকা ছুঁলেও না। কিন্তু খানিক পরে গা হাত ধুয়ে নিজের কাপড় পরে এলো। বল্লে, 'কি দিচ্ছিলে এখন দাও। যখন সাধু সেজেছিল, তখন টাকা ছুঁতে পারে নাই। এখন চার আনা দিলেও হয়।' [কথামৃত : ৪র্থ]

সঞ্চয় গৃহীর পক্ষে ধর্ম, সন্ন্যাসীর পক্ষে পরিপূর্ণ ভগবৎনির্ভরতার জন্যই কোনরকম সঞ্চয় নিষিদ্ধ। সন্ন্যাসী শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তর থেকে কাঞ্চন বা সঞ্চয়ের ধারণা কত নিঃশেষে মুছে গিয়েছিল, তার অন্যতম

প্রমাণ শম্ভুমল্লিকের কাছে পেটের অসুখের জন্য আফিম নেওয়ার কাহিনীটি প্রসঙ্গতঃ স্মরণীয়।

"কলিকাতার প্রসিদ্ধ দানশীল ধনী ৺শম্ভুচন্দ্র মল্লিক মহাশয়কেই ঠাকুর তাঁহার চারিজন রসদ্দারের ভিতর দ্বিতীয় রসদ্দার বলিয়া নির্দেশ করিতেন। রাণী রাসমণির কালীবাড়ীর নিকটেই তাঁহার একখানি বাগান ছিল। উহাতে তিনি ভগবৎচর্চায় ঠাকুরের সঙ্গে অনেককাল কাটাইতেন। ঐ বাগানে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত একটি দাতব্য ঔষধালয়ও ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পেটের অসুখ অনেক সময়ই লাগিয়া থাকিত। একদিন ঐরূপ পেটের অসুখের কথা জানিতে পারিয়া তাঁহাকে একটু আফিম সেবন করিতে ও রাসমণির বাগানে ফিরিবার সময় উহা তাঁহার নিকট হইতে লইয়া যাইতে পরামর্শ দিলেন। ঠাকুরও সেকথায় সম্মত হইলেন। তাহার পর, কথাবার্তায় ঐ কথা দুইজনেই ভুলিয়া যাইলেন।

শম্ভূবাবুর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া পথে আসিয়া ঠাকুরের ঐ কথা মনে পড়িল এবং আফিম লইবার জন্য পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন, শম্ভূবাবু অন্দরে গিয়াছেন। ঠাকুর ঐ বিষয়ের জন্য তাঁহাকে আর না ডাকাইয়া তাঁহার কর্মচারীর নিকট হইতে একটু আফিম চাহিয়া লইয়া রাসমণির বাগানে ফিরিতে লাগিলেন। কিন্তু পথে আসিয়াই ঠাকুরের কেমন একটা ঝোঁক আসিয়া পথ আর দেখিতে পাইলেন না! রাস্তার পাশে যে জলনালা আছে, তাহাতে যেন কে পা টানিয়া লইয়া যাইতে লাগিল! ঠাকুর ভাবিলেন—এ কি? এ তো পথ নয়! অথচ পথও খুঁজিয়া পান না। অগত্যা কোনরূপে দিক ভুল হইয়াছে ঠাওরাইয়া, পুনরায় শম্ভুবাবুর বাগানের দিকে চাহিয়া দেখিলেন সে দিকের পথ বেশ দেখা যাইতেছে। ভাবিয়া চিন্তিয়া পুনরায় শম্ভুবাবুর বাগানের ফটকে আসিয়া সেখান হইতে ভাল করিয়া লক্ষ্য করিয়া পুনরায়

সাবধানে রাসমণির বাগানের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কিন্তু দুই এক পা আসিতে না আসিতে আবার পূর্বের মত হইল—পথ আর দেখিতে পান না। বিপরীত দিকে যাইতে পা টানে! এইরূপ কয়েকবার হইবার পর ঠাকুরের মনে উদয় হইল—"ওঃ, শম্ভু বলিয়াছিল আমার নিকট হইতে আফিম চাইয়া লইয়া যাইও; তাহা না করিয়া আমি তাহাকে না বলিয়া তাহার কর্মচারীর নিকট হইতে উহা চাহিয়া লইয়া যাইতেছি, সেজন্যই মা আমাকে যাইতে দিতেছেন না! কর্মচারীর শম্ভুর হুকুম ব্যতীত দেওয়া উচিত নয়, আর আমারও শম্ভু যেমন বলিয়াছে—তাহার নিকট হইতেই লওয়া উচিত। নইলে যে ভাবে আমি আফিম লইয়া যাইতেছি, উহাতে মিথ্যা ও চুরি এই দুটি দোষ হইতেছে। সেইজন্যই মা আমার অমন করিয়া ঘুরাইতেছেন, ফিরিয়া যাইতে দিতেছেন না!" এই কথা মনে করিয়া শম্ভুবাবুর ঔষধালয়ে প্রত্যাগমন করিয়া দেখেন, সে কর্মচারীও সেখানে নাই সেও আহারাদি করিতে অন্যত্র গিয়াছে। কাজেই জানালা গলাইয়া আফিমের মোড়াটি ঔষধালয়ের ভিতর নিক্ষেপ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "ওগো, এই তোমাদের আফিম রহিল—" বলিয়া রাসমণির বাগানের দিকে চলিলেন। এবার যাইবার সময় আর তেমন কোন ঝোঁক নাই; রাস্তাও বেশ পরিষ্কার দেখা যাইতেছে; বেশ চলিয়া গেলেন। ঠাকুর বলিতেন, "মার উপর সম্পূর্ণ ভার দিয়েছি কিনা? তাই মা হাত ধরে আছেন। একটুকু বেতালে পা পড়তে দেন না।"

[শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গঃ গুরুভাবঃ পূর্বার্ধ]

ত্যাগের সাধনা কতখানি রক্তের সংস্কারে পরিণত হলে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এমন স্বাভাবিক ত্যাগ সম্ভব, সেকথা ভেবে আমাদের বিস্ময়ের অবধি থাকে না। নরেন্দ্রনাথও একদিন বিছানার তলায় ধাতুমুদ্রা রেখে শ্রীরামকৃষ্ণকে পরীক্ষা করেছিলেন সে ঘটনা

সুবিদিত। মথুরামোহন বা লক্ষ্মীনারায়ণ মারোয়াড়ীর সম্পত্তি বা টাকার প্রস্তাব তিনি যেভাবে উপেক্ষা করেছিলেন, তার চেয়েও জীবনের এইসব ছোটখাট ঘটনায় তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ত্যাগের মাহাত্ম্য অনেক বেশী প্রকাশিত। শ্রীরামকৃষ্ণসাধনার শ্রেষ্ঠ অংশভাগিনী সারদাদেবীর দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণের এই স্বাভাবিক ত্যাগের মাহাত্ম্যই শ্রীরামকৃষ্ণচরিত্রের শ্রেষ্ঠ দিক বলে মনে হয়েছিল। তাঁর কাছে সে তুলনায় শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্মসমন্বয়ের মহিমাও ক্ষুদ্রতর।

"বাইরে ত্যাগও চাই, তবে লোকশিক্ষা হয়"—শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এই কথাটি সন্ন্যাসীর লোকগুরু ভূমিকাটি মনে রেখে বলা। সাধারণভাবে অধ্যাত্মসাধকসম্বন্ধেও একথা বলা চলে। বহিঃসন্ন্যাস সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণ নানাজায়গায় চৈতন্যদেবের উদাহরণ দিয়েছেন। চৈতন্যভাগবতে শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাসপ্রসঙ্গ এক্ষেত্রে স্মরণীয়—

একদিন মহাপ্রভু আছেন বসিয়া।
চতুর্দিকে সকল পার্ষদগণ লৈয়া॥
এক বাক্য অদ্ভুত বলিলা আচম্বিত।
কেহো না বুঝিল অর্থ, সভে চমকিত॥
"করিল পিপ্পলখণ্ড কফ নিবারিতে।
উলটিয়া আরো কফ বাড়িল দেহেতে॥"
বলি অট্ট অট্ট হাসে সর্ব-লোক-নাথ।
কারণ না বুঝি ভয় জন্মিল সভাত॥
নিত্যানন্দ বুঝিলেন প্রভুর অন্তর।
জানিলেন প্রভু শীঘ্র ছাড়িবেন ঘর॥

ক্ষণেকে ঠাকুর নিত্যানন্দ হাতে ধরি।
নিভৃতে বসিলা গিয়া গৌরাঙ্গ শ্রীহরি॥

প্রভু বোলে, শুন নিত্যানন্দ মহাশয়।
তোমারে কহিয়ে নিজ হৃদয় নিশ্চয়॥

....

গারিহস্থ বাস আমি ছাড়িব নিশ্চয়॥
ইথে তুমি কিছু দুঃখ না ভাবিও মনে।
বিধি দেহ তুমি মোরে সন্ন্যাস কারণে॥
জগত উদ্ধার যদি চাহ করিবারে।
ইহাতে নিষেধ নাহি করিবে আমারে।

(চৈতন্যভাগবত : মধ্যখণ্ড : পঞ্চবিংশ অধ্যায়)

বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে আলোচনাপ্রসঙ্গে "কামিনীকাঞ্চন" ত্যাগের কথা স্বাভাবিকভাবেই এসে পড়েছিল। উনিশ শতকের এ দুই যুগন্ধর পুরুষের আলোচনাপ্রসঙ্গটি পঞ্চমভাগে কথামৃতের একটি মূল্যবান দলিল। শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরামকৃষ্ণের কামিনীকাঞ্চনত্যাগের সার্থকতা উপলব্ধিতে সহায়তার জন্য এ আলোচনার কিছুটা অংশ উদ্ধৃতিযোগ্য।

শ্রীরামকৃষ্ণ (বঙ্কিমের প্রতি)—কামিনীকাঞ্চনই সংসার। এরই নাম মায়া।...পশুভাব না গেলে ঈশ্বরের আস্বাদন করতে পারে না। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে হয় যাতে পশুভাব যায়। ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা। তিনি অন্তর্যামী, শুনবেনই শুনবেন। যদি আন্তরিক হয়।

আর 'কাঞ্চন'। আমি পঞ্চবটীর তলায় গঙ্গার ধারে বসে 'টাকা মাটি' 'টাকা মাটি' 'মাটিই টাকা, টাকাই মাটি' বলে জলে ফেলে দিছলুম।

বঙ্কিম—টাকা মাটি! মহাশয় চারটা পয়সা থাকলে গরীবকে দেওয়া যায়। টাকা যদি মাটি, তা হলে দয়া পরোপকার করা হবে না?

শ্রীরামকৃষ্ণ—দয়া! পরোপকার! তোমার সাধ্য কি যে তুমি

পরোপকার কর? মানুষের এত নপর চপর কিন্তু যখন ঘুমোয়, তখন যদি কেউ দাঁড়িয়ে মুখে মুতে দেয় তো টের পায় না, মুখ ভেসে যায়। তখন অহঙ্কার, অভিমান, দর্প কোথায় যায়?

সন্ন্যাসীর কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ করতে হয়! তা আর গ্রহণ করতে পারে না। থুথু ফেলে থুথু আবার খেতে নাই। সন্ন্যাসী যদি কারুকে কিছু দেয়, সে নিজে দেয় মনে করে না। দয়া ঈশ্বরের, মানুষে আবার কি দয়া করবে? দানটান সবই রামের ইচ্ছা। ঠিক সন্ন্যাসী মনেও ত্যাগ করে, বাইরেও ত্যাগ করে। সে গুড় খায় না, তার কাছে গুড় থাকাও ভাল নয়। কাছে গুড় থেকে যদি সে বলে খেয়ো না, লোকে শুনবে না।

সংসারী লোকের টাকার দরকার আছে, কেন না মাগ ছেলে আছে। সঞ্চয় করবে না কেবল পঞ্ছী আউর দরবেশ, অর্থাৎ পাখি আর সন্ন্যাসী।"

শ্রীচৈতন্যকথিত মানবের কফব্যাধি—এই কামিনীকাঞ্চন। সংসারের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়। অথচ সংসারমায়ার মূলসূত্র। সংসারকে যারা ভালোবাসেন বলে মনে করেন,, স্বভাবতঃই কামিনীকাঞ্চনত্যাগ প্রসঙ্গটিই তাঁদের কাছে বাড়াবাড়ি বলে মনে হয়। মানবমনস্তত্ত্ব অনুসারে এই ত্যাগ সম্ভব কি না, এমন প্রশ্নও জাগা অস্বাভাবিক নয়। অথচ আমরা দেখতে পাচ্ছি, পৃথিবীর যারা শ্রেষ্ঠ মানব বলে পূজিত--সেই বুদ্ধ, যীশু, চৈতন্য, রামকৃষ্ণের মতো মানুষেরা ভগবৎ আনন্দের তুলনায় অর্থ বা কামের আনন্দকে একান্ত তুচ্ছ করে গেছেন। .বলা যেতে পারে, তাঁদের মতো অসাধারণ মহামানবের পক্ষে যা সম্ভব, সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে তার প্রয়োগ করতে যাওয়া অবাস্তব দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচায়ক। সব মানুষের পক্ষেই এমন একান্ত ত্যাগ বাঞ্ছিত নয়, একথা বলা বাহুল্য। মনের বিভিন্ন স্তর অনুযায়ী এই মহামানবেরা বিভিন্নজনকে

বিভিন্নভাবে সাধনা করতে বলেছেন এবং অধিকাংশ ভক্তকেই সংসারে থেকেই ঈশ্বরানুগত হতে নির্দেশ দিয়েছেন।

ভক্ত সংসারীর উদাহরণ দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন—"সংসারী লোক শুদ্ধভক্ত হ'লে অনাসক্ত হয়ে কর্ম করে। কর্মের ফল—লাভ, লোকসান, সুখ দুঃখ ঈশ্বরকে সমর্পন করে। আর তাঁর কাছে রাতদিন ভক্তি প্রার্থনা করে, আর কিছুই চায় না।" তবু দেখা যায়, পূর্বোক্ত মহামানবেরা তাঁদের অন্তরঙ্গ শিষ্যগোষ্ঠীরচনা করেছেন সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীদের নিয়ে। গৃহীভক্তদের স্থান তার পরে। সন্ন্যাসী ও গৃহী যাঁর যাঁর কর্মক্ষেত্রে দু'জনেই মহৎ। তবু, সন্ন্যাসীর ভগবৎতন্ময়তাই ওই লোকপূজ্য মহামানবদের অন্তরতম আদর্শ—এতে কোন সন্দেহ নেই।

অবশ্য হিন্দুধর্মের রাম বা কৃষ্ণ, ইসলামধর্মের মহম্মদ, ইহুদীধর্মের মুসা প্রভৃতি বিবাহিত ধর্মগুরুদের একাধিক উদাহরণ দেখানো যায়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই ধর্মগুরুদের অনুসরণকারীরা অনেকেই তীব্র বৈরাগ্যবান সন্ন্যাসী। তার কারণ বোধ হয় এই যে, পরিপূর্ণ ভগবৎ তন্ময়তা নিয়ে পূর্বোক্ত ধর্মগুরুরা সংসারধর্ম পালন করলেও ভগবৎস্বরূপের সন্ধান বা অন্তর্নিহিত ভগবৎসত্তার উপলব্ধিই তাঁদের আদর্শ। স্বভাবতঃই তাঁদের অনুগামীদের অন্তরে সেই সন্ধানের সুরটিই বড়ো হয়ে ওঠায় অনিত্য জগৎসংসারকে অতিক্রম করে তাঁরা নিজেদের ও বিশ্বজগতের কল্যাণের জন্য আত্মবিসর্জন করেছেন।

আপন অন্তরঙ্গদের কাছে শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তিতত্ত্বের দিক থেকে নিজেকে অবতার বলেছেন এবং 'যে রাম যে কৃষ্ণ সেই ইদানীং একাধারে রামকৃষ্ণ' এই ঘোষণাও করেছেন। লক্ষণীয়, তিনি নিজেকে বুদ্ধ বা শংকর বলেন নি। অথচ মানবজাতির ত্যাগীশ্রেষ্ঠদের তিনি অন্যতম। আসলে, তিনি শুধুমাত্র সন্ন্যাসী বা শুধু সংসারী কোনটাই নন। অথচ এ দুয়েরই এক অপূর্ব আদর্শ। তাই রাম বা কৃষ্ণের

অধ্যাত্ম-আদর্শ তাঁর ধর্মসমন্বয়ে পরিপূর্ণতা লাভ করলেও তিনি সংসার ও সন্ন্যাস এ দুয়ের আনুষ্ঠানিকতার উপরে জোর না দিয়ে নিখিলজগৎ ব্রহ্মময় উপলব্ধির অনুভবসত্যকেই সবার উপরে স্থান দিয়ে গেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণপ্রচারিত অধাত্ম-আদর্শের শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাকার স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের এই ত্যাগের ভাবটিরই প্রাধান্য স্থাপন করে গেছেন। তিনি বলতেন, "জনক হওয়া কি এত সোজা?—সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে রাজসিংহাসনে বসা! পাশ্চাত্যে আমাকে অনেক লোকে বলেছেন যে, তাদের ওই অনাসক্ত অবস্থা আয়ত্ত হয়েছে। আমি শুধু এটুকু বলতে পারি, এমন সব মহাপুরুষ তো ভারতবর্ষে জন্মান না!"

"মনে মনে একথা সব সময় ভাবতে এবং নিজের সন্তানদেরও শেখাতে ভুলো না যে— মেরুসর্ষপয়োর্যদবৎ সূর্যখদ্যোতয়োরিব।
সরিৎসাগরয়োর্যদবৎ তথা ভিক্ষুগৃহস্থয়োঃ॥

মেরু এবং সর্ষপে যে প্রভেদ, সূর্য এবং জোনাকিতে যে প্রভেদ, সমুদ্র এবং ছোট্ট জলাশয়ে যে প্রভেদ সন্ন্যাসী এবং গৃহীতে সেই প্রভেদ।... ভণ্ড সাধুরাও ধন্য, যারা ব্রত উদ্‌যাপনে অক্ষম তারাও ধন্য, কারণ তারাও আদর্শের শ্রেষ্ঠতা বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়েছে এবং এই ভাবে কিছু পরিমাণে অন্যের সাফল্যের কারণ হয়েছে। আমরা যেন কখনো আমাদের আদর্শ না ভুলি, কখনো না ভুলি।"

[স্বামীজীর সহিত হিমালয়েঃ সপ্তম পরিচ্ছেদঃ নিবেদিতা]

ব্যক্তিগত জীবনে বিবেকানন্দপ্রমুখ সন্ন্যাসিবৃন্দ কীভাবে শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে ত্যাগ বৈরাগ্যের প্রেরণা পেয়েছেন সে সম্বন্ধে "স্বামিশিষ্যসংবাদ বইটিতে একটি মনোজ্ঞ বর্ণনা রয়েছে। সন্ন্যাসী শ্রীরামকৃষ্ণের পূর্ণপরিচয়লাভে সহায়ক হবে ভেবে এই অংশটুকু বিশদভাবে স্মরণ করি—"তাঁর ভক্তের মধ্যে এরূপ যদি কেউ বুঝে থাকেন যে, তিনি যা বুঝেছেন বা বলছেন, তাই একমাত্র সত্য, তবে তিনি দয়ার পাত্র।

ঠাকুরকে কেউ বলছেন তান্ত্রিক কৌল, কেউ বলছেন—চৈতন্যদেব 'নারদীয়া ভক্তি' প্রচার করতে জন্মেছিলেন, কেউ বলেছেন—সাধনভজন করাটা ঠাকুরের অবতারত্বে বিশ্বাসের বিরুদ্ধ, কেউ বলছেন—সন্ন্যাসী হওয়া ঠাকুরের অভিমত নয়, ইত্যাদি কত কথা গৃহী ভক্তদের মুখে শুনবি, ওসব কথায় কান দিবি নি, তিনি যে কি, কত কত পূর্ব অবতারগণের জমাটবাঁধা ভাবরাজ্যের রাজা তা জীবনপাতী তপস্যা করেও একচুল বুঝতে পারলুম না। তাই তাঁর কথা সংযত হয়ে বলতে হয়। যে যেমন আধার তাঁকে তিনি ততটুকু দিয়ে ভরপুর করে গেছেন। ...তিনি যখন তাঁর সন্ন্যাসী ছেলেদের বিশেষভাবে উপদেশ দিতেন, তখন অনেক সময় নিজে উঠে চারিদিক খুঁজে দেখতেন—কোন গৃহস্থ সেখানে আছে কিনা। যদি দেখতেন—কেউ নেই বা আসছে না, তবেই জ্বলন্ত ভাষায় ত্যাগও তপস্যার মহিমা বর্ণন করতেন। সেই সংসারবৈরাগ্যের প্রবল উদ্দীপনাতেই তো আমরা সংসারত্যাগী উদাসীন।

বুঝেই দেখ্ না কেন—তাঁর যে সব সন্তান ঈশ্বরলাভের জন্য ঐহিক জীবনের সমস্ত ভোগ ত্যাগ করে পাহাড়ে, পর্বতে, তীর্থে, আশ্রমে তপস্যায় দেহপাত করছে, তারা বড় না যারা তাঁর সেবা বন্দনা স্মরণ মনন করছে অথচ সংসারের মায়ামোহ কাটিয়ে উঠতে পারছে না, তারা বড়? যারা আত্মজ্ঞানে জীবসেবায় জীবনপাত করতে অগ্রসর, যারা আকুমার উর্ধ্বরেতা, যাঁরা ত্যাগ বৈরাগ্যের মূর্তিমান চলদ্বিগ্রহ তারা বড় না যারা মাছির মতো একবার ফুলে বসে পরক্ষণই বিষ্ঠায় বসছে তারা বড়?

"তাঁর কৃপা যারা পেয়েছে, তাদের মন বুদ্ধি কিছুতেই আর সংসারে আসক্ত হতে পারে না। কৃপার test (পরীক্ষা) কিন্তু হচ্ছে কাম কাঞ্চনে অনাসক্তি। সেটা যদি কারও না হয়ে থাকে তবে সে ঠাকুরের কৃপা কখনই ঠিক ঠিক লাভ করে নি।" [স্বামিশিষ্যসংবাদ উত্তরাখণ্ড]

ভগবানের কৃপা বলতে সাধারণতঃ সাংসারিক দুর্যোগ থেকে অব্যাহতি এবং মান সম্মান অর্থ প্রতিপত্তিই বোঝায়। কিন্তু এ কেবল প্রাথমিক স্তরের সকাম সাধনা। "মনসা" বা "চণ্ডীর" কাছে বরপ্রাপ্তির ওই আদর্শ মোটামুটি সব দেশেই নানারূপে নানাভাবে প্রচলিত। ভগবানের রূপকল্পনা বা অরূপচেতনা—এ দুয়ের মধ্যে আদর্শগত পার্থক্য নিশ্চয় আছে। কিন্তু ভক্তহৃদয়ের সকাম অনুরাগ ও নিষ্কাম অহৈতুকী ভক্তির পার্থক্যই অধ্যাত্মজগতের অধিকারী-নির্বাচনে আসল পার্থক্য।* নিরাকার ব্রহ্মের কাছে অর্থ, কাম, মান, যশের প্রার্থনা তথাকথিত পৌত্তলিকতার বেশী কিছু নয়। অপরপক্ষে সাকার ভগবানের কাছে বিবেক বৈরাগ্য, জ্ঞান ভক্তির প্রার্থনা যথার্থ আধ্যাত্মিকতার পরিচায়ক। কবির ভাষায়, "তুমি যারে কৃপা কর মা তার কপালে ঝুলি কাঁথা।" যার হৃদয়ে ভগবানের আবির্ভাব হয়, তার পার্থিব বাসনা কামনা উষার অরুণোদয়ে অপসৃত অন্ধকারের মতো আপনিই মুছে যায়।

ব্যাকুলতা হ'লেই অরুণ উদয় হ'লো। তারপর সূর্য দেখা দিবেন। ব্যাকুলতার পরেই ঈশ্বর দর্শন।" [কথামৃতঃ 'ম]

ব্যাকুলতার পরিণতিই বৈরাগ্য। শ্রীরামকৃষ্ণ-হৃদয়ে প্রতিভাত বৈরাগ্যের মৌলসত্য—"আমায় মা জানিয়ে দিচ্ছেন বেদান্তের সার—ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা। গীতার সার,—দশবার গীতা বল্লে যা হয়, অর্থাৎ ত্যাগী ত্যাগী।...গীতার সার মানে—হে জীব, সব ত্যাগ করে ভগবানকে পাবার জন্য সাধনা কর।" [কথামৃত ৪র্থ]

* কথামৃতের এই আলোচনাটি নবদ্বীপ গোস্বামীর সঙ্গে হয়েছিল। শ্রীরামকৃষ্ণের এই অভিনব গীতাব্যাখ্যার সমর্থনে নবদ্বীপ গোস্বামী বলেছিলেন, "ত্যাগী ঠিক হয় না, 'তাগী' হয়। তাহলেও সেই মানে। তগ্ ধাতু ঘঞ্—ত্যাগ, তার উত্তর ইন্ প্রত্যয়—ত্যাগী মানেও যা তাগী মানেও তাই।"

'সব ত্যাগ' কথাটি স্বভাবতঃই অনেকের অরুচিকর ঠেকে। শ্রীরামকৃষ্ণও সকলকেই একসঙ্গে সব ত্যাগের অধিকারী মনে করতেন না। তিনি জানতেন, বেশীর ভাগ মানুষের ক্ষেত্রেই ধীরে ত্যাগের অভ্যাসই ভালো। ফোঁড়া কাঁচা অবস্থায় ফাটাতে যাওয়ার যে বিপদ সে বিপদ সন্ন্যাসের দেশ এই ভারতবর্ষে আমরা বহুবার লক্ষ্য করেছি। বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে দেশশুদ্ধ লোকের সন্ন্যাসী হওয়ার বৃথা চেষ্টার ভয়াবহ পরিণাম গোপন তান্ত্রিকসাধনার পথে পরিচালিত হয়ে নীতি ও ধর্মের মধ্যে যে দুস্তর ব্যবধান সৃষ্টি করেছিল তার পুনরাবৃত্তি আধুনিক ভারতের ইতিহাসে কখনই কাম্য নয় নয়। তবে একথাও স্মরণীয়, যাঁরা পরমসত্যের সন্ধানী তাঁদের পক্ষে, "বিবেক বৈরাগ্য না হলে কিছু হয় না।"

"বৈরাগ্য অনেকপ্রকার। একরকম আছে মর্কট বৈরাগ্য—সংসারের জ্বালায় জ্বলে বৈরাগ্য!—সে বৈরাগ্য বেশীদিন থাকে না। আর ঠিক ঠিক বৈরাগ্য—সব আছে। কিছুর অভাব নাই। অথচ সব মিথ্যা বোধ।" [কথামৃত ৪র্থ]

বুদ্ধ, শংকর, চৈতন্য, রামকৃষ্ণের জীবন এই জাতীয় বৈরাগ্যেরই পরম উদাহরণ। সাধারণতঃ বৈরাগ্যের অর্থ আমরা পলায়নবাদ বুঝে থাকি। যারা সংসারের ক্ষণসুখের জন্য পরমসত্যকে ভুলে থাকে তারা পলায়নবাদী, না, যারা পরম সত্যের জন্য ক্ষণসুখ ত্যাগ করে থাকেন তাঁরা পলায়নবাদী একথা সহজেই অনুমেয়। বৈরাগ্যের অর্থ পরিণামহীন শূন্যতা নয়, গভীরতম আত্মোপলব্ধিই বৈরাগ্যের মূল কথা। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায়—"বৈরাগ্য অর্থাৎ সংসারে বিরাগ আর ঈশ্বরে অনুরাগ।" আধ্যাত্মিকতা শূন্যতার নয়, পূর্ণতার সাধনা।

শ্রীরামকৃষ্ণ জানতেন, "বৈরাগ্য একবারে হয় না। সময় না হলে হয় না। তবে একটি কথা আছে—শুনে রাখা ভাল। সময় যখন হবে তখন মনে হবে—ও! সেই শুনেছিলাম! আর একটি কথা।

এ সব কথা শুনতে শুনতে বিষয়বাসনা একটু একটু করে কমে। মদের নেশা কমাবার জন্য একটু একটু জল খেতে হয়। তাহলে ক্রমে ক্রমে নেশা ছুটতে থাকে।" [কথামৃত : ৪র্থ]

শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহী শিষ্যদের একজন তাঁরই নির্দেশে গৈরিকবস্ত্র পেয়েছিলেন, তিনি ভক্তভৈরব গিরিশচন্দ্র। কামকাঞ্চনত্যাগী শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্তানদের সঙ্গে একত্রে স্থান পাওয়ার এই অধিকারকে গিরিশচন্দ্র অভাবনীয় সম্মান মনে করতেন। তবু পরিপূর্ণ সন্ন্যাসী তিনি হতে পারেন নি। পুত্রের মৃত্যুতে বৈরাগ্যোদয় হওয়ায় তিনি একবার জয়রামবাটীতে সারদাদেবীর কাছে সন্ন্যাসের প্রার্থনা করলেও সারদাদেবী সে প্রার্থনায় সম্মত হ'ন নি। অথচ সারদাদেবীর অসংখ্য সন্ন্যাসীসন্তান আজও শ্রীরামকৃষ্ণসঙ্ঘে আধ্যাত্মিকতার সমুজ্জ্বল উদাহরণরূপে রয়েছেন। গিরিশচন্দ্রকে সন্ন্যাস না দেওয়ার কারণ বোধ হয় এই যে, সন্ন্যাস তাঁর পন্থা নয়—একথা শ্রীরামকৃষ্ণ-সহধর্মিণী বুঝতে পেরেছিলেন। কিন্তু বৈরাগ্যঘন-মূর্তি ত্যাগীশ্বর শ্রীরামকৃষ্ণের পূতসঙ্গ তাঁর জীবনে পরিপূর্ণ রূপান্তর এনেছিল সন্দেহ নেই। স্বামী প্রেমানন্দের ভাষায় তিনি "পরশপাথর ছুঁয়ে সোনা" হয়েছিলেন। আচার্য নন্দলাল তাঁর 'জগাই মাধাই' চিত্রটিতে গিরিশচন্দ্রকেই জগাই মাধাইয়ের আদর্শরূপে গ্রহণ করায় চিত্রটি এত জীবন্ত হয়ে উঠেছিল। বাস্তবিক, জগাই মাধাইয়ের মতোই গিরিশচন্দ্রের সব নেশা চুকিয়ে দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর পাবনীশক্তির অনন্য উদাহরণ স্থাপন করে গেছেন।

অন্যদিকে আবার এমন ব্যক্তিত্বও পৃথিবীতে দেখা দেয়, বিবেক বৈরাগ্য যাঁদের সহজাত সংস্কার। শ্রীরামকৃষ্ণের উপমায় তাঁরা "সূর্যোদয়ের আগে তোলা মাখন," "বেদের হোমাপাখি।" যীশুখ্রীষ্টের ভাষায় 'Ye are the salt of the earth.' এ পৃথিবীতে সে সব জাতিই বড়ো হয়েছে, যাদের মধ্যে স্বদেশ ও সমাজের জন্য আত্মত্যাগের শক্তি

যত বেশী। আবার বিশ্ববিমানবের কল্যাণের জন্য ব্যক্তিজীবনের সর্বসুখ ত্যাগ করে যাঁরা ভগবৎ-তন্ময়তায় ডুবে গেছেন, তাঁদের জীবন অবলম্বন করেই তো মানবজীবনের পরম সার্থকতা। আমাদের ব্যক্তিজীবন থেকে বিশ্বজীবন এই ত্যাগের লবণেই স্বাদ যোগ্য হয়ে আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্য বিবেকানন্দ, ব্রহ্মানন্দ, তুরীয়ানন্দ, সারদানন্দ, শিবানন্দ, অখণ্ডানন্দ প্রমুখ যে কোন একজনের জীবন সম্বন্ধে গভীরভাবে আলোচনা করলে দেখা যায় শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ন্যাসীসত্তার সংস্পর্শে এসে এই লোকোত্তর মহাপুরুষদের চরিত্রে যে ত্যাগতপস্যার অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হয়েছিল, তারই আলোক আমরা আমাদের ধ্যানের ভারতবর্ষকে স্বমহিমায় উপলব্ধি করি। বুদ্ধ, যীশু, চৈতন্য, শংকরের শিষ্যদের মতো এই সর্বত্যাগী শ্রীরামকৃষ্ণশিষ্যদের যে কোন একজনের জীবন যে কোন দেশে অবতারের সম্মানলাভের যোগ্য। এঁদেরই নির্মল চরিত্রদর্পণে প্রতিভাত শ্রীরামকৃষ্ণ-সূর্যের অমিত আলোকশক্তি ভারতের অক্ষয় অধ্যাত্মভাণ্ডারে চিরন্তন সম্পদ। সে সম্পদ এঁরা আহরণ করেছেন পরমসত্যের জন্য সর্বস্ব সমর্পণের দ্বারা। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—

তিমির রাত্রি পোহায়ে
মহাসম্পদ তোমারে লভিব
সব সম্পদ খোয়ায়ে। (সুপ্রভাত)

ওই 'সব সম্পদ'—দেহ ও মনের যাবতীয় সুখবাসনা প্রতিষ্ঠাবাসনা—সম্পূর্ণ যার মুছে গেছে তারই যথার্থ সন্ন্যাস।

বেলুড় মঠে সন্ন্যাসগ্রহণোৎসুক ব্রহ্মচারীদের উদ্দেশ্যে বিবেকানন্দ বলেছিলেন—"আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ"—এই হচ্ছে সন্ন্যাসের প্রকৃত উদ্দেশ্য। 'সন্ন্যাস না হলে কেউ কখনও ব্রহ্মজ্ঞ হতে পারে না—একথা বেদ বেদান্ত ঘোষণা করেছে। যারা বলে—এ সংসারও করব, ব্রহ্মজ্ঞও হব—তাদের কথা আদপেই শুনবি নি। ও-সব

প্রচ্ছন্নভোগীদের স্তোকবাক্য। এতটুকু সংসারের ভোগেচ্ছা যার রয়েছে, এতটুকু কামনা যার আছে এ কঠিন পন্থা ভেবে তার ভয়··· ত্যাগ ছাড়া মুক্তি নেই। ত্যাগ ছাড়া পরাভক্তি লাভ হয় না। ত্যাগ—ত্যাগ। 'নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।' গীতাতেও আছে—
'কাম্যানাং কর্মণাং ন্যাসং সন্ন্যাসং কবয়ো বিদুঃ।'
সংসারের ঝঞ্ঝাট ছেড়ে না দিলে কারও মুক্তি হয় না। সংসারাশ্রমে যে রয়েছে, একটা না একটা কামনার দাস হয়েই যে সে ঐরূপে বদ্ধ রয়েছে, ওতেই তা প্রমাণ হচ্ছে। নৈলে সংসারে থাকবে কেন? হয় কামিনীর দাস, নয় অর্থের দাস, মান যশ বিদ্যা ও পাণ্ডিত্যের দাস। এ দাসত্ব থেকে বেরিয়ে পড়লে তবে মুক্তির পন্থায় অগ্রসর হতে পারা যায়।" [স্বামি-শিষ্য-সংবাদ পূর্বকাণ্ড]
রামমোহন থেকে দেবেন্দ্রনাথ অবধি ব্রাহ্মধর্মের বিকাশে ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের আদর্শ প্রাধান্য পেলেও কেশবচন্দ্র বিজয়কৃষ্ণ প্রভৃতির সাধনায় বৈরাগ্যের গৈরিকস্পর্শ সঞ্চারিত হয়ে ছিল। বলা বাহুল্য শ্রীরামকৃষ্ণ-সান্নিধ্যই তার কারণ। কিন্তু শিবনাথশাস্ত্রী, আনন্দমোহন বসু প্রভৃতির পরিচালনায় ব্রাহ্মসমাজ ক্রমে ভারতের নবজাগ্রত রাজনৈতিক প্রেরণার প্রতি আকৃষ্ট হওয়ায় বাংলার তরুণসমাজে ধর্মপ্রবণতা ক্রমে স্তিমিত হয়ে এলো।
রাজনীতিই বিশ শতকের বাঙালী তরুণের স্বভাবধর্ম। তবু, উনিশ শতকের শ্রেয়বোধের আদর্শে আধ্যাত্মিকতার নিজস্ব মূল্য আজও কিছু কমে যায় নি। বরং সমাজের সর্বস্তরে শ্রেয়বোধের জাগরণের জন্য আমাদের অধ্যাত্ম ঐতিহ্য সম্বন্ধে সচেতন হওয়ার প্রয়োজন আজকের দিনেই সবচেয়ে বেশী। যথার্থ সন্ন্যাসের আদর্শ আমাদের বিধ্বস্ত সমাজজীবনে যত বেশী দেখতে পাব ততই আমাদের পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে আত্মত্যাগমূলক কল্যাণধর্মী রাষ্ট্রব্যবস্থার সম্ভাবনা উজ্জ্বলতর হয়ে উঠবে। মতবাদের

বিতর্ক যাই থাক, আদর্শ মনুষ্যত্বের অভাবই আমাদের জাতীয় জীবনের প্রধান সমস্যা। আশা করি এ বিষয়ে কোন মতভেদ নেই। দল-নির্বিশেষে আমাদের সামনে আজ প্রায়াজন দেশ ও জাতির কল্যাণে সর্বত্যাগী কর্মিদল। নিরাসক্ত সেই কর্মযোগ যথার্থ সন্ন্যাসীরই সাধ্য।

কিন্তু দেশশুদ্ধ সন্ন্যাসীর দল তৈরী করা রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের আদর্শ নয়। তাঁদের উদ্দেশ্য—সন্ন্যাসের যথার্থ আদর্শের প্রতি আমাদের লুপ্তশ্রদ্ধা ফিরিয়ে আনা।

শাস্ত্রমতে সন্ন্যাস চার ধরনের—(ক) বিদ্বৎ (খ) বিবিদিষা (গ) মর্কট (ঘ) আতুর। সহজাত সংস্কারের বশে বৈরাগ্যোদয়ে যে সন্ন্যাস তাই বিদ্বৎ সন্ন্যাস। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায় লাউকুমড়োর আগে ফল পরে ফুল।' রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের সন্ন্যাস এই শ্রেণীর। শ্রীরামকৃষ্ণ নানারূপ ও ভাবে ঈশ্বর দর্শন করে তারপর অদ্বৈতজ্ঞানের সাধনার জন্য তোতাপুরীর কাছে সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন। আত্মজ্ঞানলাভের জন্য যে চিহ্নধারী সন্ন্যাসের প্রয়োজন আছে, সেকথা শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ন্যাসগ্রহণেই প্রমাণিত। সন্ন্যাসের বহিঃচিহ্ন গৈরিকের সঙ্গে ভারতবর্ষের সহস্র সহস্র বৎসরের সাধনার ঐতিহ্য জড়িত।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, "...ভেকের আদর করতে হয়। ভেক দেখলে সত্যবস্তুর উদ্দীপন হয়। চৈতন্যদেব গাধাকে ভেক পরিয়ে সাষ্টাঙ্গ হয়েছিলেন।" [কথামৃত : ৪র্থ]

গৈরিকের সম্মান যেমন সবচেয়ে বেশী, তার দায়িত্বও তেমনি অসাধারণ। সাধারণ-অধিকারী ব্যক্তি তাই গৈরিক পেয়ে অনেক ক্ষেত্রেই অহংকৃত হয়ে নিজের আদর্শের অবমাননা করেন। তবু, যদি অর্থ ও কামের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার যথার্থ আকাঙ্ক্ষা থাকে, তাহলে গৈরিকধারণের সার্থকতা অবশ্যস্বীকার্য।

"আত্মতত্ত্ব জানবার প্রবল বাসনা থেকে শাস্ত্রপাঠ ও সাধনাদি দ্বারা স্ব-স্বরূপ অবগত হবার জন্য কোন ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের কাছে সন্ন্যাস নিয়ে স্বাধ্যায় ও সাধনভজন করতে লাগলো—একে 'বিবিদিষা সন্ন্যাস বলে।" সাধারণতঃ সন্ন্যাসী বলতে আমরা যা বুঝি তা এই বিবিদিষা সন্ন্যাসের ফল। শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগী সন্তানেরা কিন্তু বিবিদিষা নয়, বিদ্বৎ সন্ন্যাসের অধিকারী। কারণ, তাঁরা সকলেই শ্রীরামকৃষ্ণ-সংস্পর্শে এসে অনুভূতিসম্পন্ন হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে এই অধ্যাত্ম আদর্শ রক্ষা ও প্রচারের জন্যই তাঁরা সন্ন্যাস গ্রহণ করেন।*

শংকরাচার্য শ্রীচৈতন্য প্রমুখ মহাপুরুষদের সন্ন্যাস এই বিদ্বৎসন্ন্যাসেরই অন্তর্গত। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অভ্যাসের দ্বারা ধীরে ধীরে বৈরাগ্য আয়ত্ত করতে হয়। সে কথা ভেবেই স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনে বিবিদিষা সন্ন্যাসের প্রবর্তন করেছিলেন। তাঁর নিজের নামও এককালে বিবিদিষানন্দ ছিল।

"সংসারের তাড়না, স্বজনবিয়োগ বা অন্য কোন কারণে কেউ কেউ বেরিয়ে পড়ে সন্ন্যাস নেয়; কিন্তু এ বৈরাগ্য স্থায়ী হয় না, এর নাম 'মর্কট সন্ন্যাস', ঠাকুর যেমন বলতেন, 'বৈরাগ্য নিয়ে পশ্চিমে গিয়ে আবার একটা চাকরী বাগিয়ে নিলে; তারপর চাই কি পরিবার আনলে বা আবার বে ক'রে ফেললে।' আর এক প্রকার সন্ন্যাস আছে, যেমন মুমূর্ষু, রোগশয্যায় শায়িত, বাঁচবার আশা নেই, তখন তাকে সন্ন্যাস দেবার বিধি আছে। সে যদি মরে তো পবিত্র সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করে মরে গেল—পরজন্মে এই পুণ্যে ভাল জন্ম হবে। এই শেষোক্ত সন্ন্যাসের নাম 'আতুর সন্ন্যাস।'*

সন্ন্যাসের সর্বময় মহিমাঘোষণায় বিবেকানন্দ চিরপ্রদীপ্ত। ভারতীয়

স্বামীশিষ্যসংবাদ : পূর্বকাণ্ড।

সন্ন্যাস-আদর্শকে যুগোপযোগী সেবাধর্মে রূপান্তরের দ্বারা তিনি একে পরিবর্তনশীল সভ্যতার অর্থনৈতিক কাঠামোর সঙ্গে সংযুক্ত করেছেন। আজ আর রামকৃষ্ণ মিশন বা নব্য সন্ন্যাসী সম্প্রদায় কেবল ভিক্ষান্নের উপর নির্ভরশীল পরোপজীবী নয়, বরং সমাজ থেকে তাঁরা যা নিচ্ছেন তার চতুর্গুণ সমাজকে ফিরিয়ে দিচ্ছেন। বন্যা, মহামারী, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি সাময়িক সমস্যা থেকে ধর্ম, শিক্ষা, সংস্কৃতির চিরন্তন কল্যান আদর্শ বিস্তারে আধুনিক সন্ন্যাসীদের দান সশ্রদ্ধচিত্তে অনুধাবনযোগ্য।

তবু, সন্ন্যাসীর মূল আদর্শ ঈশ্বরোপলব্ধি। সমাজসেবা বা দেশসেবায় সন্ন্যাসীর কৃতিত্ব থাকতে পারে, কিন্তু সে কাজ গৃহধর্মাবলম্বীদের দ্বারাও হতে পারে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্কুল, কলেজ, গ্রন্থাগার, ছাত্রাবাস, হাসপাতাল-স্থাপন রাষ্ট্রেরই দায়িত্ব। নিঃস্বার্থ সন্ন্যাসীদের দ্বারা এসব কাজ ভালোভাবে হয় সন্দেহ নেই, কিন্তু সন্ন্যাসীর কাছে মানুষ সর্বাগ্রে চায় আত্মোপলব্ধির নিশানা।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, "···সংসারী লোকের সর্বদাই সাধুসঙ্গ দরকার। সকলেরই দরকার। সন্ন্যাসীরও দরকার।"* এক্ষেত্রে সাধুসঙ্গ অর্থে ঈশ্বরতন্ময় ব্যক্তির সান্নিধ্যই বোঝায়। সামাজিক বা রাজনৈতিক কর্মে জড়িত সন্ন্যাসীর পক্ষে বহির্মুখীনতা এসে পড়া আশ্চর্য নয়। তাই সন্ন্যাসীরাও যথার্থ ঈশ্বরতন্ময় ব্যক্তির সান্নিধ্য খোঁজেন।

আদর্শচ্যুত সন্ন্যাসী সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের উদাহরণ—

"সন্ন্যাসীর পক্ষে টাকা লওয়া বা লোভে আসক্ত হওয়া কিরূপ জানো? যেমন ব্রাহ্মণের বিধবা অনেক কাল হবিষ্য খেয়ে, ব্রহ্মচর্য করে, বাগ্দী উপপতি করেছিল।" তাই তিনি বলতেন, "শুধু ভিতরে ত্যাগ হলে হবে না। বাইরে ত্যাগও চাই, তবে লোকশিক্ষা হয়।" ব্যক্তিগত জীবনে কত সামান্য ঘটনায় তাঁর পূর্ণ নিরাসক্ত মনের পরিচয় ফুটে

উঠেছে—"সিঁতির মহেন্দ্র (কবিরাজ) রামলালের কাছে পাঁচটা টাকা দিয়ে গিছলো—আমি জানতে পারি নাই। রামলাল বল্লে পর, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কাকে দিয়েছে? সে বল্লে, এখানকার জন্য। আমি প্রথমটা ভাবলুম, দুধের দেনা আছে না হয় সেইটে শোধ দেওয়া যাবে। ও মা! খানিক রাত্রে ধড়মড় করে উঠে পড়েছি। বুকে যেন বিল্লি আঁচড়াচ্ছে। রামলালকে গিয়ে আবার জিজ্ঞাসা করলুম, 'তোর খুড়ীকে দিয়েছে?' সে বল্লে, 'না'। তখন তাকে বল্লাম, তুই এক্ষণই ফিরিয়ে দিয়ে আয়! রামলাল তারপর টাকা ফিরিয়ে দিলে।"* কাম-কাঞ্চনের স্পর্শমাত্র যে সন্ন্যাসীর পক্ষে নিষিদ্ধ, সে আদর্শ শ্রীরামকৃষ্ণজীবনে অক্ষরে অক্ষরে রূপায়িত। অথচ কাম-কাঞ্চনই শুধু বর্জনীয় নয়। বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে এর পরেও সন্ন্যাসীর অন্তরায় আছে—লোকখ্যাতির বাসনা। প্রাচীন কালের মীননাথ-গোরক্ষনাথের কাহিনী থেকে আরম্ভ করে এমন অনেক দৃষ্টান্তই দেখানো যায়, যেখানে গুরুগিরি বা মানযশের আকাঙ্ক্ষা ক্রমে সাধন ভজন বৈরাগ্য ভুলিয়ে সাধককে মোহান্ধ করে তুলেছে। শ্রীরামকৃষ্ণ-হৃদয়ে এই লোকৈষণাও সম্পূর্ণ মুছে গিয়েছিল বলেই সে কালের বক্তৃতাসভা, সংবাদপত্রে প্রচার, দলসংগঠন—এ জাতীয় কোন প্রচেষ্টার সঙ্গে তাঁর কোন যোগ ছিল না। স্বভাবতঃই ভারতীয় সন্ন্যাস-আশ্রমের মহত্তর দিকটিই স্বামীজীর দৃষ্টিতে প্রাধান্য লাভ করেছে। তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায়—

"ভারতবর্ষ ঘুরে দেখলুম, কোথাও রাজোগুণের বিকাশ নেই। কেবল তমো—তমো—ঘোর তমোগুণে ইতর সাধারণ সকলে পড়ে রয়েছে। কেবল সন্ন্যাসীদের ভেতরই দেখেছি রজঃ ও সত্ত্বগুণ রয়েছে; এরাই ভারতের মেরুদণ্ড, যথার্থ সন্ন্যাসী—গৃহীর উপদেষ্টা। তাদের উপদেশ

* * কথামৃত (৪)

ও জ্ঞানালোক পেয়েই পূর্বে অনেক সময় গৃহীরা জীবনসংগ্রামে কৃতকার্য হয়েছিল।

সন্ন্যাসীদের বহুমূল্য উপদেশের বিনিময়ে গৃহীরা তাদের অন্নবস্ত্র দেয়। এই আদান প্রদান না থাকলে ভারতবর্ষের লোক এতদিন আমেরিকার Red Indian-দের মতো প্রায় extinct (উজাড়) হয়ে যেত।

সন্ন্যাসীরা কর্ম হীন নয়। তারাই হচ্ছে কর্মের fountain head (উৎস)। উচ্চ আদর্শ সকল তাদের জীবনে বা কাজে পরিণত করতে দেখে এবং তাদের কাছ থেকে ঐ সব idea (উচ্চ ভাব) নিয়েই গৃহীরা কর্মক্ষেত্রে জীবনসংগ্রামে সমর্থ হয়েছে ও হচ্ছে। ··· না বুঝেই লোকে সন্নাস institution (আশ্রম)-এর নিন্দা করে। অন্যদেশে যাই হোক না কেন, এদেশে কিন্তু সন্ন্যাসীরা হাল ধরে আছে বলেই 'সংসারসাগরে গৃহস্থদের নৌকা ডুবছে না।"

[স্বামী শিষ্য সংবাদ: পূর্বকাণ্ড]

স্বামীজী এখানে অধ্যাত্মআদর্শের ক্ষেত্রে সন্ন্যাসীদের নেতৃত্বের কথাই শুধু বলছেন না। ভারতীয় জীবনদর্শনের যে বনিয়াদ যুগ যুগ ধরে সন্ন্যাসীরা গড়ে দিয়েছেন, পতনে অভ্যুদয়ে ভারতাত্মার ক্রমবিকাশের ইতিহাসকে তাই ধারণ করে আছে। ধর্মাদর্শের এই ধারণীশক্তির বলেই কোন পরাধীনতাই আমাদের নিঃশেষে বিলুপ্ত করে নি। মধ্যযুগে বা আধুনিক কালেও এই ভারতবর্ষ থেকেই জগতের একাধিক শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়ক মহামানবের আবির্ভাব ঘটেছে।

সন্ন্যাস এবং গৃহধর্ম—ভারতীয় চিন্তাধারায় একেবারে বিচ্ছিন্ন কিছু নয়, বরং সন্ন্যাসের জন্য প্রস্তুতিই আমাদের সমগ্র জীবনচর্যার সাধনা। সে সন্ন্যাস কারু গার্হস্থ্য বাণপ্রস্থের পরে, কারু বা যৌবনের সুপ্রভাতেই অবলম্বনীয়। বৈরাগ্য যখনই আসুক, আর মুহূর্ত বিলম্ব নয়—'যদহরেব বিরজেৎ, তদহরেব প্রব্রজেৎ।' শুধু

দেখা চাই, তা যথার্থ বৈরাগ্য কি না, ঈশ্বরলাভের বা ব্রহ্মোপলব্ধির জন্য সংসারে নিরাসক্তি কি না।

ভারতীয় জীবনদর্শনের কেন্দ্রবিন্দু এই সন্ন্যাসের সত্যতপোময় মূর্তি শ্রীরামকৃষ্ণ। মাতৃভাব থেকে মধুরভাব অবধি বহুবিচিত্র সাধনার প্রান্তে এসে ভাবসাধনার অতীত অদ্বৈতসাধনার জন্য তিনিও তোতাপুরীর কাছে আনুষ্ঠানিক সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন। অদ্বৈত-বেদান্তের সাধককে শিখাসূত্র তাগ করে সম্পূর্ণ সন্ন্যাসী হতে হয়। কিন্তু মায়ের মনে ব্যথা দিয়ে বা সহধর্মিনীর সঙ্গে সম্পর্ক মুছে ফেলে তিনি সন্ন্যাসী হলেন না। কারণ, তাঁর সম্পূর্ণ ভগবৎ-তন্ময় হৃদয়ে আর এই বাইরের ত্যাগের প্রয়োজন ছিল না। গুরু তোতাপুরীও উপযুক্ত অদ্বৈতের অধিকারী পেয়ে লোকদেখানো অনুষ্ঠানের চেয়ে সন্ন্যাসের অন্তর্নিহিত তাৎপর্যের উপরেই জোর দিলেন বেশী। এমন কি, স্ত্রী পুরুষে ভেদজ্ঞান যে যথার্থ ব্রহ্মজ্ঞের নিদর্শন নয়, একথাও জানালেন। সুতরাং সন্ন্যাসী শ্রীরামকৃষ্ণের পক্ষে পরবর্তী কালে আত্মারই আর এক অভিব্যক্তিরূপে সহধর্মিনীকে পরমসত্যের পক্ষে পরিচালিত করার ক্ষেত্রে কোন বাধা রইল না। মায়ের সেবার সঙ্গে বিশ্বজননীর সেবা এক হয়ে গেল

পঞ্চবটীর নির্জন সাধনপ্রাঙ্গণে আপন সাধনকুটীরে সাধক শ্রীরামকৃষ্ণ "ভূরাদি সমস্ত লোকপ্রাপ্তির আশা ও অধিকার নিঃশেষে বর্জন" করে আপন শ্রাদ্ধাদি পূর্বক্রিয়া সমাপনান্তে সন্ন্যাসের জন্য প্রস্তুত হয়ে এলেন। স্বামী সারদানন্দজীর "লীলাপ্রসঙ্গ" থেকে তাঁর স্নিগ্ধ গম্ভীর অননুকরণীয় ভাষায় শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ন্যাসগ্রহণের এই চিত্রটি পাঠকদের কাছে নিবেদন করছি—"অনন্তর রাত্রি অবসানে শুভ ব্রাহ্ম মুহূর্তের উদয় হইলে গুরু ও শিষ্য উভয়ে কুটীরে সমাগত হইলেন। পূর্বকৃত্য সমাপ্ত হইল, হোমাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইল এবং ঈশ্বরার্থে সর্বস্বত্যাগরূপ যে ব্রত সনাতন কাল হইতে গুরু পরম্পরাগত হইয়া ভারতকে এখনও

ব্রহ্মজ্ঞ-পদবীতে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখিয়াছে, সেই ত্যাগ ব্রতাবলম্বনের পূর্বোচ্চার্য মন্ত্র সকলের পূত-গম্ভীর ধ্বনিতে পঞ্চবটী উপবন মুখরিত হইয়া উঠিল।

গুরু মন্ত্রপাঠে প্রবৃত্ত হইলেন, শিষ্য অবহিতচিত্তে তাঁহাকে অনুসরণ-পূর্বক সেই সকল কথা উচ্চারণ করিয়া সমিদ্ধ হুতাশনে আহুতিপ্রদানে প্রস্তুত হইলেন। প্রথমে প্রার্থনামন্ত্র উচ্চারিত হইল, "পরব্রহ্মতত্ত্ব আমাকে প্রাপ্ত হউক। পরমানন্দলক্ষণোপেত বস্তু আমাকে প্রাপ্ত হউক। অখণ্ডৈকরস মধুময় ব্রহ্মবস্তু আমাতে প্রকাশিত হউক। হে ব্রহ্মবিদ্যাসহ নিত্য বর্তমান পরমাত্মন্! দেবমনুষ্যাদি তোমার সমগ্র সন্তানগণের মধ্যে আমি তোমার বিশেষ করুণাযোগ্য সেবক। হে সংসারদুঃস্বপ্নহারিন্ পরমেশ্বর! দ্বৈতপ্রতিভারূপ আমার যাবতীয় দুঃস্বপ্নের বিনাশ কর। হে সর্বপ্রেরক দেব! জ্ঞানপ্রতিবন্ধক যাবতীয় মলিনতা আমা হইতে বিদূরিত করিয়া অসম্ভাবনা-বিপরীত-ভাবনাদিরহিত তত্ত্বজ্ঞান যাহাতে আমাতে উপস্থিত হয় তাহাই কর।...

অনন্তর বিবজাহোম আরম্ভ হইল—"পৃথ্বী, অপ্, তেজ, বায়ু ও আকাশরূপে আমাতে অবস্থিত ভূতপঞ্চক শুদ্ধ হউক; আহুতি-প্রভাবে রজোগুণপ্রসূত মলিনতা হইতে বিমুক্ত হইয়া আমি যেন জ্যোতিঃস্বরূপ হই—স্বাহা

অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময়, আনন্দময় নামক আমার কোষপঞ্চক শুদ্ধ হউক ;...

শব্দ-স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ-প্রসূত আমাতে অবস্থিত বিষয়সংস্কারসমূহ শুদ্ধ হউক,...

আমার মন, বাক্য, কায়, কর্ম্মাদি শুদ্ধ হউক,...

হে অগ্নিশরীরে শয়ান! জ্ঞান-প্রতিবন্ধ-হরণ-কুশল, লোহিতাক্ষ পুরুষ, জাগরিত হও; হে অভীষ্টপূরণকারিন্ তত্ত্বজ্ঞানলাভের পথে

আমাতে যত কিছু প্রতিবন্ধক আছে সেই সকলের নাশ কর এবং চিত্তের সমগ্র সংস্কার সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধ হইয়া যাহাতে গুরুমুখে শ্রুত জ্ঞান আমার অন্তরে সম্যক উদিত হয় তাহা করিয়া দাও ;…চিদাভাস ব্রহ্মস্বরূপ আমি দারা, পুত্র, সম্পদ, লোকমান্যতা, সুন্দর শরীরাদি-লাভের সমস্ত বাসনা অগ্নিতে আহুতিপ্রদানপূর্বক নিঃশেষে ত্যাগ করিতেছি—স্বাহা।'

ঐরূপে বহু আহুতি প্রদত্ত হইবার পর—'ভূরাদি সকল লোক লাভের প্রত্যাশা আমি এইক্ষণ হইতে ত্যাগ করিলাম' এবং 'জগতের সর্বভূতকে অভয়প্রদান করিতেছি' বলিয়া হোম পরিসমাপ্ত হইল। অনন্তর শিখাসূত্র ও যজ্ঞোপবীত যথাবিধানে আহুতি দিয়া আবহমানকাল হইতে সাধকপরম্পরানিষেবিত গুরুপ্রদত্ত কৌপীন, কাষায় ও নামে ভূষিত হইয়া ঠাকুর শ্রীমৎ তোতার নিকটে উপদেশ গ্রহণের জন্য উপবিষ্ট হইলেন।" [শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ : সাধকভাব]

তোতাপুরীর চল্লিশ বৎসরের সাধনলব্ধ বেদান্ত সত্য উপলব্ধি করতে শ্রীরামকৃষ্ণের তিনদিন সময় লেগেছিল। তারপর নিরন্তর ছয়টি মাস অদ্বৈত-ব্রহ্মচেতনায় লীন থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ নিত্য ও লীলার, ভাব ও ভাবাতীতের সেতুসংযোগরূপে সংসার ও সন্ন্যাসকে এক পরম সার্থকতার নতুন তাৎপর্যে ভরে দিলেন।

গৃহধর্মের আপাত আকারটি বজায় রইলো, অন্তরে দেখা দিল পরিপূর্ণ নিরাসক্তি। নিঃশেষ ত্যাগের হোমানলে সব বৈধী ভক্তির বাহ্য আচরণ মুছে গিয়ে প্রতিদিনের জীবনযাত্রায় লাগলো অন্তরের স্পর্শ। বস্তুময় ক্ষণসংসার, আনন্দময় ঈশ্বরের লীলারূপে প্রতিভাত হল। আবার 'যাঁরই নিত্য, তাঁরই লীলা'-র উপলব্ধিতে শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন সানাই-বাজনার উপমায়—"একজন পোঁ করছে, আর একজন নানা সুরের লহরী তুলে কত রাগ রাগিনী আলাপ করছে। আমারও ঐ ভাব। আমার সাত ফোকর থাকতে শুধু কেন পোঁ

করব—কেন শুধু সোহং সোহং করব। আমি সাত ফোকরে নানা রাগরাগিনী বাজাব। শুধু ব্রহ্ম ব্রহ্ম কেন করব! শান্ত, দাস্য, বাৎসল্য সখ্য, মধুর সবভাবে তাঁকে ডাকব।" [কথামৃত ৫ম]

নিত্য থেকে লীলা, আবার লীলা থেকে নিত্যে অবিরাম যাওয়া আসার এই ভাবমুখ-সাধনায় পৃথিবীর ধূলিকণা থেকে অনন্ত ঈশ্বর অবধি এক সত্যেরই নানা বিচিত্র রূপায়ণ। সে মহাসত্যের পটভূমিতে জীব ব্রহ্ম কেউ মিথ্যা নয়, সংসার সন্ন্যাস কোনটিই অর্থহীন নয়। তবু, সংসার ও সন্ন্যাসকে একাকার করে দেখার ভ্রান্তি যেন আমাদের না ঘটে। জগতের অন্তর্নিহিত সত্যকে উপলব্ধির জন্যই প্রথমে জগৎ থেকে দূরে যাওয়ার প্রয়োজন, তারই নাম সন্ন্যাস। আবার সেই দূরত্বের সাধনাই একদিন জগতের অন্তরতম সার্থকতার উন্মোচন ঘটায়। তখন—'যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা কৃষ্ণস্ফূর্তি।'

'সর্বভূতে সেই প্রেমময়।'

'যত্র জীব তত্র শিব।'

ভারতীয় সন্ন্যাস-আদর্শের অধিদেবতা নিবাত নিষ্কম্প ধ্যানসমাহিত যোগিরাজ শিব। সতীর প্রতি প্রেমে, উমার প্রতি মমতায় তিনি আমাদের গৃহধর্মেরও শ্রেষ্ঠ আদর্শ। একাধারে আদর্শ সন্ন্যাসী ও আদর্শ গৃহী এই শিবচরিত্র কল্পনা। শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনে আর একবার রূপায়িত।

সংসারজীবনে অপূর্ব গৃহী, সন্ন্যাসজীবনে অপূর্ব সন্ন্যাসী—এই শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনে ভারতাত্মার পরিপূর্ণ প্রকাশ।